হে পূর্ণ তব চরণের কাছে

নবনীতা দেবসেন

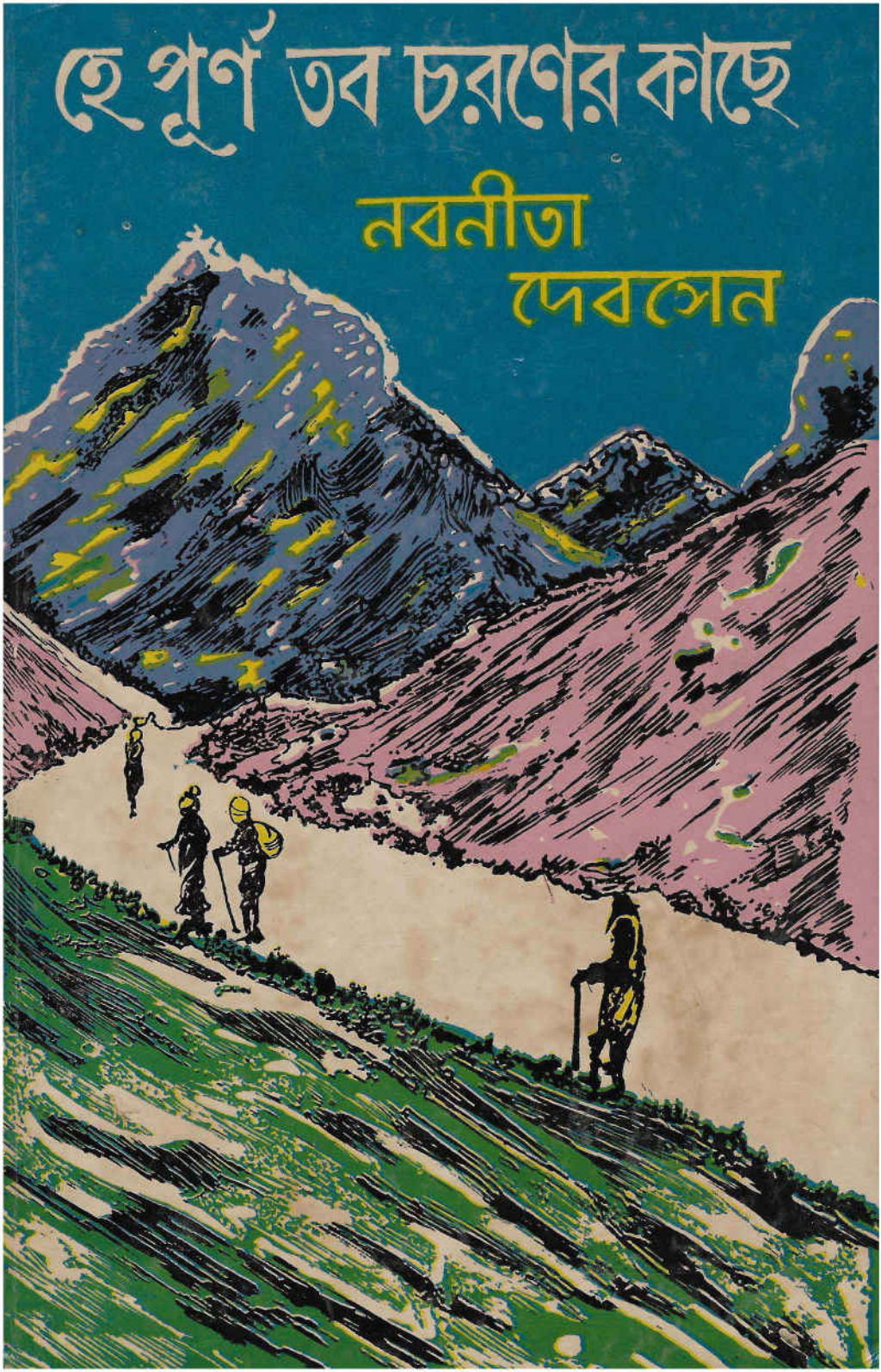

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে

নবনীতা দেবসেন

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৯১, মার্চ ১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, নভেম্বর ১৯৮৫
তৃতীয় মুদ্রণ
— আঠারো টাকা —

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র
সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সংসারে এক সন্ন্যাসী

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

পূজনীয়েষু

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে

প্রথম পর্ব

মুখবন্ধ

সেখানে অদ্ভুত বৃক্ষ, দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই, নাম কল্পতরু॥

কল্পতরু কি আর আমরা চিনি? ধরুন আপনি একদিন খুব মনে দুঃখু করে ভাবলেন—আহা, এজন্মে তাহলে আর উত্তরাখণ্ড ঘোরা হবে না। অমনি আপনার সামনে একটা সাদা ধবধবে নতুন গাড়ি এসে থামলো, জানলায় জানলায় নীল পর্দা। ঝকঝকে উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে বললো—"সেলাম বিবিজী। গাড়ি হাজির।" আপনি অবাক। কিসের গাড়ি? কার গাড়ি? —"জী আপকো লিয়ে—চারোধাম যানা হ্যায় না?" আপনি তখন চোখ বুজে মনে মনে বললেন, "হৃষীকেশ!" অমনি বোঁ করে গাড়ি ছুটলো—মীরাট, রুড়কী, হরদুয়ার হয়ে হৃষীকেশ। যেন হৃষীকেশ নয়, শুণ্ডিরাজ্য! ভূতের রাজার বর কিন্তু দুঃখীরা সত্যি সত্যি পায়। গুপী গাইনের গল্পটা একদম মিথ্যে নয়। মনের দুঃখে বনে গিয়ে আপনি যখন বলছিলেন, "উত্তরাখণ্ড যাত্রা, আমার আর হোলো না"—তখন সেই গাছটাই যে কল্পতরু বৃক্ষ ছিল, তা কি আর আপনি জানতেন? জানতেন না তো? এখন জানলেন। জগতে মানুষের ইচ্ছাপূরণ যে এমন করেও হয়, তা কে জানতো? আজ আপনাদের যে রূপকথার গল্পটা বলবো, তার এককণাও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আপনারা কেন, আমার নিজেরই তো বিশ্বাস হচ্ছিল না। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না—যতবার ভাবি—সুরথ সিং, জগৎ সিং, মিস্টার মিটার, শিব-খুস্টানন্দ, মেসোমশাই—সবই যেন স্বপ্নের মতন সত্য অথচ অলীক মনে হয়।

আমার জীবনটাই যে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন সাজিয়ে গড়া। ছেলেবেলাতে মা বলেছিলেন, খুব মন দিয়ে যদি কিছু চাওয়া যায়, ঈশ্বর সেই ইচ্ছে ঠিক পূর্ণ করেন। কিন্তু সেইজন্যেই ঈশ্বরকে এটা-ওটা চেয়ে বিরক্ত করতে নেই। আমাদের ধর্মে বড্ডই ভিকিরিপনা। কেবল দাও দাও। দেহি দেহি। সংস্কৃত মন্তরেও রূপং দেহি যশং দেহি জয়ং দেহি, আবার বাংলা পাঁচালিতেও। পুরুষমানুষও চেয়ে চেয়ে কূল পাচ্ছে না, মেয়েমানুষও তাই। পুরুষ বলছে দ্বিষো জহি—তুমিই আমার শত্রুদের মেরে দাও। নারী বলছে, শিবের মতন স্বামী দাও, সভাউজ্জ্বল জামাই দাও, আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। কী নির্লজ্জ ধর্ম রে বাবা!

পনেরো-ষোলো বছর বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইবো যে, ভক্তিই তো নেই। ঈশ্বরই আছেন কি নেই সেইটে নিয়েও মনে মনে নতুন প্রশ্ন। বড়ই মুশকিল হোলো। তারপর থেকে ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রধান চাইবার জিনিস। মশাই হে, যদি থাকো, তবে সেটা বুঝিয়ে দাও। টের পাইয়ে দাও। অর্থাৎ কিনা, পূর্ণা ভক্তি দাও। পূর্ণ বিশ্বাস দাও। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা বড় কষ্টের।

ওদিকে দেখতে পাই ঈশ্বরের সব স্পয়েন্ট্ চাইলড চাদ্দিকে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তারা ভগবানের খায় ভগবানের পরে আবার ভগবানেরই দাড়ি ওপড়ায়। আমার এরকম কয়েকজন 'হাইলি সাকসেসফুল' রূপেগুণে ধনেমানে জগদ্বিখ্যাত বন্ধুবান্ধব আছেন, যাঁদের জীবন ঈশ্বরের অসীম করুণার স্পষ্ট ছবি এবং যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ঘোরতর নাস্তিক। কেউ সুবুদ্ধিতে, কেউ বা গুরুর আদেশে (অর্থাৎ রাজনীতির কল্যাণে)। তাঁরা যা কিছু পেয়েছেন সবই তাঁদের নিজগুণে প্রাপ্ত বলে তাঁদের বিশ্বাস। ভগবান তাঁদের ছপ্পড় ফুঁড়ে সবই দিয়েছেন, কেবল নিজেকে ছাড়া। জীবনে কখনো তাদের এতটুকু টক্করও লাগতে দেননি, যাতে হঠাৎ ছিটকে এসে তাঁর পায়ে না পড়ে! তার বদলে দিয়েছেন কী? দর্পিত নাস্তিক্যের আত্মা-হীন আত্মবিশ্বাস। আর আমার মতন স্পয়েন্ট্ চাইলডও আছে। অনবরত অনার্জিত সৌভাগ্যে যার জীবন উপচে পড়ছে। আর সবসময়ে বুকের মধ্যে কে যেন সাবধান করছে, এসব কিচ্ছু তোর নয়, এ হল পরের ধনে পোদ্দারি। তুমি বাপু মনে কোর না এসব নিজগুণে অর্জন করেছো, যা পাচ্ছো সবই তিনি দিচ্ছেন বলেই। চিরকৃতার্থ থাকা উচিত। এর বদলে কী করছো তুমি হে,—যে এত এত পাবে? এই যে বৃষ্টির গন্ধ, এই যে হঠাৎ চোখের সামনে রংচটা শুক্‌নো গাছপালাগুলো ভিজে গিয়ে কাঁচা সবুজ রঙের হয়ে গেল, যেন হাত দিলেই পাতা থেকে হাতে কাঁচা রং উঠে আসবে—এই যে পালুসকরের "চলো মন", এই যে আমীর খানের মালকৌষ এসব ম্যাজিক তোমার প্রাপ্য নাকি? মনে রেখো, মনে রেখো।

আর শুধু কি তাই? ভক্তি দাও ভক্তি দাও করে চ্যাঁচানোর ফলেই বোধ হয় হ্যাঁচকাটানে এনে পায়ের ওপরে ফেলেছেন। "হে ঈশ্বর রক্ষা করো" বলা ছাড়া তখন আর পথ ছিল না, আর ঈশ্বরেরও তাই আশ্রয় না দিয়ে উপায় ছিল না।

সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়টায় বসে বসেও, মাঝে মাঝে সব গোলমাল হয়ে যায়। আবার খোঁচাই, আবার বলি—"কী হে, এখনো আছো, না নেই? আর তো পারছি না। থাকো যদি, তবে একবার দেখিয়ে দাও?" অন্তরালবর্তী তিতি-বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে বলেই বসেন—"তবে ছাখ্, বেটি! দেখে নে!"

আর তখনই শুরু হয় আমার সফল স্বপ্নের দিন। এমনি একটা স্বপ্নের সত্যি হওয়ার কাহিনী আমার উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ। স্বভাবটি যাঁর পরশ্রীকাতর, তাঁকে বলব, এ লেখাটা পড়বেন না। কল্পতরুর গল্প কিন্তু সকলের জন্য নয়। হিংসুটে হলে আপনার পুজোর ছুটিটাই মাটি। রূপকথার মতন অযাচিত অভাবিত ভাগ্যের গল্পে অবিশ্বাসীর ভীষণ মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। মা বলেন যারা হিংসুটে, তাদের মত দুঃখী কেউ নেই। তারা দিনরাত জ্বলছে পুড়ছে। এ লেখাটা পড়লে তাদের দহনজ্বালা আরো বাড়বে—তখন হরকি প্যারির কমণ্ডলু থেকে গঙ্গোত্রীর হিমজল ঢেলে আমি সে-জ্বালা জুড়োতে পারব কি ?

১

পূর্বকথা

কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলুম দিল্লিতে—কেননা ১৯৮১-তে এই দিল্লি থেকেই আমার স্বপ্ন দেখার শুরু। যেমন হয় আমার ক্ষেত্রে, নব্বই ভাগই অ্যাক্সিডেন্টাল, দশভাগ গোছগাছ করে। সেবারে ফরিদাবাদের বড়খল লেকে একটা অল্ ইন্ডিয়া সেমিনার ছিল। সেমিনার-শেষে দিল্লিতে এসেই দেখি আমার বৌদিভাই আর রিনিমা এসেছে কলকাতা থেকে, গাড়ি করে হৃষীকেশে যাচ্ছে, গুরুর আশ্রমের পুজো দেখতে। আমিও নিমন্ত্রিত। লাফিয়ে উঠলুম। পরদিনই যাত্রা শুরু। কী ভালোই লেগেছিল, দিল্লি থেকে হরিদ্বার হয়ে হৃষীকেশের পথ। আর হৃষীকেশে পৌঁছে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। আমরা যে অন্ধ্র আশ্রম ধর্মশালায় ছিলুম, তার দুপাশে দুটি মন্দির। সুন্দর কাঁসরঘণ্টা ঢাক শানাই বাজে। মন্ত্রধ্বনি ঘরে বসে শোনা যায়। মন্দিরে আরতি দেখা যায়। ঘর ভরে যায় ধুপধুনোচন্দনের সুবাসে। ঘরই নয়, মনও। আর জানলায় খাড়া পাহাড় হিমালয়। হিমালয়ের সেই সূর্য-ওঠা দেখবার জন্যে আমি রোজ সূর্যের আগেভাগে উঠে পড়তুম।

অনেকক্ষণ ধরে অভিষেকের বন্দোবস্ত চলত। আকাশ নীল থেকে বেগুনী, বেগুনী থেকে গোলাপী, গোলাপী থেকে লাল হলুদ, লাল হলুদ থেকে তীব্র উজ্জ্বল চোখধাঁধানো সোনার তৈরি হয়ে যেত। আর মহান্ হিমালয়ের যে নামহীন শিখর দুটি আমার জানলার সামনে, নিশ্চয় তারা নেপালের মৎস্যপুচ্ছ, আন্দেস-এর মাচ্চুপিচ্চুও নয়, কিন্তু তেমনিই দেখতে—তারা আস্তে আস্তে কালো পাথরের সিংহাসনের মতন গুরুগম্ভীর চেহারা করে ফেলত। তারপর হঠাৎ একসময়ে টুকুস করে একলাফে সুয্যিদেব উঠে আসতেন পৃথিবীর ওপার থেকে এপারে। লাল-টুকটুকে আপেলের মত চেহারা। হনুমানের দোষ ছিল না—খেতে ইচ্ছে হতেই

পারে। সিংহাসনে বসতেন অল্প কিছুক্ষণ। তারপরেই উঠে যেতেন আকাশে। সোনার বর্ণটি হয়ে। রোজই দেখতুম, আর রোজই মনে হত যেন ম্যাজিক দেখছি।

আর গঙ্গা? কলকাতার গঙ্গাকে দেখেই যে-চোখ অভ্যস্ত, সে-ই কি করে হৃষীকেশের গঙ্গাকে গঙ্গা বলে চিনে নেবে? একজন চওড়াপেড়ে গরদপরা গিন্নী-বান্নি, আরেকজন নীল ডুরেশাড়ি জড়ানো ছটফটে কিশোরী। গঙ্গাকেও কী ভালোই লেগেছিল! রোজ যেতুম, শালপাতার বাটিতে করে ফুল নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতুম ত্রিবেণী ঘাট থেকে।

হে স্বর্গবাসী আত্মীয়বন্ধুরা, মুক্ত হও তোমরা, তৃপ্ত হও তোমরা, হে মর্ত্যবাসী আত্মীয়বন্ধুরা, তোমরাও সুখেশান্তিতে থাকো।

ঠাণ্ডা-কন্‌কনে স্বচ্ছতোয়া গঙ্গার জলের নিচে কী অপরূপ রং-বেরঙের আর নিখুঁত গড়নের নুড়িপাথর! প্রত্যেকটি যেন দৈব কারিগরের হাতেগড়া, যেন বাটালি দিয়ে চেঁচে পালিশ করে সাজানো হয়েছে। ওঙ্কারনাথ আশ্রম থেকে গঙ্গায় স্নান করতে হলে যে পাথুরে পথটি বেয়ে যেতে হয় তার চারিপাশে প্রত্যেকটি পাথরকেই মনে হত কোলে তুলে বাড়িতে নিয়ে যাই। যেন নাড়ুগোপালটি। হাজার বছর ধরে গঙ্গার স্রোত আর হিমালয়ের বাতাস তাদের কত যত্নে কত আদরে গড়েপিটে তৈরি করেছে। হৃষীকেশের হিমালয় তুষারচূড় নয়। অরণ্যশীর্ষ। হৃষীকেশের হিমালয়ও হৃষীকেশের গঙ্গার মতই তরুণ, সবুজ, বাড়ন্ত।

কী ভালোই লেগেছিলো। জীবনে পুজোআচ্চা করি না। ধূপধুনো-ফুল-চন্দনের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই। অথচ ঘরে বসে সেই পুজোর গন্ধে কী করে যেন মনটা ভরে যেতো! ঠিক গির্জের ভিতরে গেলে তার নিস্তব্ধতায় আর ধূপের গন্ধে আর মোমের আলোয় মিলে ঠিক যেরকম একটা পবিত্রতার স্বাদ দেয়, যে রকম মুগ্ধতা তৈরি করে, ঠিক তেমনি লাগত ঘরে বসেই। অথচ একদিনও ঐ দুটি মন্দিরে যাইনি। বিগ্রহ কেমন, দেখতেও আগ্রহ হয়নি। বিগ্রহের যা কাজ, তা তো বুকের মধ্যে আপনিই হয়েছে। আর ভিতরে ঢুকে কী হবে?

আমার বুকের ভেতরটা বড় জটপাকানো—আমি ঠিক বিশুদ্ধ হিন্দু নই। আমি তো মুসলমানও নই। খৃস্টানও নই। আমি কি বৌদ্ধও নই? কি জানি! একটু একটু বৌদ্ধ বরং হতে রাজী আছি। হৃষীকেশ হিমালয় আর গঙ্গার এই কম্বিনেশনের কিন্তু মানুষকে ঘাড় ধরে হিন্দু বানিয়ে দেবার একটা অতিরিক্ত শক্তি আছে—অন্ততপক্ষে আস্তিক তো হতে বলবেই। এখানকার আকাশ-বাতাসই বলছে—অস্তি, অস্তি। তুমি একা একা নাস্তি। নাস্তি বললে কী হবে! শুনছে কে?

২

নাম শুধু নাম

সেই হৃষীকেশে গিয়েই পথের বাঁকে বাঁকে প্রবল সব লোভনীয় নামের পাল্লায় পড়ে গেলুম। আহা, এত সব সুন্দর সুন্দর নামের জায়গাও আছে পৃথিবীতে? এই আমারই নিজের দেশে? দেবপ্রয়াগ—এত মাইল, রুদ্রপ্রয়াগ—এত মাইল, শ্রীনগর—এত, উত্তরকাশী, গুপ্তকাশী, পিপ্পলকোটী, যোশীমঠ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, শোণপ্রয়াগ—কত দেশ, কত চমৎকার সব রূপকথার মত নাম। কেদারবদ্রী যেতে হলে এসব জায়গা পথে পড়ে। এমনিতে নাকি এসব জায়গায় কেউ যায় না। এসব সুন্দর নামের জায়গাগুলিতে যাবো বলেই আমি ঠিক করলুম, কেদারবদ্রীই যেতে হবে। নইলে তো আর এতগুলো প্রয়াগ দেখা হবে না। হৃষীকেশে জিজ্ঞেস করে জানলুম, অসামান্য কাণ্ড—সব পৌরাণিক নদনদীরা এখানে ঠেসা-ঠেসি করে নামছেন—কোথাও মন্দাকিনী নদীর সঙ্গে অলকানন্দার দেখা হচ্ছে, কোথাও হনুমানগঙ্গার সঙ্গে যমুনার। কিন্তু বৌদি রিনিমাকে রাজী করানো গেল না কেদারবদ্রীর পথে বেরিয়ে পড়তে। জামাকাপড়, বিছানাপত্তর, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই, পাগলামি তো করলেই হোল না? আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল—আমি একাই বাসে করে বেরিয়ে পড়বো ঠিক করলুম। তখন পুজোর ছুটি। এমন সুযোগ আর হবে না। বাসের খোঁজখবর নিলুম হৃষীকেশে গাঢ়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম সংস্থায়, আর হরিদ্বারে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ ট্যুরিজম ডিভেলপমেণ্ট অফিসে।

রিনিমাটা ভারী দুষ্টু।

—তুমি যাবে বাসে করে? তাহলেই হয়েছে, দিদি! ওই ছাখো তো, বাসের জানলার নিচে বাসের গা-ভর্তি সাদা সাদা ওগুলো কী? ঐ স্ট্রাইপস?

—কী রে রিনিমা?

—বমি। শুকনো বমির দাগ। বাসসুদ্ধু সব্বাই বমি করতে করতে যাবে। তুমি না পারবে থামতে, না পারবে নামতে—সেটা ভালো হবে?

এক মিনিটেই আমার যাবার মত উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি। না বাপু, বমি করতে করতেও যেতে পারব না, বমি করা দেখতে দেখতেও যেতে পারব না।—ট্যাক্সি? ট্যাক্সির খরচ কত?

একবার কাশী টু কুন্ত ট্যাক্সিতে গিয়ে খুব স্মার্ট হয়ে গেছি। অন্তত ট্যাক্সি ভাবতে অসুবিধা হয় না, কার্যত ভাড়া করতে হয়তো হবে। U. P. Tourism-

এর ট্যাক্সি, হরিদ্বার-কেদারবদ্রী-হরিদ্বার—চারদিনে আড়াই হাজার টাকা। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ট্যাক্সিওলাই করে দেবে। বিছানাপত্রও যোগাড় করে দেবে। হৃষীকেশ থেকে ট্যাক্সি নিলে দুই। পাঁচশো বাঁচছে। ট্যাক্সিতে আর দু'এক জনকে নিলে ভাড়াটা ভাগাভাগিও করে নেওয়া যায়। আমি তক্ষুনি ঠ্যাং তুলে রাজী। দুই বউ যে কী শত্রুতাই করেছিল সে-বছর! বৌদি বললে, না মশাই, আমি তোমাকে একা একা ট্যাক্সিতে করে অজানা অচেনা লোকদের সঙ্গে কেদারবদ্রী যেতে মোটেই ছেড়ে দিচ্ছি না! ও-পুজোয় বরং আমরা তিনজনে মিলে আবার আসবো কেদারবদ্রীতে।

হল না। বৌদির-মনের মতন সঙ্গী জুটলো না। চেনা সঙ্গী না হলে বৌদি ছাড়বে না। চেনা যাঁদের সঙ্গে দেখা হলো তাঁরা সবাই বাসে যাচ্ছেন। ট্যাক্সির খরচ অনেক বেশি। হল না, হল না, হল না, হল না—মনের মধ্যে কেবল এই শব্দ শুনতে শুনতেই দিল্লি ফিরলুম। ফিরে বুঝলুম এটাই ভাল হয়েছে—যাইনি। বাড়িতে আমার অনুপস্থিতি দীর্ঘায়িত হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল না—নানান বিপদ-আপদ গিয়েছিল আমি যখন ছিলুম না। তীর্থ-টীর্থের ব্যাপারে, কথায় বলে না, "না টানলে, হয় না"!

৩

গাইডবহি

এর আগে কেদারবদ্রীতে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে একবারও অনুভব করিনি, যদিও ইচ্ছে হয়েছে বিষ্ণোদেবী যাবার, জ্বালামুখী দর্শন করবার। এসব জায়গা শুধুমাত্র দুর্গম বলেই যেতে শখ হয়েছে, ধর্মীয় কারণে নয়। কিন্তু কেদারনাথে, বদ্রীনাথে অনেকদিনই যাত্রা সুগম হয়েছে—কত রকম "স্পেশাল" ছুটছে কত ধরনের যাত্রীদের পিঠে বেঁধে। তাই আমার উৎসাহ জাগেনি। এবারে হৃষীকেশে গিয়ে এই একটা প্রবল ঝোঁক এলো, একটা জেদ—যাবই। ফেরার পথে হরিদ্বার আর কনখল থেকে দুয়েকটা বইপত্তরও কিনে ফেললুম।

সবচেয়ে জরুরী বইটির লাল মলাটের সামনে বদ্রীনাথের মন্দিরের ছবি। তাতে স্পষ্ট বাংলায় লেখা—"শ্রী চারোধাম যাত্রা ঔর মহাত্ম্য॥ শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী।" —এত সুন্দর নামকরণ যে-বইয়ের, সে-বই কি না কিনে পারি? কলকাতায় এসে সেই বইটিই হল আমার প্রধান অনুপ্রেরণা। তাতে একটি অপরূপ ম্যাপে (ভগীরথ ও শিবের ছবি সমেত) মানস-যাত্রার মার্গও দেখানো রয়েছে। "গাইড-বহি" কিনা। যাত্রার সব খরচ-খরচা দেওয়া আছে—

প্রস্তুতি, খাওয়া, থাকা, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, ঘোড়া কুলি সমেত। "খাওয়া-খরচ জন-পিছু প্রতিদিন ১৷৷০ হইতে ২ পড়িয়া যায়—তবে গরীব যাত্রীরা খাওয়াদাওয়া কাপড়জামা কেনা সব করিয়া ৬৫-১০০ মধ্যে বদরীনাথ যাত্রা সমাপন করিতে পারে। পাহাড়ী ঘোড়ার ভাড়া ৷৷০ আনা মাইল প্রতি, তবে বিশেষ পাওয়া যায় না। কুলীদের মজুরী ছাড়া প্রত্যহ দুই পয়সার ছোলা খাইতে দিতে হয়।" এই গাইড-বহি পাঠকরতঃ কেউ যদি ভক্তিভরে দুই পয়সার ছোলা নিয়ে একজন কুলির কাছাকাছিও যান, তাহলে তাঁর কী হবে আমি ভাবতেও ভয় পাচ্ছি।

খাওয়ার খরচ এখনও ওখানে শস্তাই—দিনে দশ থেকে পনেরো টাকার মতন। ঘোড়া? মাইলপ্রতি আট আনা ছিল, এখন চোদ্দ কিলোমিটারে পঞ্চাশ টাকা (হিসেবটা আপনি কষে নিন)। যাই হোক, ওতে কেদারনাথের স্তোত্র আছে, বদ্রীনাথের মাহাত্ম্যবর্ণনা আছে, চারধামের মহিমাগাথা আছে। আর আছে কিছু অসামান্য মন্তব্য। যেমন এই তিনটি:

এক ॥ মানবের মনই মানবকে বন্ধনে জড়িত বা বন্ধনমুক্ত করে।

দুই ॥ নিশ্চিন্ত ও নির্দ্বন্দ্ব মনে, তন্ময় হইয়া, আস্তিকতার সহিত, সমস্ত ভুলিয়া, নিজে প্রসন্ন থাকিয়া ও অপর যাত্রীদিগকে প্রসন্ন করিয়া পথ চলিতে হয়। সেই সব যাত্রীই যাত্রার বাস্তবিক আনন্দ উপভোগ করে।

তিন ॥ উত্তরাখণ্ডের অদ্ভুত যাত্রামাহাত্ম্য আজও রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য তো রেলগাড়ি অপহরণ করিয়া লইয়াছে।

ইংরিজি বাংলা আরও কিছু বই কেনা হল। পরের বছর পুজোর ছুটি পেরিয়ে গেল। যাত্রা হোলো না। কলকাতায় ফিরে অবধি চেষ্টা করছি সঙ্গী সংগ্রহের। যাতে ট্যাক্সিভ্রমণ নিরাপদে এবং কম খরচে হয়। তা আমি একা চেষ্টা করলে কি হবে, কেদারনাথ-বদ্রীনাথের পক্ষে কোনোই চেষ্টা ছিল না। অতএব সঙ্গী আর জোটে না। বৌদি রিনিমা আর নামও করে না যাবার। অথচ স্বয়ং হৃষীকেশকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। বলেছি ঠিক আসবো, আবার আসবো, দেখা হবেই। আর কেউ যাক্ বা না যাক্—আমার না গেলেই নয়। সেই ১৯৮১-র পুজোয় প্রণাম করে এসেছি হৃষীকেশে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে, কনখলে আনন্দময়ী মাকে, ঋষিদের আশীর্বাদ কি বিফলে যেতে পারে? ১৯৮২-তে এঁরা দু'জনেই দেহ রাখলেন, হৃষীকেশ এবং কন্‌খল দুটি ঠাঁইয়ের আলোবাতাসের রং বদলে দিয়ে। বিরাশীর গ্রীষ্মে ঘোরাঘুরি অনেক হলো: ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ক্যানাডা। পুজোর ছুটিতেই দেশে ফিরে আবার বেরুনো অসম্ভব।

তাই ওটা পিছিয়ে দিতে হোলো।

মনকে বললুম সামনের বারে। গ্রীষ্মের ছুটি পড়লেই। যত কিছু কাজকর্ম থাকুক, সব ফেলে রেখে চলে যাবো। আমার মনের ভাবখানা ঠিক যেন কোনো মানত আছে, রক্ষা করতেই হবে।

৪

চলো দিল্লি পুকারকে

যেহেতু সেবার দিল্লি থেকে গিয়েছিলাম সেই জন্যেই এবারেও সোজা দিল্লি গিয়ে হাজির হব ঠিক করলুম। ট্যাক্সিভাড়া করে যখন যাবই তখন যে ক'জনকে পারি তাতে ভরে নিই, এই ভেবে শেষমুহূর্তে মা সঙ্গে দিয়ে দিলেন পিকোলোকে, আমার বড় মেয়ে—যার পার্ট ওয়ান পরীক্ষা এক মাস পরেই। আর একা একা স্ত্রীজাতির দু'জন ট্যাক্সি করে হিমালয়ের নির্জন বাঁকে বাঁকে ঘুরে বেড়াবে এটা সইতে না পেরে দীপঙ্কর শেষতম মুহূর্তে, বেলা ৫টার সময় জোকা থেকে রঞ্জনকে তুলে নিয়ে এল। রঞ্জনের জন্যে নিজের জামা-কাপড় দিয়েই একটা ব্যাগ গুছিয়ে দিল দীপঙ্কর—যেহেতু নিজের ছুটির আবেদন অফিস নাকচ করে দিয়েছে। উল্লাসে ভাসতে ভাসতে তিনজন যাত্রী দিল্লি রওনা হলেম। চেকার এলেন যখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। তখন খেয়াল হলো—টিকিট? ওদের টিকিটই নেই তো! টিকিট আছে তো কেবল আমার। আমি তো একলাই আসছিলুম।

যথারীতি সমস্ত আত্মীয় পরিজনই আপত্তি করছিলেন :

এ কি তোমার কুম্ভমেলা যে একরাত্তির দু'রাত্তিরেই হয়ে গেল? এ অনেক-দিনের ব্যাপার—অসুখবিসুখ করলে? বয়েস তো রোজ রোজ কমে যাচ্ছে না? তারপরে আরো সাতটা বছর গেছে—হেঁপো রুগীদের পাহাড়ে চড়া কি উচিত? হ্যাঁরে, তোর হার্টের সেই ব্যথাটা?

—ওসব কবেই সেরেসুরে গেছে। এখন হার্টে ব্যথা লাগেও না, করেও না। তাছাড়া একা তো ঠিক যাচ্ছিও না।

—তবে যে শুনলুম, বাড়ির কেউ যাচ্ছে না?

—বাড়ির কেউ যাচ্ছে না বটে তবে আরো অনেকেই যাচ্ছে।

—কারা?

—ওই কুম্ভমেলায় যারা গিয়েছিল না, তারাই যাচ্ছে।

—যাচ্ছে? তবু ভাল। বিপদে-আপদে ওরা তোকে দেখবে। আমাদের জন্যে গঙ্গোত্রীর জল আনতে ভুলিসনি কিন্তু। আর সব জায়গা থেকেই প্রসাদ

নিবি। তুই যেমন, হয়তো কিছুই আনবি না!

যাক, যে কোনো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে খুশি করে দিয়েছি মাসি-পিসিদের। কুম্ভে কারা গিয়েছিল? সারা ভারতবর্ষের মানুষ। তারাই তো যাবে কেদারনাথে, বদ্রীনাথে। আমার কথাটা মিথ্যে নয়। আমার সঙ্গীরা পথ জুড়ে ছড়ানো। আবার তারই প্রমাণ পাওয়া গেল যেই চেকার উঠলেন, আর আমাদের খেয়াল হোলো যে ওদের টিকিটই কাটা হয়নি! গুরুগম্ভীরা চশমাপরা একজন মাস্টারনী যে ভুলে ভুলে বিনা টিকিটে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে নিয়ে হাস্যবদনে এয়ার কন্‌ডিশণ্ড কামরায় উঠে বসে থাকে, এটা তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হবার কথা নয়। তাই তাঁরা বিব্রত হয়ে বার-বারই বলতে লাগলেন—"দুটো প্ল্যাটফর্ম টিকিটও নেই? কী আশ্চর্য! এখন কী করি? এদের নামিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।" দুঃসময়ে আমাদের অভিভাবক হয়ে উঠলেন মিস্টার মুখার্জী, আমার বন্ধুর দাদা। তিনি সপরিবারে এই কামরাতেই যাচ্ছেন। নগদ বিশ হাজার টংকা বেতনে এক বিদেশী কোম্পানীতে মাস্তানি করে এই দেশেই বসে উনি ওই মাইনেটা পান। তাই তাঁর আত্মবিশ্বাসের রকমটাই কিঞ্চিৎ আলাদা। এবং পরিমাণটাও (ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির দ্বিগুণ)। অনতিবিলম্বেই মিঃ মুখার্জী খানিক কহতব্য এবং খানিক অকহতব্য উপায়ে বহুৎ গচ্চা দিয়ে সমস্যাটা আমাদের পকেট থেকে চেকারদেরই পকেটে চালান করে দিলেন। ফলং পথে যে কোনো ইস্টিশানে রোরুদ্যমান অবতীর্ণ না হয়ে দিল্লি স্টেশনেই আমরা তিনটি টিকিট সমেত "সসম্মানে উত্তীর্ণ" হতে পারলুম।

"আপনারা রাইটাররা যে কী করেন?" খুব মাইল্‌ডলিই বলেছিলেন মিঃ মুখার্জী। "এত রাত্রে পথের মধ্যে বাচ্চা মেয়েটাকে নামিয়ে দিলে কী যে হত!" অবশ্য আমার বিশেষ দুর্ভাবনা হয়নি। প্রথম থেকেই 'যে খায় চিনি তার চিনি যোগান চিন্তামণি' পলিসিতে গা ছেড়ে আছি। যা হয় হবে। অতশত ভাবতে পারি না বাবা। তাহলে আর অত বড় ভগবান আছেন কী করতে, জগতের সব ভাবনা-চিন্তা যদি এই তুচ্ছ আমাকেই করতে হোলো!

অগত্যা ভগবান মিঃ মুখার্জীকে অকুস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। অকৃত্রিম স্নেহমমতা পরোপকারের ইচ্ছে এবং সক্ষমতার এমন সুঠাম সম্মেলন দেখা যায় না চট্ করে। তদুপরি এমন নিখাদ ভালোমানুষী!

৫

অর্থম্ অনর্থম্

আগে থেকেই দিল্লিতে বন্ধুবান্ধবদের বলে রেখেছি খোঁজখবর জেনে রাখতে। রত্না নিয়েছিল সব সন্ধান। তবে চারধাম যাত্রার নয়, শুধুই কেদারবদ্রীর। দিল্লি ট্যুরিজমের ট্যাক্সি—যাতায়াত পাঁচ হাজার। দিল্লি ট্যুরিজমের বাসট্রিপ—সাতশো দশ জনপ্রতি। তবে বাস না ভরলে ট্রিপ দেয় না। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। লাকসারি বাসট্যুরও আছে, তবে আগামী তিন হপ্তা বুক্‌ড।

নানা মুনির নানা মত। এ বলে এটা করো ও বলে ওটা কোর না, আর আমি তো একদম মনস্থির করতে পারি না। মহা মুশকিলে পড়লুম। দুটো জায়গা পাঁচ হাজার হলে, চারটে তো দশ হবে। পাঁচ বা দশ দুটোই আমার ক্ষমতার বাইরে। এদিকে সঙ্গে মেয়ে। তিনি আবার বাসে চড়ে বসতে পারেন না। কলকাতার রাস্তায় আমার গাড়িতেই তাঁর মাথা ঘোরে, গা গুলিয়ে ওঠে। দুটি কন্যাই এ বিষয়ে এক। শুই মেয়েকে নিয়ে বাসে করে পাহাড়ী পথে পথে এঁকেবেঁকে ওঠানামার প্রশ্ন নেই। সেই রিনিমার প্রদর্শিত লাল বাসের গায়ের রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট স্ট্রাইপস মনে পড়ে গেল। নাঃ! আর বাসে যাওয়া হবে না। গাড়িই নিতে হবে। বরং কাল রাত্রের ট্রেনে হরিদ্বার চলে যাই। সেখান থেকে হৃষীকেশ। সেখান থেকে ট্যাক্সি।

এখানে এসে শুনছি ওই অঞ্চলে দৈনিক ৪৲/৫৲-তে থাকা-খাওয়ার গল্প। সব গুল্‌গল্পই। জনপ্রতি এক একটা মীল ৪৲ থেকে ৬৲ এবং বাথরুমসহ ভদ্রস্থ বাসস্থানে ১০৲ থেকে ৫০৲ পর্যন্তও লাগে। অর্থাৎ খরচ আছে। তদুপরি ট্যাক্সি-ভাড়া। পাঁচজনকে নেয়। অর্থাৎ আমরা আরও দুজনকে নিতে পারি। এখনও যদি আড়াই থাকে, তবে হয়তো বা দেড় হাজারেই—কিন্তু এ কী, আমি তো কেবল কেদারবদ্রী ভাবছি। কিন্তু যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী সুদ্ধু? দ্বিগুণ? কি হয়তো তারও বেশিই পড়ে যাবে। তার জন্যে যাত্রী জোটাও শক্ত। কিছু টাকা ধার নিতে হবেই দিল্লি থেকে। ধার মানেই তো শোধও দিতে হবে? কে জানতো ভাড়া এত বেড়ে গেছে? একা এলে বাসেই চলে যেতুম। এখান থেকেই বাসে বাসে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেরাদুন, মুসৌরী, শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ—যেখানে খুশি থামতে থামতে—বাস বদলাতে বদলাতে। যতদিন খুশি থাকতে থাকতে! সেই যাওয়াই ঠিক হত। এখন হয়ত যাওয়াই হবে না। হৃষীকেশ থেকে চারধামের ট্যাক্সিভাড়া কত কেউ বলতে পারলো না। তবে

পঁচের কম হবে না—এটা সবাই বললে। তার ওপর তিনজনের থাকা-খাওয়া পুজো-পাওা ঘোড়া-ডাণ্ডী এটা ওটা কেনা। ওরে বাবা, এ তো বিলেত যাবার সমান। তাহলে বরং নাই বা গেলাম! রঞ্জন বলল, "তাহলে খুবই ভাল হয়, আমার অকারণ কামাই হচ্ছে। ছুটি পাওনা নেই। দীপঙ্করদার চাপে পড়ে লীভ উই দাউট পে-তে এসেছি।" পিকো বলল, "তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আমারও হাতে সময় নেই। সামনে পার্ট ওয়ান, জার্মানটা একদমই তৈরি হয়নি। দিম্মার আর শিবুমামার জোরজুলুমে এসেছি—চল, দিল্লি বেড়িয়েই ফিরে যাই।"

যাত্রীসঙ্গীদের এই অপরূপ প্রেরণাপূর্ণ কথাবার্তা শুনে মন অমৃতরসে সিঞ্চিত হল। গেলেও ভাল, না গেলেও ভাল—এই অবস্থায় এদের নিয়ে রওনা হয়েছিলুম। এখন দেখি দুজনেই না-গেলেই ভাল-য় এসে দাঁড়িয়েছে। এদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়া যায়? এত অনিচ্ছুক সঙ্গী নিয়ে ভ্রমণে বেরুলে "যাত্রার বাস্তবিক আনন্দ অনুভূত হইবে" কী উপায়ে?

আমি বললুম, "যাক গে, ওরা না-হয় কলকাতাই ফিরে যাক। আমি যাবই। ট্রেনে হরিদ্বার চলে যাই কালই।" মিঃ মুখার্জী আবার উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। রাত্রে তো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। ওখানে নিশ্চয় অনেকের সঙ্গেই দেখা হবে আপনার।"

৬

শিকে ছিঁড়ল

দেখা হোলোও। নানা ধরনের শক্তিমান, পদমর্যাদাবান ব্যক্তিত্বে দিল্লি শহর পরিপ্লাবিত। তাদের মধ্যে আমার মতন তৃণদূর্বাদলেরও মহীরুহ বন্ধুর অভাব নেই। আমার যাত্রার যন্ত্রণা শুনে হাত উল্‌টে একজন বললেন, "এজন্য ভাবনার কী আছে? আমার সেক্রেটারী সব বন্দোবস্ত করে ফেলবে। আপনি কেবল একটা দিন সবুর করুন। কেদারবদ্রী অনবরত সবাই যাচ্ছে। বি আওয়ার গেস্ট!"

—তার মানে?

—মানে বোঝার কিছুই নেই। এটা পি. আর. ফর্ম আর কি—পাবলিক রিলেশানস্। কালকের দিনটা আমাকে দিন, পরশুই আপনাদের রওনা করিয়ে দেব। কোথায় কোথায় যেতে চান? জায়গাগুলোর নাম বলুন তো?

—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ। এই তো, ব্যাস। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স বন্ধ। হেমকুণ্ডে হাঁটতে হয়। ওসব যাব না। গোমুখ ইচ্ছে

ছিল, কিন্তু রওনা হবার সময় গোমুখ যেতে মা বারণ করে দিয়েছেন। কাজেই আর যাবার কিছু নেই। পি. আর. দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গড়গড় করে বলে যাই। মন দিয়ে শুনে বন্ধুটি বললেন, "ও. কে.। কাল টেলিফোনে সব জানাব। ইতি-মধ্যে প্লীজ রিল্যাক্স। বাসে করে বেরিয়ে পড়বেন না। কী ভাবে কী করা যায় দেখছি। হয়ে যাবে একটা কিছু। ইউ শ্যাল বি আওয়ার গেস্ট।"

টেলিফোন এল। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কোম্পানির গাড়ির ড্রাইভার এখানে আপনাকে তুলে নেবে। হৃষীকেশে আপনি কোম্পানিরই গেস্টহাউসে থাকবেন, ওখানকার গাড়ির ড্রাইভার আপনাদের চারধার ঘুরিয়ে আনবে। ওসব অঞ্চলে হিল্-ড্রাইভিং জানা চাই কিনা? আমাদের দিল্লির ড্রাইভার ওটা ঠিক পারবে না। পাহাড় থেকে ফিরে আবার আমাদের কোম্পানির গাড়িই আপনাকে দিল্লি নিয়ে আসবে। উইল টেন ডেজ বি ইনাফ্! আর ডু ইউ নীড ফিফটিন্?

আমি টেলিফোনটা কানে ধরেই আছি, কিন্তু ঠিক বাংলা ভাষা বলে বোধ হচ্ছে না।

"বি আওয়ার গেস্ট" মানে তো নিখরচায়। কিন্তু সেটা ভুল বুঝিনি তো? গাড়ি, ড্রাইভার, টেন-ফিফটিন ডেজ, গেস্ট-হাউস—এসব কী বলে রে বাবা! আমি চুপচাপ শুনেই যাচ্ছি। বিশ্বাস করতে পারছি না। প্রশ্ন করেই উনি মুশকিলে ফেলে দিলেন। দশ দিন, না পনেরো দিন? খরচ-খরচা কত? বুঝতেই তো পারছি না ব্যাপারটা। এটা কি সত্যি?

—খরচ-খরচা কত, তার ওপরে অনেকটা নির্ভর করবে, তাই না? গাড়ি ড্রাইভারের জন্য কি ডেইলি-বেসিসে—?

—কী আশ্চর্য! কালই বললাম না? ইউ আর আ ডিয়ার ফ্রেণ্ড অব্ আওয়ার হাউস। অ্যাণ্ড আওয়ার মোস্ট অনারড্ গেস্ট। আপনাকে আতিথ্য দিতে পেরে আমরাই কৃতার্থ। আপনার কোনো খরচের প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে শুধু গাড়ি ড্রাইভার পেলেই তো হোলো না? প্রত্যেক জায়গায় বুকিং চাই! সেটার সময় নেই। ওসব জায়গায় ফোন করাও অসম্ভব। এখন 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী' অবস্থায়, সীজনের শেষ প্রান্ত—সব ট্যুরিস্ট-লজ ভর্তি। আপনারা থাকবেন কোথায়? 'চেষ্টা করছি এক মিনিস্টারের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে নেবার, যাতে জায়গা পেতে সুবিধা হয়। দেখি!

ঠিক বেলা একটায় ঝকঝকে চকচকে জানলায় জানলায় সাদা লেসের পর্দা আঁটা সবুজ গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ধবধবে উর্দিপরা তরুণ ড্রাইভার নেমে নমস্কার করে বললে, "দ্য কার ইজ হিয়ার, ম্যাডাম। লাগেজ রেডি!"

জাদুর চটটি পায়ে গলিয়ে হাতে হাতে তালি পড়লো। চলো হৃষীকেশ! রঞ্জন উঠলো, পিকো উঠলো, আমি উঠলুম। হৃষীকেশ নয়, প্রথমে চলো জনপথ আর পালিকাবাজার। রঞ্জনের কিছু জামাপ্যাণ্ট কিনতে হবে। টুপি চাই জুতো চাই। আমিই কেবল টুম্পার স্কুলের পি. টি. জুতোজোড়া নিয়ে এসেছি পাহাড়ে চড়বার জন্যে। রঞ্জন আর পিকোর পায়ে চটি।

বাজার করে রওনা হতে হতে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হয়ে গেল।

৭

যাত্রা

কল্পতরুর যাত্রা শুরু।

কী হলো? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? শুধু কেদার-বদ্রীর পাঁচ হাজার—ট্যাক্সিতে। সেই শুনে পরশু যাত্রার আইডিয়াটাই ত্যাগ করছিলুম। মনে আছে তো? আর এখন? রওনা হলুম চারধাম। ফ্রী। বিনা খরচে। বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে দেখিবে? আর ভাগ্যিস, কুম্ভের যাত্রাটা ইনি পড়েছিলেন! সেই থেকেই নাকি তাঁর ইচ্ছে ছিল একটু আরামে যদি এই মহিলাকে তীর্থভ্রমণ করানো যেত? আহা, কত কষ্ট করেছি সেবার? কিন্তু এই আরামই বোধ হয় আমার কাল হলো। কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া কি তীর্থভ্রমণ হয়? তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ হওয়া চাই—তা নইলে তীর্থপতির টনক নড়বে কেন? মনটা যেন ভরে না। কিন্তু আমার বেলায় তীর্থপতি নিজেই যদি সেধে সেধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত উপায়ে আকস্মিক ভাবে বিলাসভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেন, তবে আমি কী করি? তারপর থেকে কাণ্ড-কারখানা সবই যা হতে লাগলো তা বলবার নয়। লেডী গুপী গাইন হয়ে উঠলুম বলতে গেলে।

হাতে একগুচ্ছ চিঠি। কতকগুলিতে আমাকে ইনট্রোডিউস করা হচ্ছে—ইনি প্রসিদ্ধ লেখিকা, বাংলা সাহিত্যের গজমোতিবিশেষ, আমাদের হাউসের গভীর শুভার্থী প্রবল বন্ধু এবং আমাদের সম্মানিত অতিথি, আপনার যথাসাধ্য সহায়তা এঁর প্রতি দিলে আমাদের হাউস কৃতার্থ হবে।

আর কতকগুলিতে বলা হচ্ছে—ইনি প্রসিদ্ধ লেখিকা এবং অমুক মন্ত্রীর ভাইঝি (?), এঁর জন্য অতি অবিশ্যি ঘরটর দেবেন। কেন রে বাবা আমি অমুক মন্ত্রীর ভাইঝি হব? অল্পস্বল্প চিনি এই পর্যন্ত। বুঝলাম এসব জায়গায় তো কোম্পানির নামের জোর খাটে না। তাই মন্ত্রীর নাম ধরে টানাটানি করে কোম্পানির হাত শক্ত করছেন আমাদের বন্ধু মশাই। সত্যিমিথ্যে চিঠিপত্রের দৈব-

দুর্দৈব অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তো আমরা জয় বাবা কেদারনাথ জয় বাবা বদ্রীনাথ জয় যমুনামাঈকি জয় গঙ্গামাঈকি বলে বলে হুউশ করে দিল্লি থেকে রওনা হয়ে ভেসে গেলুম।

যেন স্বপ্নের মধ্যে।

৮

হৃষীকেশ

তবু লোকে বলবে ঈশ্বর নেই? নেই তো আমি এই এয়ারকণ্ডিশণ্ড ভাবল স্যুইটে শুয়ে শুয়ে কাচের দেয়ালের বাইরে ঝাউবন আর হিমালয় দেখতে দেখতে আকাশপাতাল ভাবছি কী করে? পাশের স্যুইটে রঞ্জন। আমার পাশে পিকোলো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝাউবনে অন্ধকার নেমেছে। আসতে আসতে অদ্ভুত একটা চাঁদ দেখতে পেলুম হরিদ্বারের আকাশে। চাঁদটা ভাঙাচোরা, মলিন, এবং বেশ দীনদুঃখী। তার মাথার ঠিক ওপরে প্রকাণ্ড জ্বলজ্বলে একটা দাম্ভিক তারা। হাতি কাদায় পড়েছে আর ব্যাঙে পদাঘাত করছে—ঠিক যেন তার নৈসর্গিক ছবি। সারাটা আকাশ ঘোর অন্ধকার। একটুও অন্ধকার কমাতে পারছে না ঐ আঁকা-বাঁকা একটুকরো চাঁদ। আর কোনো তারাও নেই। এটা কি লুব্ধক? ডগ্‌স্টার? বোধ হয় তাই। বড় ভয়ানক দেখাচ্ছিল ওকে আজ।

পথে হরিদ্বার দেখতে দেখতে এলুম। খুব ভালো লাগছিলো। এদিকের প্রাচীন তীর্থনগরী, পিকোলো এলাহাবাদ, গয়া, কাশী কিছুই ছাখেনি। রঞ্জনও না। (রঞ্জন কে? আমার একটি ছোট ভাই। দীপঙ্কর, রঞ্জন, শিবু—এরা সব আমার পরিবারের অন্তর্গত। এদের চিনে রাখুন।) পুরোনো তীর্থস্থানের এই যে একটা আলাদা চরিত্র আছে উত্তরপ্রদেশে এটা আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

পথে একটা জুলুস বেরিয়েছিল। বিয়ের মিছিল। ঘোড়ার ওপরে বছর ষোলো-সতেরোর বর। দাড়িগোঁফ গজায়নি। রাস্তায় বাড়ির মেয়েরা নাচছেন। বয়স কোনো ব্যাপার নয়। এঁরা গৃহস্থ পরিবার। আগে আগে মাইকে গান গাইতে গাইতে একজন হেঁটে যাচ্ছেন। তিন-চাকার সাইকেলগাড়িতে চড়ে সঙ্গে যাচ্ছেন অ্যামপ্লিফায়ার। আমি ড্রাইভারকে "দাঁড়ান! দাঁড়ান!" বলে গাড়ি থামালুম। দেখতে হবে। ওই ভাঙা চাঁদের নিচে, পিচের পথে, ওই নিঃশব্দ গঙ্গার পাশে, ম্লান হলুদ বাতি-জ্বলা, ধূপধুনোর গন্ধওলা কয়েকশো বছরের প্রাচীন গলির মুখে দাঁড়িয়ে ওই উচ্ছল নৃত্যগীত যে কতটা অদ্ভুত লাগলো, কি বলব? গানটা বোধ হয় হিন্দি ফিলমের। গানের বোল হচ্ছে :—"কচৌড়ি খায়েগী ছোরী—। ও পাত্তা

চাটেগা ছোরা।" সামনে দাঁড়ালো এই মুহূর্তে দুটি ভিন্ন-ভারতবর্ষ, তার বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্মীয় অতীত আর ফিল্মি বর্তমান নিয়ে। আর মাথার ওপরে সাক্ষী রইল চিরন্তন সময়—চাঁদে বিকীর্ণ, গঙ্গায় বহমান।

গতিরুদ্ধ হয়ে ড্রাইভার অবাক, একটু মজা পেল, আর একটু বিরক্তি। সবিনয়ে জানতে চাইল, এবার রওনা হই? পথে একটুখানি বনাঞ্চল পার হতে হয়। সেখানে হঠাৎই গাড়ির সামনে বেরিয়ে এল একটি শিশু—বন থেকে। বুনো শেয়ালের মতো। একেবারেই গাড়ির নিচে। চাপা দিতে দিতে অনেক কষ্টে গাড়ি সামাল দিয়ে দিল ড্রাইভার। "শালাঃ—মার্ ডালাথা মুঝ্‌কো" বলে কপালের ঘাম মুছলো জগৎ সিং। হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলুম শিশুটির দু'চোখই সাদা, মণিহীন।

"আন্ধা! বিচারাঃ! ওফ্! ভগবাননে বচা লিয়া উস্‌কো!" মুহূর্তেই জগৎ সিং কণ্ঠস্বরে একেবারে অন্য মানুষ। অভিভাবকহীন শিশুটি বোধ হয় পাগল। নিজের মনেই চলতে লাগলো। নির্জন বনের পথে। একা!

৯

হয়তো ভোরের কাক হয়ে

অবাক সেই সূর্যোদয়। সেই আকাশ, সেই পাহাড়, সেই গঙ্গা। কিন্তু এবার কানে নেই শঙ্খঘণ্টার বাজনা, নেই দেবমূর্তিদের স্নান করাতে করাতে দক্ষিণী পুরোহিতের সস্নেহ মন্ত্রোচ্চারণের সুর। তার বদলে পেলাম—কী? বশংবদ এয়ারকণ্ডিশনারের কলগুঞ্জন। সামনে কাচের বাইরে খোলা সযত্নচর্চিত কদমছাঁট মাঠ, যার নাম লন, তার ওপারে সৈন্যের মতো সারিবাঁধা ডিসিপ্লিন্‌ড ইউ-ক্যালিপটাস। ওপাশে উহ্য খাদের মধ্যে গঙ্গা। তার ওপারে জঙ্গল পাহাড় ঝাউবন।

ভোর পাঁচটায় যখন সূর্যের জন্যে উঠেছিলুম, আকাশ ফর্সা হচ্ছিল, সূর্য ছিল না, দোরের সামনে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তলাল পপিফুল ফুটেছিল। এখন সূর্যের আলোতে দূরের পপিগুলি গোলাপ হয়ে গেছে, আর কাছের পপিরা হয়েছে পিটুনিয়া। কুয়াশায় যারা দুর্লভ পপি ছিল, রোদ্দুর তাদের সস্তা আটপৌরে করে দিয়েছে। আটটা বাজে। একটা কাকপক্ষী ওঠেনি। কেবল একটি কোকিল আপ্রাণ ডেকে যাচ্ছে। রাত্রেও সে বহু ডাকাডাকি করেছে। কি অলস রে বাবা এখানকার পাখিরা! আমার মেয়ে দুটির মতো স্বভাব দেখছি। বেলা ৯টা না বাজলে উঠবে না।

৮১ সালে এখানে এসে একটা ভোরবেলাতে রিনিমা বৌদি আর আমি মুনি কী রেতী ঘাটে গিয়েছি চা খেতে। তখন সদ্য ভোর হচ্ছে গীতা ভবনের পিছনের পাহাড়ী আকাশে। চায়ের দোকানে তখনও কাঠের জ্বালের ধোঁয়া উঠছে। মুনি কী রেতীর বাঁধানো উঠোনটা ঝাঁট দিচ্ছে ধূলোর মেঘ উড়িয়ে একজন দেহাতী বৃদ্ধ। আমাদের দেখে ফোকলা হেসে ভারী সুন্দর "নমস্তে" বলল। সবারই মেজাজ ভোরবেলায় ভালো। আমার মনটাও খুব খুশি-খুশি লাগলো। হঠাৎ একটি কাক। কাকটা এসে লাফিয়ে নেচে বেড়াতে লাগলো আমাদের সামনে, আর ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে আমাদের ঘোরতর পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। আমি খুশি হয়ে বলে ফেললুম, "হ্যালো, কাক! গুড মরনিং!" কাক কী বুঝলো সে-ই জানে, সুন্দর করে ঘাড়টি বেঁকিয়ে গুরুগম্ভীর জবাব দিল, "কা—!"

ঐ ঝাড়ুর ধুলোয়, কাঠের ধোঁয়ায়, আধোভোরে কুয়াশামাখা নৌকা-বাঁধা ঘুম-ঘুম নদীর তীরে হিমালয়ের ছায়ায় ভোরের প্রথম কাকটিকে দেখে বুক ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, মনে পড়েছিল হঠাৎই, 'হয়তো ভোরের কাক হয়ে—'

আজ, এই এয়ারকণ্ডিশান্ড গেস্ট-হাউসে শুয়ে সেকথা মনে এল। খুব ইচ্ছে হল মুনি কী রেতীতে আরেকবার যেতে। এমন সময়ে দোরে টোকা পড়ল।—"চায়।" চা দিয়ে বেয়ারা জানালো—"গাড়ি তৈয়ার। বাহার যানা হ্যায় তো—" আরে হাম্‌ভি তৈয়ার। এক্ষুনি মুনি কী রেতী যাবো। চল্ চল্—ওঠ্ ওঠ্।

তারপর মুনি কী রেতী।

কিন্তু এত বেলা হয়ে গেছে!

এখন কি আর তার সঙ্গে দেখা হবে? গেলুম। চা খেলুম। সিঙাড়া জিলিপি পর্যন্ত ভাজা হয়ে গেছে। কাকের সঙ্গে আজ দেখা হোলো না।

১০

হিমালয়

—"তুমি পর্বত ভালোবাসো, না সমুদ্র?" বেড়াতে বেরুতে হলেই সাহেবদের এই এক ছকবাঁধা প্রশ্ন। কেন যে এই প্রশ্নটা ওঠে, আমি বুঝি না। এই হয় এটা নয় ওটা—এমনি দ্বিধারায় ভাবনা করাই আমার পোষায় না, এই ভাবধারাটা পুরো ধার-করা, সায়েবীয়ানা। আমাদের তো আইদার-অর বলে কোনো ব্যাপারই নেই। হয় এটা, নয় ওটা, নইলে সেটা, নইলে আরেকটা,—সব সময়ে একসঙ্গে একশোটা চয়েস দিতে পারি। সে যে প্রশ্নই করো না কেন। জগৎ কী? জীবন

কী ? মৃত্যু কী ? ঈশ্বর কী ? আনন্দ কী ? এটা না ওটা না সেটাও নয় করে করে এগুতে এগুতে সেই কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি ! হয় সমুদ্র, নয় পাহাড় ? কেন ? এটা কি ইংল্যাণ্ডের মতন একমুঠো দেশ ? আমাদের আরো তো কতো কিছু রয়েছে দেখতে যাবার। জলজঙ্গল, বনপাহাড়ী, শালপিয়াল, বাঘ-ভাল্লুক, ঠাকুর-দেব্‌তার ঠাঁই, রাজারাজড়ার প্রাসাদ-কেল্লা-স্মৃতি-সমাধি—কী নেই ? সমুদ্রেও যেতে হবে না, পর্বতেও নয়।

বরং মরুভূমিতে যেতে পারো। সেখানেও কি দেখবার জিনিস কম আমাদের ? তীর্থও পাবে, প্রাসাদও পাবে ; কেল্লাও পাবে, জীবজন্তুও পাবে। ধর্ম করো, কি শিল্প করো—ইতিহাস করো কি বিজ্ঞান করো। যা প্রাণ চায় তাই করো। আসমুদ্র-হিমাচল মানে তো সমুদ্র আর হিমাচল নয় !

সমুদ্রতীরে যাওয়া মানে যেমন সমুদ্রযাত্রা নয়, তেমনি হিল-স্টেশনে যাওয়া মানে হিমালয় যাত্রা নয়। পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বললে লোকে তো ত্রিযুগীনারায়ণ কি নীলকণ্ঠের কথা ভাবে না। বীচ-রিসর্টসে যেমন গভীর গম্ভীর নিশ্চল মধ্য সমুদ্র নেই, হিল-স্টেশনে তেমনি হিমালয় থাকেন না। হিমালয় একেবারে অন্য ব্যাপার। পাহাড়, না সমুদ্র—এই প্রশ্নোত্তরের আওতার বাইরে হিমালয় নামে অন্য এক ভূ-ভূর্বস্ব দেশ আছে। অন্য এক লোক। যার ছবি ভূগোলের খাতায় বাদামী রঙে কিরিকিরি করে আঁকা যায় না। তার তো মানচিত্র হয় না, তার তো হয় সম্মান-চিত্র। এভারেস্টের চূড়োয় গিয়ে উঠলেও, হায়রে, এডমাণ্ড হিলারীদের সঙ্গে সেই হিমালয়ের এজন্মে দেখাই হয় না। হবে কি করে ? হিমালয়কে তো দেখা যায় না, হিমালয় দেখা দেন। এ তো তোমার আল্পস পাহাড় নয়, টিকিট কেটে যে কেউ যাবে সে-ই দেখে ফেলবে।

হিমালয়ের ভেতরে যে রয়েছে আরেকটা কাণ্ডকারখানা—যার জন্যে তাকে 'দেবতাত্মা' বলে ডাকা যায়, 'ভারতাত্মা' বলে ডাকা যায়। আল্পস পাহাড় তো ইউরোপের আত্মা নয় ? মানচিত্রে অবস্থিত শৈলশ্রেণী মাত্র। হাজার হাজার বছর ধরে পুরাণে, ধর্মগ্রন্থে, রসসাহিত্যে গড়ে ওঠা হিমালয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবে কোন্ আল্পস ?

এই হিমালয়েই এবার আমার যাত্রা। হিমালয়ে যেতে অন্য ড্রাইভার লাগবে। অন্য গাড়ি। ধবধবে সাদা অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়ালো—তার জানলায় জানলায় নীলরঙের পর্দা। ঝকঝকে উর্দি পরা সুজন সিং নেমে এসে নমস্কার করে বলল —"নমস্তে বিবিজী। গাড়ি তৈয়ার। লাঞ্চ-বক্স বি ডাল্ লিয়া। আর কম্বল তাকিয়া উবারা উঠা লেঁ ?"

গেস্ট-হাউস থেকেই প্রত্যেককে কম্বল, চাদর, বালিশ দিয়ে দিলেন, সঙ্গে লাঞ্চ, ডিনার, স্ন্যাক্স, আর জরুরী ওষুধপত্রের একটা থাম। আর হাতে আবার এক-তাড়া চিঠি। কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালাতে, আর গাড়োয়ালমণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট লজে ঠাঁই দেবার অনুরোধ-পত্র।

সুরথ সিং এই গাড়োয়ালেরই মানুষ। অনেকবারই গাড়ি নিয়ে কেদারবদ্রী গেছে। যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী যায়নি। তাই তার নিজেরও খুব উৎসাহ যেতে। ভোর ৬ টায় হোলো না, ৭টায় বেরিয়ে পড়লুম। দেহরাদুন মুসৌরির পথে।

১১

সহস্রধারা

গতকালও আমরা দেরাদুনে গিয়েছিলুম জগৎ সিং আর রামপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে, সে-পথই ছিল আলাদা। একের পর এক নুড়িঢালা শুকনো নির্জলা চওড়া পাহাড়ী নদীর সোঁতা পেরিয়ে, নানান্ বনজঙ্গল দিয়ে পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে। পথে একটা বেড়াল চোখে পড়তেই জগৎ সিং থুথু ফেলে কান মুলল। বড়ই অলক্ষণ যাত্রাপথে বেড়াল দেখা। এক এক অঞ্চলের ড্রাইভারদের এক-একটা আলাদা ধরনের কুসংস্কারের ঐতিহ্য থাকে। জগৎ সিং সোসাল সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু সংস্কারমুক্ত নয়। এই নিয়ে শর্মাজী ওকে খ্যাপাচ্ছিলেন সর্বক্ষণ। আমাদের গন্তব্য ছিল সহস্রধারা ঝর্না।

দিল্লিতে সুনীলদা বৌদি বার বার বলে দিয়েছেন—"দেখে যেও"। ছেলেবেলায় মা-বাবার সঙ্গেও এসেছিলুম, কিন্তু ভালো মনে নেই। বিয়ের পরেও স্বামীর সঙ্গে মুসৌরী এসেছিলুম, তখন কেম্প্‌টি ফল্‌সে গেছি, সহস্রধারায় যাইনি। শর্মাজী সঙ্গে এসেছেন পথ দেখাতে। তিনিই জমিয়ে রেখেছেন সারাটা রাস্তা হৈ-চৈ করে। পথটথ তিনি চেনেন না। প্রথমেই আমরা পথ ভুল করে অনেক দূরে রায়পুর বলে একটা এক্‌লা-ফ্যাক্‌লা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামে চলে গেলুম। কী সুন্দর লুকোনো মতন সেই মুসলমানী গ্রামটি। বোরখা পরা মেয়েরা আর ছোট্ট ছোট্ট মস্‌জিদের পরিচয়ে তার চরিত্র চেনা যাচ্ছে। কী চমৎকার সব কুকুর এখানে! প্রত্যেককে আমাদের কলকাতার বাড়ির তাওয়াংয়ের মতন দেখতে। তাওয়াং তিব্বত বর্ডার থেকে আমার কুড়িয়ে পাওয়া কুকুর। রায়পুরে চমৎকার নীল একটা শীর্ণ জলস্রোত আছে। নালাই বলবো, সেটাকেই শর্মাজী সহস্রধারার একটি ধারা বলে চালাতে চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে যেতে স্বীকৃত হলেন। সহস্র-ধারায় পৌঁছে সবাই খুব খুশি। ঝর্নায় স্নান করবে বলে পিকোলো আর রঞ্জন

তোয়ালে এনেছিল, কিন্তু স্নানের উৎসাহ রইল না এমন নোংরা আশপাশ। আব্রুও নেই। জগৎ সিং কিন্তু নেমে পড়লো রঞ্জনেরই তোয়ালেটা নিয়ে। আনডারওয়্যার পরে দিব্যি নেয়েধুয়ে উঠলো। পুণ্য হয়ে গেল একটু এই ফাঁকে। সহস্রধারার নামে একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে, যার বলে সে পুণ্য দিতে পারে। রঞ্জন যত মুগ্ধ হয় আমি তত বলি, ওরে, এ তো কিছুই নয়। এরকম লক্ষ লক্ষ দেখবি। এ বছর দেহরাদুন অঞ্চলে খরা—মাটি শুকিয়ে ধু-ধু করছে। সহস্র-ধারার যৌবনেও খরা লেগেছে। জল কোথাওই বেশি নেই।

পথের ধারে পাহাড় খুঁড়ে চারদিকে শ্লেট রং-এর পাথরকুচি সাজিয়ে রেখেছে—যেদিকে চাইবে চলেছে পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে পাথরকুচি চালান দেওয়া। সর্বত্র লরি। সোডিয়াম সালফেট, না ক্যালসিয়াম কার্বনেট—কী সব যেন বলতে লাগলেন শর্মাজী। মোট কথা, এই সব প্রস্তরখণ্ড থেকে সংগৃহীত হবে কতিপয় কেমিক্যাল্স। শর্মাজী দারুণ লোক। জগৎ সিং যখনই একটু আন-কোঅপারেটিভ হয়, তখুনি তাকে গুরু মহারাজ, মহাপ্রভু, প্রভুজী, মেরে পুরুষোত্তম ইত্যাদি সম্বোধনে জল করে ফেলেছেন। এই শর্মাজী অদ্ভুত মানুষ। বিয়ে-থা করেন নি। মাকে নিয়ে একাই থাকেন। হৃষীকেশ বাজারে নিজের পৈতৃক বাড়ি ও মিষ্টির দোকান আছে। এমন প্রাণবন্ত, ফুর্তিবাজ, হাসিখুশি মানুষটিকে সঙ্গে পেলে আমাদের যাত্রা সত্যি জমতো ঢের ভালো। আজ সুরথ সিং ওপথে না গিয়ে শহর দিয়ে-দিয়েই চলে এল দেহরাদুন। সেখান থেকে পাহাড়ে চড়া শুরু হল—মুসৌরির পথ। আর শুরু হল পথে পিকোলোর গা গুলিয়ে ওঠা। পথে টোল গেটে থামতে হল। তখন রঞ্জনকে পাঠালুম লেবু কিনতে। একটা পানের দোকান থেকে বারো আনা দিয়ে একটি লেবু নিয়ে এল। আর একটি অরেঞ্জ ড্রিংক। ইত্যাকার প্রচেষ্টায় পিকো তো একটু স্বস্তি পেল। আট টাকা শুল্ক দিয়ে গাড়ি চলল।

১২

ফুলবালা

পথে ফের সমস্যা। নাকে প্রবল পেট্রলের গন্ধ। এটা আবার কোথা থেকে? এর জন্যেই তো গা সবারই গুলিয়ে উঠতে পারে। গাড়ি থামানো দরকার। সুরথ সিং বললে, বিশ লিটার রিজার্ভ পেট্রল একটা বোতলে আছে। তার মুখ থেকেই উপচে পড়ছে। সেটা কমাতে হবে। কিছুটা ঢেলে নেওয়া হলো গাড়িতে—যাতে উথলে ওঠার সম্ভাবনা কমে। আবার যাত্রা। পিকোর জন্যে টাটকা পাতার সুবাস সংগ্রহ করতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুরভিত একটি

উদ্ভিদ আবিষ্কার করলুম। পাতাগুলি চন্দ্রমল্লিকার পাতার মতোই দেখতে। কিন্তু ফুল নেই। এই সময় সুরথ সিং একরকম কচি কচি ফল তুলে এনে পিকোকে খেতে দিল। কমলা রঙের ছোট্ট মালবেরির মতো দেখতে। টকমিষ্টি খেতেও। খুব কাঁটাওলা ঝোপে ফলেছে। খেয়ে ভালো লাগাতে আবার গাড়ি থামানো হলো। এবার রঞ্জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফল তুলতে, হাতে সাজির বদলে একটি সেলোফেনের ঠোঙা দিয়ে। কাঁটা হেরি ক্ষান্ত না হয়ে অতি সন্তর্পণে বহু সময় নিয়ে, মন দিয়ে রঞ্জন ফল তুলতেই লাগলো।

গাড়ির দূরত্ব থেকে ওকে ফুলচয়নে রত আশ্রমবালার মতো দেখাচ্ছে। বুনো মালবেরি ফল খেতে খেতে মুসৌরী। সেখানে আরেক রকম ফল বিক্রি হচ্ছে—খুবানী। স্পষ্ট দেখলুম কাঁচা এপ্রিকট। মুসৌরি শহরের ভিতরে গাড়ি ঢুকতে দিত না আগে। গতবার যখন অমর্ত্যর সঙ্গে বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিলাম দিল্লী থেকে গাড়িতে, সেবারে গাড়ি শহরের বাইরের পার্কিঙে রাখতে হয়েছিল বলেই স্মরণ হচ্ছে যেন। গাড়ি যেখানে থামলো সেখানে একটা নল থেকে পীনে-কা-পানি ঝরছিল—এত শীতল, এত মিঠা পানি খুব কমই খেয়েছি জীবনে। কুলিরা বোঝা নামিয়ে মুখহাত ধুচ্ছে সেই জলে। আমরাও ধুলুম। পিকো অনেকটা তাজা হোলো। পাশ দিয়ে একটা খচ্চরে-টানা বাক্স-গাড়ি ভর্তি কিছু ছেলেমেয়ে গেল, পাহাড়ী মানুষজন, একঝলক বিদেশী চার্লি-পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। এ অঞ্চলেও বেশ স্মাগলিঙের ব্যাপার-স্যাপার আছে তাহলে ?

১৩

গাড্ডি হটাও !

মুসৌরি থেকে খানিক দূরে কেম্পটি ফল্‌স্। চমৎকার ঝর্না। অনেক দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে সেখানে গাড়ি ও বাসের সারি। বাস থেকে টিফিন ক্যারিয়ার, শতরঞ্জি, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে গৃহস্থরা নামছেন। যতই রূপ থাক, নেহাৎ উটকো বিলিতি ঝর্না এই কেম্পটি ফল্‌স্। নামের মতনই সে বেচারার কোনো পৌরাণিক ঐতিহ্য নেই। তাই তার জলে পুণ্যস্নান হয় না। সে শুধুমাত্রই ছুটির দিনে পিকনিক স্পট। সহস্রধারার মতো মানুষকে পুণ্যি দেবার রাইট তার নেই।

কেম্পটির ধারের রাস্তাও মেরামত হচ্ছে। প্রচুর পাথর ঢালছে। একটি পাথর-ভর্তি টেম্পো গাড়ি রাস্তা বন্ধ করে খাড়া।

"গাড়ি হাটাও !"

"কৌন হটায়গা ? ড্রাইবর নেই। খানা খানে গয়া।"

"বাঃ!" সুরথ সিং ভুরু কুঁচকে বসে রইল। তার ভাবনা হচ্ছে। সময় হিসেব করা দৌড় তো? এখানে অকারণে আটকে থাকলে সময়মতো আশ্রয়স্থলে পৌছোবো না। আজই আমাদের হনুমানচটিতে পৌছনোর কথা, যমুনোত্রীর পথে। সেখানে থাকার জায়গাও নাকি বেশি নেই। ট্যুরিস্ট বাসগুলো ভোর ছ'টায় ছেড়েছে হৃষীকেশ, তারা যায় অন্য একটা পথে, ওরা আগে পৌছোলে সব বাসস্থান ভরে যাবে। আমাদের এই শিক্ষাটা দিয়ে দিয়েছেন পি. আর ও. গুপ্তাজী। হাতে সরকারী বাসযাত্রীদের ইটিনেরারীর একটি সিডিউল গুঁজে দিয়েছেন, সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভ্রমণেরও একটি সূচী তৈরি করে টাইপ করে তার দুটি কপি দিয়েছেন। সেই হিসেব মাফিক পৌছুতে চেষ্টা করতে হবে তো!

এমনিতেই পথে ফল তুলে, পাতা তুলে, ঝর্নার জলে মুখ ধুয়ে থামতে থামতে চলেছি। তার ওপর টেম্পোওলার লাঞ্চ ওভার হওয়ার জন্যেও অপেক্ষা করতে হলে তো গেছি! সুরথ সিং স্বভাব-ভদ্র মানুষটি। একজন খেতে বসেছে, তা সে যতই তোমার অসুবিধে করুক আর যতই তোমার অচেনা হোক, তাকে তাড়া দেবার কথা ওর মাথায় আসবে না। কিন্তু আমার মাথায় আসবে। আমি স্বভাব-অসভ্য। আমি লাফিয়ে নেমে পড়ে দূরে দেখা-যাওয়া কুলিদের ঝুপড়ির দিকে রওনা হই। ধোঁয়া উঠছে। হয়তো রান্না হচ্ছে। কিন্তু এখনও তো লাঞ্চ টাইম হয়নি। এখনই ভাত খাবে কি? চা খাচ্ছে নিশ্চয়। ঝুপড়িতে গিয়ে চেঁচামেচি করতে একটি ছেলে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে এল এবং ধীরেসুস্থে টেম্পো সরাতে চলল। প্রথমে অবশ্য সে সমস্ত পাথর পথে ঢেলে গাড়ি খালি করে নিল। তার জন্য সময় লাগলো যৎসামান্য। এটা সে কেন যে আগেই করেনি! না করে হাই-ওয়েটা বন্ধ করে গাড়ি রেখে চা খেতে গিয়েছিল কেন, এর উত্তর মেলা শক্ত।

১৪
পানিচাক্কী

পথে খিদে-খিদে পাচ্ছে। সঙ্গে নাকি চীজ-স্যাণ্ডউইচ আছে, পুরী-আলু আছে। আলুর দমের সুগন্ধে প্রাণ পাগল। চীজ-স্যাণ্ডউইচ খাবার চেষ্টা আগেই করেছি। মাখনরুটি আছে, চীজটা ছিল না। পুরী-আলুটা খেতে হবে এবার। সুরথ সিং বললে, "আমি তো নৈনিবাগে ভাত খাব। আমি আবার দুপুরে ভাত না খেলে পারি না। রাত্রে বরং পুরী হবে।" ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি অনেক ওপরে উঠেছে। হঠাৎ দেখি বহু বহু নিচে ছবির মতো উপত্যকা। সেই উপত্যকায় সরু সুতোর মত নদী। নদীতে খেলনা-ব্রিজ। নিশ্চয় যমুনা! আমরা যমুনা ব্রিজের

দিকেই যাচ্ছি। সম্ভাব্যস্থল যমুনোত্রী। পথে যমুনা-উপত্যকা তো ধরতেই হবে। এই উঁচু পথই ঘুরে ঘুরে নেমে যাবে ঐ উপত্যকায় ঐ নদীর ধারে, ঐ ব্রিজের কাছে।

"ঐ ছাখ ঐ ছাখ, যমুনা!"

"কই? কই? কোথায়? কোথায়?"

হৈ হৈ করে যমুনা দেখছি। আমার মনে পড়ে গেল কামেং নদীর অবিকল চেহারা, কামেং উপত্যকার বুক—তাওয়াং যাবার সময় ঠিক এমনিই দেখিয়েছিল।

ঘুরতে ঘুরতে সত্যিই নদীর কাছে এসে পড়লুম। এক জায়গায় খুব তোড়ে দারুণ একটা ঝর্না ঝরছে পানিচাক্কী থেকে। পথের ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে তার জল। পাহাড়ী মানুষজন জল ভরছে, কেউ কেউ স্নান করছে। আমরা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ি। ঝর্নার ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে ভিজিয়ে নিই পিকোলোর জন্যে। ফ্লাস্কটা ভরবার চেষ্টা করতে রঞ্জনকে ডাকি। রঞ্জন এসেই আগেই মুণ্ডুটা বাড়িয়ে দিয়ে জামাকাপড় না ভিজিয়ে মাথা ধোবার আপ্রাণ কসরৎ করতে লাগলো। কিন্তু ঝর্নার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না। ইতিমধ্যে পিকোলো নেমে ঝর্নার অন্য একটি সরু ধারা থেকে দিব্যি ফ্লাস্কটা ভরে নিয়েছে—মুখে চোখে জল দিয়ে খানিকটা তাজা হয়েছে। আমি চটি খুলে ছপ্ ছপ্ করে পথে যে জলটা বয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে হেঁটে বেড়াই। পা ভেজাই। খানিক পাশেই নদী। চাঙ্গা হবার ফলে পিকোলোর ঝোঁক হল নদীতে নামবে। রঞ্জনের তাতে পুরো সায়, কিন্তু পাহাড়ের মায়াবী দূরত্বের কথা ওরা ভুলে গেছে। নদীকে মনে হচ্ছে বুঝি পাশেই। নামতে গেলেই টের পাবে বাছাধনেরা, ঢের ঢের দূরে। যাওয়া সহজ হলে পাহাড়ীরা ওখান থেকেই জল আনছে না কেন? ওখানেই চান করছে না কেন? অতিকষ্টে ঠেকানো গেল পিকোর নদী অভিযান। ফের যাত্রা। এবার থামলুম নৈনিবাগে। গরম গরম ভাত। চমৎকার ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ। জানলার পাশ ঘেঁষে আমরা যে টেবিলে বসলুম, তার নিচে সবেগে বয়ে যাচ্ছেন খরস্রোতা ঝর্নার মতো নীল যমুনা, ফেনায় ফেনায় দুধ-সাদা হয়ে। খাওয়াটা জমলো দারুণ। ধবধবে ভাত, ডালফ্রাই, দই, আমি একটি সব্জী, ওরা তিনজনে ওমলেট।

উত্তরাখণ্ড অঞ্চল এমনিতে নিরামিষ। হরিদ্বারের পর থেকেই মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এতকাল। চিরদিন শুনে এসেছি হৃষীকেশে মাছ মাংস ডিম ঢোকে না। কার্যত দেখলুম বাজারে না থাকলেও ডিম আছে প্রায় সব দোকানেই। এখানে গাড়োয়ালের নামহীন পাহাড়ী গ্রামে মাংসের চলটাও আছে। মাছ খায় না কেউ। (মাছখোর বাঙালী তো নয় এরা!) তবে ছোট ছোট খাবার দোকানে মাংস থাকে না। চমৎকার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে নতুনের মতো স্টীলের বাসনপত্তে

খবর দিল। কলকাতা কেন, পশ্চিমবঙ্গেই কোনো এরকম ছোট্ট দোকানে এ ধরনের পরিচ্ছন্নতা অকল্পনীয়। বড় দোকানেই যা দেখি।

১৫

পর্বতশৃঙ্গের আরোহিণী

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বুঝি। পিকো তো প্রথম থেকেই দুটি বালিশ নিয়ে জাঁকিয়ে তার মা'র কোলে শুয়ে আছে। আর রঞ্জন সুরথ সিংয়ের পাশে বসে মাঝে-মাঝেই ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ছে। আমিই যা চোখ কান খুলে বসে আছি সুরথ সিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বড্ড শুষ্ক, বর্ণহীন অঞ্চল। ঘুম-ঘুম ভাবটা কাটতে দেখি ঝাউবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, ঠাণ্ডা হিম-হিম হাওয়া দিচ্ছে। নিজে সোয়েটার পরলুম, মেয়েকে পরালুম, "রঞ্জন ওঠ্ ওঠ্, সোয়েটার পরে নে।" অসম্ভব গরম ছিল সারাটা পথ। লোকে বলে মুসৌরি-টুসৌরি ঠাণ্ডা জায়গা—কই ভাই? আমরা তো দেখলুম ফুটিফাটা গরম। অতো গরমেই পিকোর শরীর খারাপ করেছিল। আমি অবশ্য ওষুধও খাইয়ে দিয়েছি। ঠাণ্ডায় মন ভালো হল। রঞ্জন বলল নামবে। নেমে একটু হেঁটেই সে হঠাৎ বনের দিকে গিয়ে বমি করতে শুরু করলো। ঘুরনচাক্কী পথের শিকার নং ২। ইতিমধ্যে পিকোলো কই? কখন উঠে দরজা খুলে নেমে পড়েছে এবং পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। সুরথ সিং ভাগ্যিস দেখেছে ঐদিকে গেছে! ওর শরীর এখন নাকি "ফিট্"। রঞ্জন উঠে এসেছে গাড়িতে, পিকোলো এদিকে নামেই না। অগত্যা আমিই পাহাড়ে চড়তে থাকি আর হাঁক পাড়তে থাকি রাতের চৌকিদারের মতন—"পিকোলো-হো-ও-ও…।" হঠাৎ সামনে একটা ঝকঝকে ছোট্ট লাল-টুকটুকে মণির মতন দেখতে ফল। একটা লতানে টোমাটোর ধরনের গাছে ফলে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। স্ট্রবেরি যে!

হ্যালো, স্ট্রবেরি! এই জীবনে প্রথম বুনো স্ট্রবেরি দেখলুম। স্ট্রবেরি ক্ষেতে গিয়ে চাষের ফল তুলেছি ঢের যদিও, কিন্তু এটা দেখে প্রবল আহ্লাদ হলো।

"পিকোলো-হো-ও-ও!"

"যাই-ই-ই—" অনেক উঁচু থেকে সরু গলায় সাড়া এলো। দেখি বন-বাদাড়ের ভেতর দিয়ে প্রায় চোখ-বন্ধ-অবস্থায় পিকো নেমে আসছে। বেশ খাড়াই পথ। পথই নয়—ছাগল-টাগল হয়ত উঠতে পারে। আমি ভগবানের নাম করতে লাগলুম। পিকো কাছাকাছি এসে পড়াতেই খপ্ করে পাকড়াও করলুম।

—অত উপরে কী করতে উঠেছিলি? বনবাদাড় দরকার হলে তো এদিকেই ছিল?

—বনবাদাড় ? বনবাদাড় দিয়ে কী হবে ?

—তাহলে কোথায় যাচ্ছিলি ?

—পর্বত-শৃঙ্গে।

—প-র্-ব-ত-শৃঙ্গে ? মারব টেনে এক থাব্ড়া। ইয়ার্কির জায়গা পাওনি ? কাউকে কিছু না বলে তুমি তেনজিং নোরগে হচ্ছ ?

পিকোর ফ্যাল্‌ফেলে চোখ দেখে হঠাৎ বুঝতে পারি ও পুরো জাগ্রতই নয়। ঐ যে ওকে বমি-নিরোধক ভ্রমণ-বড়িটি খাইয়েছি, তাতেই ঘুমের নেশা হয়েছে। নেশার ঘোরে অর্ধজাগ্রত চেতনায় ও পাহাড়ে উঠছিল। যদি পড়ে যেত ? "পর্বত-শৃঙ্গে" ভাষাও তাই। ঘুমের মধ্যে থেকে উঠে আসা শব্দ। বাব্বাঃ ! ভগবানের দয়ায় পর্বতশৃঙ্গারোহিণীকে গাড়িতে পুরে বেঁধে নিয়ে চললুম সায়নচট্টি।

১৬

সায়নচট্টি, হনুমানচট্টি

এতক্ষণ আমরা সমানে যাচ্ছিলুম 'বরকোট'-এর পথ ধরে। পথে নওগাঁও পার হলুম। সেখানে এক পেয়ালা করে চা খাওয়া হলো। বরকোটে না ঢুকে আমরা সায়নচট্টির পথ ধরে ছুটি। এই প্রথম 'চটি'। ছেলেবেলা থেকে এই শব্দটি শুনে আসছি হিমালয়ের প্রসঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধ সান্যাল—প্রত্যেকেই এই 'চটি'র উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আমি হিমালয়-ভ্রমণ-সাহিত্য কিছুই পড়িনি। এমন কি উমাপ্রসাদও পড়া হয়নি। তাছাড়া ভক্তি বিশ্বাস, শঙ্কু মহারাজ, বৈতালিক, কতজনের তো কত বই আছে। এটা লিখতে-লিখতেই নারায়ণ সান্যালের "পথের মহাপ্রস্থান" বইটি উপহার পেলুম। আগে পড়ে গেলে উপকার হতো। "কে কী লিখেছেন জানা থাকলে সেগুলো না লিখে পারা যায়"—বললেন নারায়ণবাবু। "নইলে না জেনেই পুনরুচ্চারণের দোষ এসে যেতে পারে।"

আর পুনরুক্তি করলেই বা কী ? এই বহু পুরাতন হিমালয়ে, এই বহু পুরাতন পথে নতুন আর কী লিখব ? যাই লিখব তাই হবে পুরোনো কথা। সনাতন কাহিনী। 'সায়নচট্টি' নামটিও আমার খুব পছন্দ হল, মুনির নামে স্থান—আর "চট্টি" কেমন হয় দেখবার জন্যে চোখ আকুল হয়ে আছে। উন্মুক্ত উপত্যকাটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে খেলার মাঠ। ইস্কুলই বোধ হয়। নাকি মিলিটারী ব্যারাক ? জানি না। যাই হোক, জনমনিষ্যি নেই। মরুভূমির মতো জনহীন। একধারে চমৎকার ঝর্না, সেতু পেরিয়ে পথ গেছে হনুমানচটির দিকে। এক কাপ চা পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অথচ শুনেছি এখানে অনেক থাকার জায়গা। ট্যুরিস্ট-লজ

আছে, কালীকম্বলীওয়ালার ধরমশালা আছে। একবার ভাবলুম এখানেই থামি। আবার মনে হল, যতটা পারি এগিয়ে থাকি। যমুনোত্রীর যতটুকু কাছে সম্ভব। কাল ভোর ছ'টায় না বেরুলে সন্ধ্যের মধ্যে নিচে ফিরে আসা যাবে না। এতদূর থেকে গিয়ে ঘোড়া-টোড়ার ব্যবস্থা করে রওনা দিতে-দিতেই ঢের বেলা হয়ে যাবে। এক বৃদ্ধ এসে হাতে একটি কার্ড গুঁজে দিয়ে গেলেন। "আমার ছেলে হনুমান-চটিতে আছে—সে যমুনোত্রীর পাণ্ডা। পুজো দিতে হলে ওর সাহায্য নিও।" এখানকার পাণ্ডারা তো তাহলে বেশ অন্যরকম? পুরীর মতন নয়। কার্ডে লেখা—"রামেশ্বর। তদাত্মজ ভাগীরথপ্রসাদ . ঘনশ্যাম। জমুনোত্রীকে পাণ্ডা, জমুনোত্রী, উত্তরপ্রদেশ।"

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝর্না পেরিয়ে সুন্দর পথ দিয়ে যখন হনুমান-চটিতে পৌছোলুম পরম চা-তৃষ্ণা অবস্থায়, তখন সেখানে হাড়-কাঁপানো শীত। অজস্র বাস দাঁড়িয়ে আছে। এখানটি সায়নচটির বিপরীত। উন্মুক্ত নয়, ছোট্ট একটু-খানি ঠাঁই, বাসে বাসে ভরা। এবং গাড়িতে গাড়িতে। এবং খচ্চরে। প্রচুর সারিবন্দী খচ্চর এবং এলোমেলো মানুষের ভিড়। বৃষ্টি, কাদা, নোংরা। এখানে থাকব কোথায়? একদিকে উঁচু পথহীন পাহাড়। অন্যদিকে নৃত্যপরা যমুনার খাদ। মাঝখানে যে একটুখানি চাতাল আছে, তাতে এইসব রকেট-পুণ্যার্থী এবং পকেট-পুণ্যার্থীদের ভিড়ে পাদমেকং জায়গা নেই। একপাশে কতগুলো সেই আবোল-তাবোলের "বুড়ীর বাড়ি"র মতন দেখতে কাঠের নড়বড়ে ঘরবাড়ি, খুবই নোংরা দেখতে, একটির সামনে আবার লেখা "আনন্দভবন"। প্রত্যেকটির সামনে নিচের তলায় চায় জিলাইবী পুরী-পাকৌড়ে কে দুকান থেকে কাঠের ধোঁয়া উঠে বৃষ্টির মধ্যে মিশে যাচ্ছে। খচ্চরের মলমূত্র ও কাদার মিশ্রণে "পূতিগন্ধময়" শব্দটির অর্থ প্রাঞ্জল হচ্ছে। কে নামবে বাবা এর মধ্যে? আমার অত শখ নেই। থাকবোই বা কোথায় এখানে? হঠাৎ দেখি একটা উৎরাই পথ, খুব খাড়া নিচে নেমে যাচ্ছে, অল্প একটু গিয়েই আরেকটা চাতাল। সেখানে তিন-চারটে গাড়ি এবং একটি ঝকঝকে খেলাঘর প্যাটার্নের কংক্রিটের বাংলো। "সুরথ সিং, ঐখানে চলো ভাই।" পড়েছি এমনই ধনবান স্টাইলে বেরিয়ে, এখন অত কষ্ট করে থাকবার কথা মাথাতেই আসবে কেন!

যমুনোত্রী যাবার ঘোড়া-খচ্চর-ডাণ্ডী-কাণ্ডী সব এখানেই মিলবে। এই হল যাত্রারম্ভের স্টেশন। অথচ এত নোংরা? এত অযত্ন-লালিত? সরকারের দৃষ্টি কেন এখানে নেই?

১৭

গুরু মহারাজ

গাড়িসুদ্ধ নিচের চত্বরে নেমে সুরথ সিং জেনে এলো যে বাড়িটি একটি P. W. D. Inspection Engineer-এর কোয়ার্টার। ওটা বাংলো নয়। ভাড়া দেয় না। তখন মরীয়া হয়ে ভাবলুম, এন্‌জিনিয়ার বাবুকেই ধরব, একরাত্রি যদি দয়া করে ঠাঁই দেন! কোথায় তিনি? রঞ্জনকে পাঠালুম খবর নিতে। রঞ্জন এসে বলল, ব্যাপার কিঞ্চিৎ গোলমেলে। ভাড়াটাড়া ছ'টার আগে হবে না। ছ'টা অবধি অন্য লোক আছে। চাবি তাদের কাছে। ছ'টার পরে দিতেও পারে—না দিতেও পারে। ওটাকে "দিতেই হবে" করতে এবার পাঠানো হলো রঞ্জন আর পিকোলোকে। পিকো এসে বললো, "রঞ্জনমামা ঠিক শর্মাজীর মতন করে কথা বলতে লাগলো—আরে মহাপ্রভু, ঘর্ দে দো দোস্ত, তুম মেরে গুরু মহারাজ, নেহি দেগাতো মর জায়গা—চলো, চা খায়গা? চা খাও পুরুষোত্তম, আউর ঘর খোলো। এই করে সত্যি সত্যি চা খেতে খেতে ঘর যোগাড় করে ফেলেছে। চল্লিশ টাকা লাগবে। আর ঐ নোংরা-টোংরা বাড়িগুলোই হচ্ছে এখানকার হোটেল। এক-একটা ঘর চল্লিশ থেকে ষাট টাকা, ঘরে খাটও নেই। কাঠের দেয়াল, কাঠের মেঝে, মেঝেয় খড় পাতা, ইলেকট্রিক নেই, বাথরুম নেই—কিচ্ছু নেই মা, ঠিক আস্তাবলের মতন। তাতেই লোক থাকছে।" ওদিক থেকে সুরথ সিং এসে জানালো: "হোটেলে ঘর আছে। কিন্তু হোটেল আপনার যুগ্যি নয়। ঘরগুলো বেডরুম নয়, কিচেনের মতো। কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালা আছে, সেও মানুষ থাকার যোগ্য নয়। মাটির তৈরি ঘর, মাটির মেঝে; দরজা-জানলা নেই, একটা করে গর্ত—তা দিয়ে ঝড়জল বৃষ্টি-বাতাস সব ঢুকবে, খড় ভিজে যাবে। তাছাড়া খড়ের গাদায় শোবেনই বা কী করে? এবং বাথরুম কোথাওই নেই—হোটেলেও না, ধর্মশালাতেও না। তবে শেষেরটা ফ্রী। হোটেলে খুব খরচা।"

অতএব "হে মহাপ্রভু", "আও মোর গুরুজী", এসব আরো চালাতে হবে রঞ্জনকে যতক্ষণ না ঘর মিলছে। এ ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম আছে। ঘরে সতরঞ্চি পাতা এবং সোফা ও টেবিল আছে। অর্থাৎ এটি বসবার ঘর। শোবার ঘরটি খুলে দেবে না। সেখানে নাকি খাট পর্যন্ত বর্তমান। কিন্তু তার মালিকও বর্তমান—আপাতত যমুনোত্রীতে।

বৃষ্টি ধরার নাম নেই। ওরই মধ্যে চড়াই পথ ভেঙে নোংরা কাদার মধ্যে সারসের মতো ঠ্যাং ফেলে ফেলে কোনো রকমে সামনের "হোটেলে" উপস্থিত হলুম

চা খেতে। দোতলায় উঠে কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দায় ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে পড়লুম। একটি মাত্র চেয়ার। অন্যরা দণ্ডায়মান। দুটি ছেলে দেখি ভিতরের ঘরে বাংলা ভাষায় কথা বলছে। অমনি আমি চেপে ধরেছি।—"ও ভাই, কলকাতা থেকে নাকি?" "হ্যাঁ দিদি, বেলেঘাটা—আপনারা?" "গড়িয়াহাট।" ছেলে দুটি আজই এসেছে—গঙ্গোত্রী ঘুরে। খুবই ভালো লেগেছে, তবে একটু ডেনজারাস হয়ে গেছে গোমুখ-ট্রিপটা!

"আপনারা যেন গোমুখে যাবেন না—উপযুক্ত জুতোফুতো চাই, ঠাণ্ডাও আর্কটিকার মতন, মাথার ওপরে আজেবাজে অ্যাঙ্গেলে উটকো পাথর ঝুলে আছে, খসে-খসেও পড়ছে। পায়ের নিচের পাথরও পিছল, অনবরত হড়কে যাচ্ছে—ওরে বাবারে, বড্ড স্ট্রেন হয়েছে। আগে কেদারবদ্রী গেছি, লাস্ট ইয়ারে অমরনাথ ঘুরে এয়েছি, এত টেন্‌শনে ভুগিনি। এমনি গঙ্গোত্রী মোস্ট বিউটিফুল।"

"গোমুখ বিউটিফুল নয়?"

"হ্যাঁ, সে আরো বিউটিফুল হতে পারে, কিন্তু এনজয় করবার মতো শক্তি থাকে না। লালবাবার আশ্রমটি অবিশ্যি অসামান্য। ওফ্, এত যত্ন—এত যত্ন! গেলেই গরম চা হাতে ধরিয়ে দেবেন, রাত্রে হটওয়াটার ব্যাগ পর্যন্ত—কী যে আদর-আপ্যায়ন, তার তুলনা হয় না। শুধু ওটার জন্যেই যাওয়া যায়। গোমুখের উৎসটা ইন্টারেস্টিং নয়।"

"তবে?"

"জুতোফুতো নিয়ে আসবেন। মে মাসে আসবেন। এইরকম মিড-জুনে নয়। বৃষ্টি নামার আগেই যাবেন।"

গোমুখ আমরা এমনিতেই যাব না। কলকাতা ছাড়বার আগে মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন—গোমুখে যাবে না। যেখানে হেঁটে যেতে হয়, সব বারণ। অতএব গোবিন্দঘাট থেকে যে ভেবেছিলুম হিমকুণ্ডে যাব, শোণপ্রয়াগ থেকে যে ত্রিযুগী নারায়ণে যাব—সব নিষিদ্ধ। তবু কেন সেধে সেধে এত গোমুখের অসুবিধের তালিকা বর্ণনা শ্রবণ? রঞ্জনকে শোনানোর জন্যে। সে খেপেছে গোমুখ যাবে।

আমি যেতে দিতে রাজী নই, তাহলে তিনদিন গঙ্গোত্রীতে থাকতে হবে। তা ছাড়া রঞ্জনের শরীরও দুর্বল, ছেলেমানুষী ঝোঁকের পাল্লায় পড়ে অসুখ করলে এই যাত্রা পণ্ড। বৌদি-রিনিমার মতো শক্ত হয়েছি—"গোমুখ হবে না।" তখন ঘর-গুলি দেখলুম। সত্যি মিরাকল! ছ' বাই আট ঘরে ছ'জন-আটজন মানুষ। উঃ! এখানে থাকবার মতো অত পুণ্যের জোর আমার নেই।

১৮

খচ্চর-কাঁহাকা

গাড়িতে গিয়ে পুরী-আলুর দম সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে দেখি সারাদিনের গরমে আলুর দম পচে গেছে। পুরী শুকিয়ে নেড়ো বিস্কুট। আলু ফেলে দিয়ে ফ্লাস্ক দিয়ে রঞ্জনকে পাঠালুম চা আর কলা কিনে আনতে। তাই দিয়ে পুরী ঠেলতে হবে গলায়। খাবারের বাক্সে দেখি গেস্ট্-হাউস থেকে গুপ্তাজী তিন প্যাকেট ডালমুট, তিন প্যাকেট বিস্কুট, একটিন ল্যাক্টোজেন, কিছু মৌরি আর মিছরি, কিছু চিনি দিয়েছেন। ডালমুট ও বিস্কুট খাওয়া শুরু হয়ে গেল। পুরী পড়ে রইল।

ঘর ছ'টার সময় খালি হল। মালপত্র কিছু গাড়িতেই রইল। গাড়ি উঠোনেই পার্ক করা। সুরথ সিং গাড়িতেই ঘুমোবে। তার সঙ্গে আছে তার ঘরে-তৈরি নিজের পোষা ভেড়ার লোমের ধবধবে সাদা দুটি গাড়োয়ালী কম্বল। ঠাণ্ডা যতই পড়ুক ওই যথেষ্ট, দুটো হাত পুরো পুলোভারও আছে তার। সুরথ সিং চা খেতে গিয়ে রাত্রে খেয়ে এল। আমাদের খাওয়াটা ঠিক জমলো না। তবু কেউই যেতে চাইলুম না ঐ হোটেলে। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। রঞ্জন আর তার প্রভুজী চা খেতে গেছে। তিনজন বাঙালিনী মাঝবয়সী মহিলা এলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে আলাপ করি। প্রত্যেকের পরনে সুতী তাঁতের শাড়ি। একজনের রঙিন, দুজনের সাদা। এঁরা "রাখী ট্র্যাভেল্‌সে"র সঙ্গে এসেছেন—একজন কলকাতার, বাকি দুজন মফঃস্বলের মানুষ, প্রত্যেকেই যে যার পরিবার থেকে একাই বেরিয়েছেন। দুজন বিধবা না কুমারী বুঝতে পারিনি, কিন্তু একজন সধবা। এঁরা আগে অমরনাথে গেছেন, যমুনোত্রী যেতে ওঁদের ভয় নেই, চার-ধামেই যাবেন। খচ্চরে চড়ে উঠবেন যমুনোত্রী ও কেদার। বদ্রীনাথে পুরোটা গাড়ি যাবে। গঙ্গোত্রীতে তিন কিলোমিটার হাঁটতেই হবে। "খচ্চরে চড়ে গেলে কোনো কষ্টই নেই।"

একজন বললেন, "শুধু একটু গায়ে ব্যথা হতে পারে।" আরেকজন বললেন, "অনভ্যাসের দরুন।" "ও-ব্যথা চলে যায়।" তৃতীয়জন বললেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, "খচ্চর থেকে পড়েটড়ে যাবো না তো?"

"হ্যাঁ, তাও যেতে পারেন।" প্রথমজন উত্তর দেন। "আমার খচ্চরটাই তো পড়ে গিয়েছিল আমার ওপরে।"

"আপনার ওপরে? তার মানে?"

"মানে আমিও খচ্চর থেকে পড়ে গেলুম, খচ্চরটাও পা পিছলে পড়বি তো পড়

আমার বুকের ওপরে পড়ে স্রেফ্ অজ্ঞান হয়ে গেল। আর তোলা যায় না।"

"কে অজ্ঞান হয়ে গেল?"

"খচ্চর, খচ্চর। ব্যাটা পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে, নড়ছে না। হঠাৎ দেখি পিট পিট করে তাকাচ্ছে। তখন ওকে টেনে-হিঁচড়ে তোলা হলো।"

"আর আপনাকে? আপনার কিছু হোল না?"

"আমার খুব গায়ে ব্যথা হলো। সঙ্গে ডাক্তার ওষুধ সবই ছিল—তাই কিছু হয়নি।"

"উঠলেন অমরনাথে তারপরে? ঐ একই খচ্চরে চড়ে?"

"হ্যাঁ, ঐ খচ্চরেই উঠলুম অমরনাথে।"

"ভয় করল না?"

"ভয়ের কী আছে? খুব শিওরফুটেড অ্যানিম্যাল বলেই তো ওদের ব্যবহার করে।"

"আমরাও কত খচ্চর নেব ভাবছি।"

"খরচা কত জানেন?"

"শুনেছি ১১০/১২০ মতন। দর করতে হয়।" এমন সময়ে বাসে ভোঁ। ওঁরাও ছুটলেন।

"বাসে করে কোথায় যাচ্ছেন এখন?"

"বাসে নয়, হোটেলে যাব। সবাইকে ডাকছে আর কি জন্যে হতে।"

১৯

ঘরওয়ালা

রঞ্জনের প্রভুজী বড়ই সুন্দর দেখতে, বছর বাইশ-তেইশের একটি তরুণ। জানা গেল, ঐ হোটেলটি ওরই দাদার এবং ওদের অনেক খচ্চর আছে। ওরাই খচ্চর পাঠাবে সকালে ১১০ করে এক-একটা। রঞ্জন বলল, হেঁটে উঠবে। পিকো হেঁটে উঠতে পারবে না, তার কোমরে হাঁটুতে ব্যথা, ব্রুফেন খেতে খেতে চলেছে দিনে তিনবার করে।

আমরা শোবো কিসে? খাট-বিছানা কিছুই তো নেই। ধরো গুরুজীকে। গুরুজী বললেন, কুছ মুশকিল নহী, আ জায়েগা বিস্তারা। তিন রাজাই তিন গদ্দা। আমাদের সঙ্গে আছে গেস্ট-হাউসের তিন কম্বল তিন চাদর ও তিন তাকিয়া। আর ত্যাশ থিক্যা আনসি দুইডা কম্বল। এট্টা স্লিপিং ব্যাগ। এটা আমার জন্যই ধার করেছিলুম, আর কম্বল দুটো ওদের জন্য লাস্ট মোমেন্টে নিয়ে

এসেছি। গুরু মহারাজের ভৃত্য গিয়ে পরিষ্কার মার্কিনের ওয়াড় পরানো গদি লেপ এনে দিল, গদি ২, লেপ ১, হিসেবে এবং তিনটে মোটকা মোমবাতি কেনা হলো, সারারাত জেলে রাখা দরকার। এসব অঞ্চলে খুব পোকামাকড় আছে। ওডোমস আনা উচিত ছিল এবং পোকার স্প্রে-ও। আমাদের অবিশ্যি মশা বা পোকায় কামড়াচ্ছিল না, কামড়াচ্ছিল শীতে। দুপুরের গা-গুলোনো বমি-পাওয়া গরমটাকে দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাসে মর্মভেদী অবস্থা। যমুনা এখানে খর-স্রোতা ঝর্না, বেশ ঝকঝকে নির্মল; রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে যে একটু দেখবো, ঠাণ্ডার চোটে তারও উপায় নেই। ঘর থেকে বেরুনো যাচ্ছে না। জানলা একটি, তার একটা কাচ ভাঙা। সেখানে একটা ব্যাগ রেখে কিছুটা সামাল দেওয়া গেল। ঘরে ঐসব গদ্দা পেতে ফেলতেই ঘর ভর্তি হয়ে গেল। বালিশ, চাদর, লেপ, কম্বল দিয়ে চমৎকার লোভনীয় দুটি বিছানা করে ফেললুম। একটি চওড়া—তাতে মা ও মেয়ে। তাদের মাথার কাছে একটি সরু—তাতে মামাবাবু। ইংরিজি T অক্ষরের মতন। এভাবে ছাড়া অতটুকু ঘরে জায়গা নেই। সবে বিছানা করে শুয়েছি, হঠাৎ রঞ্জন বলল, দিদি, একটু আস্তে করে উঠে পড়ে ডানদিকে সরে এসো তো পিকোকে নিয়ে।

—কেন? এখন পারব না।

—এসো না! আস্তে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও যদি, সেটাই বেস্ট।

—কেন?

—প্লীজ, দেরি কোর না। একটা কিছু দেখেছি—বেরিয়ে পড়, বলছি। ওর গলায় কী ছিল, পিকো এবং আমি উঠে গায়ে সোয়েটার জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে পড়ি ছিটকিনি খুলে। রঞ্জন একপাটি জুতো হাতে করে ঢোকে। আমি ওর পিছু পিছু ঢুকেই "ঈ ঈ ঈ ঈ ক্ ক্ ক্" করে এক নারকীয় চিৎকার করে ঘর ছেড়ে পালাই পিকোকে টেনে নিয়ে। ঘরের দেওয়ালে মোমের আবছা ভুতুড়ে আলোয় একটা ইয়াব্ বড়া রোঁয়াওয়ালা কালো কুচকুচে মাকড়সা। এখনও সেই দৃশ্য মনে পড়লে হাত-পা এলিয়ে পড়তে চায়। পিকো সাহসী হবে বলে জুতোর পাটি হাতে চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালো, রঞ্জন সেই ছুটন্ত মাকড়সাকে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত মারলো। বাব্বাঃ, বাঁচলুম! রঞ্জন না দেখে মধ্যরাত্রে ওটিকে আমিই যদি দেখতুম বা উনিই যদি আমাদের দেখাশুনো করতে আসতেন, তবে কী হত ভাবা যায় না! আরশোলার চেয়েও মাকড়সা বেশি ভয় করে আমার এবং এটাকে ভয় না পাবে, এমন মানুষ কমই আছে। রঞ্জন মোমবাতি এবং টর্চ নিয়ে আঁতিপাঁতি করে ঘরের কোণা-ঘুপচি সব খুঁজলো—ওর মতোই আর কোনো বাসিন্দা আছে কিনা এ-ঘরে।

ন পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বড় মোমটি জেলে রেখে ফের লেপের তলায় ঢোকা এবং ঘুম

২০

নিশি-কুটুম্বিতা / রাতের অতিথি

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙলো। প্রচণ্ড হৈ-চৈ হচ্ছে বাইরে। এত কথাবার্তা চেঁচামেচি কর করছে? বকুনি দিতে হবে তো! একটু ছাখ তো রঞ্জন? রঞ্জন দোর খোলামাত্র একদমক ঠাণ্ডা বাতাস হাড়ে হাউ-ডু ইউ-ডু বলে গেল। এবং অল্প আলোয় দেখলাম বারান্দা-ভর্তি মানুষ। নারী শিশু বৃদ্ধ। কী ব্যাপার? বান ডেকেছে নাকি? না, এঁরা যমুনোত্রীর যাত্রী। নওগাঁও থেকে এসেছেন। থাকার জায়গা নেই, বৃষ্টি থেকে বাঁচতে বারান্দায়। রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "ওদের ভেতরে এসে বসতে বলি, দিদি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" প্রথমে অবিশ্বাসী, অবাক—তারপরে ধন্য হয়ে ঘরে ঢুকে এল ন'জন নারী, দু'জন পুরুষ। রঞ্জন টেনেহিঁচড়ে সোফাগুলো বারান্দায় বের করে দিল ফোমের কুশনসুদ্ধু, চৌকিদারকে ডেকে বলল কুশনগুলো তুলে রাখতে, সোফা বের করতে যে একফালি ঠাঁই হল, সেখানে ঝটপট ভোটকম্বল বিছিয়ে সারি-বন্দী উবু হয়ে বসে পড়ল মেয়েরা। তারপর শুরু হল তাদের গল্প। গল্পের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠলো একটিই শব্দ, "ভোগ লাগা"। আমাদের খাদ্যের বাক্স গাড়িতে কিন্তু ঠোঙাভর্তি পুরী আর কলা আছে। উঠে পুরীর ঠোঙাটি আর কলা এগিয়ে দিলুম, "ঝুটা নেহি, আপ লোগ লে সকতে হেঁ।" তারা প্রচণ্ড খুশি হয়েই "জয় চমনা মাঈকি" বলে গ্রহণ করলো এই সামান্য বস্তুটি। যা আমরা খাবার যোগ্য বলে মনে করিনি। আলুর দম অবিশ্যি দিতে পারলুম না, ওটা পচে গেছে। পুরীটা বড্ড শক্ত বানিয়েছে এবং তরকারী নেই বলে খেতে পারিনি। কিন্তু ওদের খেতে কষ্ট হলো না, "ভোখ্" এমনই বস্তু।

ছোট্ট ঘর। তিনজনের পক্ষেই ছোট—সেখানে যে এখন চোদ্দজন। যদি হও সুজন—! এতগুলি মানুষ নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে খুব কম জায়গায় কী করে যে বসে আছে আমার অবাক লাগছে।

অসভ্যের মতো আমরা শুয়ে আছি। "এই বিছানায় এসে শোও" বলবার মতো উদারতা আমার নেই। অনেকবার ভেবেও কিছুতেই বলতে পারলুম না। এজন্য খুব খারাপ লাগছিল নিজেকে। ওদের গায়ে অতি জীর্ণ, ছিন্নভিন্ন কাপড়চোপড় সবই সুতীর, জোড়াতালি দেওয়া, হতদরিদ্র গ্রাম্য চাষী পরিবার। একজন বৃদ্ধা

আছেন, তাঁর হ্যাঁপানির টান আমার চেয়ে বেশিই এই মুহূর্তে। একটি বউ আছে, বুকের মধ্যে কয়েক মাসের শিশু। পুরুষ দুজন—একজনের বয়স হয়েছে, আরেকজন যুবক। বাকীরা নানা বয়সী মেয়ে। এত অল্প জামাকাপড় নিয়ে (কোনো গরম জামা কি গরম চাদর কারুরই নেই) এরা কী করে অত ঠাণ্ডায় যাবে ?

"তোমরা কি প্রতি বছরই যাও ?"

বুড়ো বললে, আমি যাই। এরা সবাই আমার সঙ্গে যাচ্ছে। অনেকেই অবশ্য অনেকবার গেছে। সবাই নওগাঁও গ্রামের। একসময়ে কথাবার্তা ফুরুল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লুম। ভোর হবার আগেই আমাদের রাতের অতিথিরা যাবার জন্যে তৈরী। বুড়ী আমাকে ডেকে তুলে বললে, "তোমার অনেক দয়া। তুমি দোর খুলে না দিলে ঠাণ্ডায় জমে মরে যেতুম—রাতে খিদের সময় তুমি পুরী খেতে দিয়েছ, নিজের ঘরে শুতে দিয়েছ, তোমার তীর্থযাত্রা সার্থক হবেই। আজ হমলোক ইতনা বারিষমে তো জান্‌সে মর যাতা থা। বাচ্‌চা বুড্‌ঢা লে-কর মাথেপর ছজ্জা নাহি, গাওপর আচ্ছাদন নাহি—, তুম সবকুছ দিয়া। যম্‌নামাঈ তুমহারা ভালা করে।"

বিলিতি থ্যাংকিউকে হার মানিয়ে দেওয়া এই গ্রাম্য সৌজন্যে আমি লজ্জায় মরে যেতে থাকি। দুটো কম্বল একটা লেপেও হি হি করে কেঁপেছি। সারারাত সোয়েটার পরে মোজা পরে মাথায় মাফ্‌লার বেঁধে শুয়েছিলাম, তবুও। আর ওদের একটা কম্বলও অফার করিনি। যা খেতে পারিনি নিজেরা, তাই ওদের খেতে দিয়েছি 'উড়ো খৈ গোবিন্দায়' করে। ঘরটুকুতে বসতে দেওয়া ছাড়া কিছুই করিনি। দিতে পারতাম কম্বলের ভাগ। কিছুই দিইনি। তবুও এত প্রশংসাবাক্য শুনে কৃমিকীটের মতো লাগছে নিজেকে। ওরা এখন রওনা হলে বাঁচি। শীত এখনও যথেষ্ট। তবে বৃষ্টিটা ধরেছে।

২১

ভোরের অতিথি

যম্‌নামাঈ-এর জয়ধ্বনি দিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল। আমরাও উঠে পড়ি। কিন্তু বাথরুমটি ভেতর থেকে বন্ধ। এ কী করে হয় ? হয় হয়। গুরু মহারাজ এবং এ-বাড়ির চৌকিদার মহারাজের যুগ্ম মদতে হয়। ঐ হোটেলগুলোর তো বাথরুম নেই। মহিলাদের জন্য এটা খুলে দেওয়া হচ্ছে। ওপাশে একটা দরজা আছে না মেথর যাবার ? সেটার বাইরে তালা, ওদের হাতে চাবি। ওরা সেটা পয়সা নিয়ে ব্যবহার করতে দেয়। অগত্যা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদেরই অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমে ঢোকবার টার্ন নিতে হল। গুরুজীর স্লোগান :—"কুছ ফিকর্ মত করো

বিবিজী, সব ঠিক হো জায়েগা।" রঞ্জন চৌকিদারকে দিয়ে ফ্লাস্কে ভরে চা আনাল। বিস্কুট-চা খেয়ে বিছানাপত্র গাড়িতে তুলে রওনা দিতে গিয়ে খেয়াল হল সোফার ওপর আমার শালটা আর তোয়ালে ছিল—কোনোটাই নেই। সোফা তো রাত্রে বাইরে ছিল। কারা নিয়ে গেছে কে জানে? প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হল রঞ্জনের ওপর। ভালমানুষী করে সোফা বের করলি, শালটা তোয়ালেটা নামিয়ে রাখলি না! সঙ্গে আর মাত্র একটা তোয়ালে আছে, শাল নেই। যাত্রারম্ভেই অলুক্ষুণে কাণ্ড। রঞ্জনটার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

তারপর মনে হল, যদি ওই নওগাঁওয়ের অতিথিদের সঙ্গে ভুল করে চলে গিয়ে থাকে তাহলে অবিশ্যি খুবই ভাল হয়। কিন্তু তা কি আর হবে? নিয়েছে ঠিকই চৌকিদার, কুশনগুলো মুলতে এসে। যাকগে, সেও বেশ গরীব লোকই। কুলুর শাল। হিমাচলের জিনিস হিমাচলে থাকুক।

২২
জয় যমুনা মাঈকি

চা খেতে খেতে যমুনাকে গুড মর্নিং করতে গিয়ে আমরা অবাক। আরে কোথায় সেই স্বচ্ছসলিলা ঝর্না! এক রাত্রের বর্ষণেই তার রং গেরুয়া হয়ে গেছে। আশপাশ থেকেও আর দু'একটা সরু ঝর্না নামতে শুরু করেছে। আমাদের গুরু মহারাজ এসে গেছেন, সঙ্গে এক ঘোড়াওলা। তার নাম সুজন সিং। আমাদের এখন হেঁটে হেঁটে ঘোড়া পর্যন্ত যেতে হবে। সেই মল-কর্দমাক্ত পূতিগন্ধময় নরক পার হয়ে।

ছাত্রাবস্থার দুটো সোয়েটার, একটা ডাব্‌ল্ কোট, দু' জোড়া মোজা, টুমপীর পি. টি. শুজ এবং মাফলারে নিজেকে বেশ সুরক্ষিত মনে হচ্ছে। পকেটে চামড়ার দস্তানাও আছে। পেনটুলুন যদিও আছে সঙ্গে, ঘোড়সওয়ার হবার উদ্দেশ্যেই শিবু ভরে দিয়েছে বাক্সে। কিন্তু এখানে বড্ড বেমানান লাগবে মনে হল। রঞ্জন আর পিকোলো দুটি ভাইয়ের মতন সেজেগুজে রেডি শার্টপ্যাণ্ট, নতুন কেড্‌স্‌জুতো, সোয়েটার, মাফলারে কোটে—খুব স্মার্ট। পিকোর মাথায় আবার স্কার্ফ।

স্কার্ফ মানে ৫ মিটারের এক মিটার নীল সুতি ছিট্ হৃষীকেশ বাজার থেকে কিনে মাঝখানে লম্বালম্বি ছিঁড়ে আধখানা করে নিয়েছি: স্কার্ফ। মা-মেয়ের চুল বাঁধবার জন্যে। মাকে যাতে গাঁইয়া এবং মেয়েকে যাতে মেমসাহেব মনে হচ্ছে।

যমুনা আর হনুমান গঙ্গার মিলনক্ষেত্র এই হনুমান চটি। সেই সমঙ্গটা যে কী অপূর্ব! দুটি রাগী পার্বত্য ধারা ফুঁসতে ফুঁসতে এসে মিশছে—জলটা যেন ফুটছে—পাথরে, জলে, ফেনায় ছিটিয়ে আশ্চর্য এক চেহারা। আমি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে বললুম, "একটা ছবি তুলি।" রঞ্জন এবং পিকো বললে, "এখন থাক, পরে।" ফলে ছবি তোলা হয়নি। ফিরেছি বৃষ্টিতে, সন্ধ্যার ম্লান মন-খারাপের মধ্যে।

অস্বস্তিতে যমুনোত্রীর পথে রওনা হলুম। ব্রিজটি পার হয়েই দুটি খুদে খুদে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে দিলেন মহারাজ। সুজন সিং একটার সঙ্গে আর অন্যটার দড়ি ধরে আছে খুদে গুড়গুড়ে এক বালক। রবীন্দ্র সিং তার নাম। খচ্চরের পিঠে বসে মনে হল পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাবই, পড়ে যাওয়া থেকে নিস্তার নেই, মাধ্যাকর্ষণ যেন ডাকিনী মায়া হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। অথচ ঘোড়ায় বহু চড়েছি, কিন্তু খচ্চরে চড়িনি, এ খচ্চরের সাইজ আবার গাধার মতন। পিকোকে বেশ মানিয়ে গেল। যেন চিরকাল ও এভাবেই জীবনযাপন করেছে—যা দেবী সর্বভূতেষু খচ্চরপৃষ্ঠে আরোহিতা। রঞ্জন স্মার্টলি লাফিয়ে পাহাড়ের পথে চলল। এই ডানদিকে হনুমান গঙ্গার খাদ, বাঁদিকে পাহাড় কেটে রাস্তা। মাথার কাছে পাথরের চাঁইগুলো ঝুলে আছে। "শির্ বঁচাকে, শির্ বঁচাকে" বলে সতর্কবাণী হাঁকছে সব ঘোড়াওয়ালা। একটু পরে পথ বাঁক নিল। বাঁহাতে এল গভীর খাদের মধ্যে যমুনা আর ডানদিকে পাহাড়। পথ চওড়া খানিকটা, বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা। ফুলে ফুলে পথ ছেয়ে আছে। কী ফুল! কী ফুল! মন্দার। দেখতে ঠিক চেস্টনাট গাছের মতো। ফুলও। কী ফুল বললে? মন্দার। 'এই তবে মন্দার তরু?' দেশের মদারি গাছ, বিদেশের চেস্টনাট ট্রি আর এই মন্দার—এরা কি সব একই গাছ? কে বলে দেবে? মন্দার পুষ্প বড় সুশ্রী।

২৩

হেলে, ঝুঁকে

পথটি শুষ্ক শ্যামল, ঝোপঝাড় গাছপালা, ফুলে ফুলে ভর্তি। পিকো কেবলই হাত বাড়িয়ে ফুল তুলছে। আমি দুই হাতে খচ্চরের পিঠের আসনের একটা কোণা প্রাণপণে চেপে ধরে আছি, যাতে পড়ে না যাই। লাগাম-টাগাম, রাশ-টাশের বালাই নেই বলে ব্যালান্স রাখা খুব শক্ত। কুন্দন সিং যত বলে উৎরাই-য়ের সময়ে পেছনে হেলে থাকতে হবে, আর চড়াই ভেঙে ওঠার সময়ে ঝুঁকে থাকতে হয়—আমার কিছুতেই মনে থাকে না। কেবলই উল্টোপাল্টা হয়ে

যায়। প্রধান শত্রু পেছনেই আছে। কেবলই চেঁচায়—'এবার ঝুঁকে, এবার হেলে।' মাকে জ্ঞান দিতে পেরে তার স্বর্গীয় আহ্লাদের ফোটো খিচকর রাখা আছে।

খচ্চর আমার বুকের ওপর চার ঠ্যাং মেলে শুয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু আমার অবস্থা শ্রীরাধিকার মতো। প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ লাগি। এই শীতেও স্বেদ-কম্প সব কিছুই দেখা দিয়েছে এবং দুই পায়ের ডিমে ক্রমাগত সংপ্রেম রামচিমটি কাটছে খচ্চরের স্যাডালের বেল্ট। পা ঢোকাবো কোথায়? রেকাব নেই। যে নেয়ারের দড়িটি ঝুলছে, তার ফাঁসের মধ্যে পা গলাতে হবে। পা এদিকে ফিট্ করছে না। ফাঁসটা'স ঢের নিচে। পায়েরা আপনমনে ঝোঁঝুল্যমান, পায়ের নিচে "মাটি" তো নেই-ই, রেকাব দড়ি ফাঁস কিছুই নেই, বিশুদ্ধ পার্বত্য বায়ু খেলে যাচ্ছে। ফলে আমার আত্মবিশ্বাসের কিঞ্চিৎ অভাব দেখা দিয়েছে। পিকোর হাতেও সীট আঁকড়ানো, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঈশ্বরই একমাত্র সাপোর্ট, কেননা পা রেকাবে ভরা আছে, তবু রক্ষে। হাতেও সাপোর্ট নেই, পায়েও সাপোর্ট নেই। খচ্চরটি অবশ্য আমার চেয়ে ঢের বেশি ভদ্রমহিলা। তার নাম যমুনী। সে তার গতিপথ ভালরকম চেনে এবং মনিবের সব কথাই বশংবদ কুকুরের মতো ভক্তিভরে মানে। অত্যন্ত ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছি। বাঁদিকে যমুনার খাদ।

সুন্দর দৃশ্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু দেখবার সুযোগ নেই। ঝুঁকে এবং হেলে, হেলে এবং ঝুঁকে, স্যাডল আঁকড়ে এবং সামনে দেখে চক্ষু কর্ণ পেট পিঠ ঘাড় কাঁধ হাত পা প্রত্যেকটি অঙ্গের যথাযথ অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমশই উত্তরোত্তর নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছি। ব্যথায় ব্যথায়। সামনে হঠাৎ দেখলুম তিনটি গাছের মোট মোটা শেকড়। তার ওপর দুয়েকটা পাথর—পথ বলতে এই। তলা দিয়ে যমুনার লীলাচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, খচ্চরের পা তার ওপর পড়ছে দেখেই 'চক্ষু মুদিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম'। তারপর পেছন ফিরে দেখলুম মেয়ে আছে, না নেই! আছে। রঞ্জন হেঁটে আসতে আসতে অনেক পেছিয়ে পড়েছে।

প্রচুর জাঠ আর রাজস্থানী যাত্রী। কী বর্ণবৈচিত্র্য! গাঢ় হলুদ, গাঢ় লাল, ম্যাজেন্টা, ঘন নীল ঘাঘরার আর ওড়নার মধ্যে দেখছি এই রংগুলিরই প্রাধান্য। পায়ে কেডস অথবা নাগরা জুতো। কেউ কেউ কেডসের পেছনটা কেটে চটিজুতো বানিয়ে নিয়েছে। জুতোর ওপর মোটা মোটা রূপোর ঝমর ঝমর মল বাজছে। হাতে মোটা বালা, কঙ্কন, রঙিন গালার ওপর হীরের মতন কাচবসানো চুড়ি। কী সুন্দর সব অলঙ্কার! আভরণ সত্যিই যে মানুষকে কত সুন্দর করে তা আরেকবার নজরে পড়ল। বৃদ্ধাদেরই গায়ে বরং রূপোর ভার ঢের বেশি। অল্পবয়সীদের

মল চুড়ির মতো সরু হয়ে এসেছে। তাদের গলার হারও সরু। বৃদ্ধাদের গলায় মোটা মোটা হাঁসুলি, সীতাহারের মতো গয়না শার্টের বুকের ওপর লুটিয়ে আছে। ঘাঘরার সঙ্গে শার্ট পরাই এদের স্টাইল। আর কাঁচুলিও আছে। বুকের মধ্যে ওড়না গোঁজা। মাথায় তোলা। ভোটকম্বল কাঁধে। প্রত্যেকের হাতে লাঠি। রঞ্জন লাঠি নিতে ভুলে গেছে। অনেকক্ষণ ওকে দেখা যাচ্ছিল। একসময়ে হারিয়ে গেল।

২৪

এই জায়গাটার নাম কী গো ?

পথটা অসহ্য সুন্দর। অনেকক্ষণ বাদে একটা উপত্যকায় এলাম। গম হচ্ছে, যব হচ্ছে, ধানও হচ্ছে—ছোট্ট ছোট্ট বারান্দার মতো কোণাচকাটা প্লটে। রাস্তা চওড়া হল। এখানে দু'একটা ধর্মশালা আছে। কালীকম্বলীওয়ালার উঠোনে একটি কচি বউ কাপড় কাচতে কাচতে বলে উঠল, "এই জায়গাটার নাম কী গো ?" খালি গায়ে ধুতি পরা এক ভদ্রলোক গামছা শুকোতে দিতে দিতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "ফু-উ-উ-ল্ চো-ও ওট্টি"। বুকের পৈতেটা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ খাস বাংলা কথা শুনে প্রাণ জুড়োলো, মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেলুম খচ্চরে বসে আছি, চারিদিকের হিমালয় ঠিক কলকাতার মতো চিরচেনা বোধ হলো। তারপরেই দেখতে পেলুম সেই দাঁড়কাকটাকে এবং খেয়াল হলো, এতক্ষণ একটাও পাখি দেখিনি। এত গাছগাছালির ভেতর দিয়ে এলুম, একটা পাখির ডানার শব্দ একটা পাখির ডাক কানে যায়নি। আশ্চর্য তো ! আর দেখিনি বেড়াল। সেই জগৎসিংহের দৃষ্ট অলুক্ষণে বেড়ালের পরে দেরাদুন থেকে ফুলচটি অবধি একটাও বেড়াল দেখিনি, কেবল কুকুর আর কুকুর। ফুলচটির পর রাস্তা কিছুটা সহজ হল খানিকক্ষণ।

পাহাড়ের গায়ে সারাপথে নানান উপদেশ লেখন। বেশির ভাগই সরকারী উপদেশ—স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে, পি. ডব্লু. ডি. থেকে, গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম থেকে। তেড়ে যাত্রীদের জ্ঞান দিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট সাদা রং-করা ক্যানভাসের হাফঘর (চার ফুট বাই আড়াই ফুট হবে)—তার গায়ে বড় বড় (দুই বাই এক) হরফে লেখা শৌচাগার, মূত্রালয় ইত্যাদি। তার ওপরে মহিলা-পুরুষও চিহ্নিত আছে। এবং কাছ দিয়ে যাবার সময় নাকে কাপড় দিতে হয়। জলের কোনো বন্দোবস্ত দেখিনি। ঝাড়ু বালতি সমেত কোনো মূর্তিও চোখে পড়েনি। তবে পাহাড়ের গায়ে অনবরত লেখা আছে টিকে নেবার কথা, কলেরার

ইনজেকশন নেবার কথা। লেখা আছে 'লেবু খাও, রোগ থেকে বাঁচবে' বা 'চলতি পথে যাত্রীদের সাহায্য করুন' 'দাস্তবমির ওষুধ এক্ষুনি খাও, দেরি করো না।' ওষুধটা দেবে কে? পথে স্বাস্থ্যবিভাগের কোনোই আপিস চোখে পড়েনি। এমন কি কোনো ফার্স্ট এড আপিসও না। অথচ কী কঠিন পথ, কত যাত্রীই তো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন! প্রধানত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গ্রাম থেকে আসেন এখানে, স্বাস্থ্য-বিভাগের স্লোগান তাদের রক্ষাকর্ম কতটা করতে পারে কে জানে? এই জন্যই বোধ হয় স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে প্রায়ই লেখা হয়েছে—"ভগবান আপকো যাত্রা সফল করে।" (কেননা আমরা সাহায্য করতে পারছি না।)

জান্‌কীচটিতে ইস্কুল আছে, গ্রাম্য বালক-বালিকারা যায়। সুরথ সিং গাড়ির পথে আসতে আসতে বলেছিল বটে। বহুগুণাজী হিমাচল প্রদেশের বহু উপকার করেছেন। এইসব ভালো মোটর রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন, গ্রামে গ্রামে বিজলী বাতি এনেছেন, প্রতি পাঁচ কিলোমিটারে ফ্রী ইস্কুল হয়েছে, হাসপাতালের মতো ছোটখাটো স্বাস্থ্য-অফিস বানিয়েছেন (সারাপথ লাল ত্রিকোণ, দো ইয়া তিন ইত্যাদি দৃশ্যমান) এবং পোস্ট অফিসও এনেছেন। সবচেয়ে ভাল কাজ করেছেন—গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক বসিয়েছেন। এই ব্যাঙ্কগুলো পাহাড়ীদের ঋণ দেয়। তাইতে কেউবা ছাগল ভেড়া কেনে, কেউ চাষের যন্ত্রপাতি কেনে, কেউ দোকান খোলে। মোট কথা হিমাচলের গ্রামে কেউ আর কাজের অভাবে বসে থাকে না। সব বাচ্চারাই ইস্কুলে যায়। একা নাকি বহুগুণার গুণেই।

২৫

জান্‌কীচট্টি আ গয়া

জান্‌কীচটিতে প্রচুর দোকানপাট, সবাই চা-জিলিপি আর গরম গরম পকৌড়া বিক্রি করছে। আমরা পথে যেতে যেতে দেখলাম দুটি ছিপছিপে বাঙালী মহিলা, ছাপা লালপাড় সুতী শাড়ি আর সাদা ব্লাউস পরনে, কোমরে সোয়েটার বেঁধে কেড্‌স পায়ে দৌড়চ্ছেন। লাঠি হাতে প্রায় দৌড়েই জান্‌কীচটি পৌঁছে যাচ্ছেন। পথে আরেক জায়গায় একজন টাকমাথা তরুণকেও দেখেছি ট্রেকিং স্যুট পরে লাঠি হাতে ছুটতে। একটু পরে তাঁকে দেখি বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। পিঠে হ্যাভারস্যাক, হাতে লাঠি, কাঁধে ফ্লাস্ক। কম্বল কাঁধে পুঁটলি মাথায় নাগরা পায়ে চাদর গায়ে দলে দলে মানুষগুলির মধ্যে রীতিমতো বেমানান একক। যেন শোভাযাত্রা করে চলেছে এই রঙবেরঙের মেয়েপুরুষের গ্রাম্য জনতা। এই আদিম পাহাড়, আকাঁড়া বন, এই উদ্দাম ঝর্না, এই অযত্নে গড়া পথ—এর মধ্যে

এরাই ঠিক মানিয়ে যাচ্ছে। পথের বাঁকে-বাঁকেই বিশ্রাম করছে পুঁটলি নামিয়ে। দেখা হলেই জয়ধ্বনি—জয় জম্‌নাজী কী, জয় জম্‌নামাঈকী। ঘোড়ায় (খচ্চরে) চড়া মানুষগুলি উত্তরে প্রথম প্রথম কিছুই বলে না। কিন্তু জান্‌কীচটিতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তাদের কনডিশানিং হয়ে যায়। তখন শুনি ঘোড়সওয়ার সাহেব মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বলছেন—"জয় হো জম্‌নাজীকী"—পুঁটলি মাথায় পদযাত্রী বুড়ির দিকে চেয়ে। বুড়ি হেসে বলে, জয় জম্‌নাজীকী—আব তো আধা রাস্তা আ গয়ে হো—জানকীচট্টি তো ইধরই হ্যায়।" পরস্পরকে মনোবল দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছে অসংলগ্ন অথচ পরস্পর অন্তর্লগ্ন এক আশ্চর্য জনতা। যাঁরা নেমে আসছেন তাঁরাও আমাদের আত্মীয়। যাঁরা উঠছি তাঁরা তো বটেই।

জান্‌কীচটিতে নেমেই পিকো ব্যথার ওষুধ, আমি শ্বাসকষ্টের ওষুধ চা দিয়ে খেয়ে ফেললুম। ঘোড়াওয়ালারাও চা খাচ্ছে। পুরো রাস্তা সুজন সিং অন্য সমস্ত পদযাত্রী ও অশ্বতরারোহীদের যাত্রার নিয়মকানুন শেখাতে শেখাতে এসেছে। মোড়ে বাঁক নেবার সময়ে পদযাত্রীরা কদাচ যেন খাদের দিকে যাবেন না। খচ্চররা বাইরের দিক বাঁক নেয়, তারা ঠেলে দিতে পারে। "ভাইসাব, জানবর কো বিশোয়াস নাহি—পাহাড়কা সাইড্‌সে চল্‌না"—চোখে দেখলুমও খচ্চর কী ভাবে ঠেলা মারে। একেবারে জান্তব। কুন্দন সিং খুব লোক ভালো এবং প্রথম শ্রেণীর ট্রেনার। খুদে রবীন্দ্র সিংকে সে যত্নে শিক্ষা দিতে দিতে আসছে। পিকোর ঘোড়াটি বয়সে ছোট, তার ট্রেনিং কম, আমার যমনী পাকাপোক্ত। যমনী যা করে, মোহন দেখাদেখি তাই করে। যমনী যেই পাহাড়ী ঘাস ফুল খেতে পাথরে চড়তে চেষ্টা করে, মোহনও তাই করে। যম্‌নী যেই ঝর্নায় জল খেতে মুখ নামায়, মোহনও জল খায়। আর যম্‌নী যদি সেই মন্দ কর্মটি করে পথ নোংরা করে, মোহনও সেটি করবেই। দুর্গা-অপুর মতো আর কি। রবীন্দ্রকে প্রায়ই কুন্দন সিং বলছে, "থক্‌ তো নাহি গয়ে হো? জরা রেস্ট লোগে?" রবীন্দ্র বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ছে। সে বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করে না, খচ্চরদের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে পাথরে পাথরে পা ফেলে পথ চলছে। খচ্চররা যা বুঝলুম, মাটি কাদা দিয়ে চলা পছন্দ করে—তা যদি সেই রাস্তা ছ' ইঞ্চিও চওড়া হয়, চার ফুট চওড়া ভুঁড়ি নিয়েও সেই ছ' ইঞ্চি দিয়েই চমৎকার হেঁটে যাবে তারা। নুড়ি পাথরে বা সিঁড়িভাঙা পথে উঠতে তাদের কষ্ট হয়। দেখতে দেখতে জান্‌কীচটিতে রঞ্জন এসে পড়ল।

২৬

ডাণ্ডী, কাণ্ডী কাণ্ডজ্ঞান

চা খেয়ে ফের রওনা হবো, দেখি এক থুরথুরে বুড়ী পাঞ্জাবী মহিলা কাঁদো কাঁদো মুখে কোনরকমে হুমড়ি খেয়ে ঘোড়ায় বসে আছেন, তাঁকে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে। অন্য ঘোড়াবরদাররা তাঁর সহিসকে বকুনি দিচ্ছে, "এরকম সওয়ারী কেন নিয়েছ? পড়ে গেলে কে দায়ী হবে? বড্ড তোমার লোভ!" সহিসও চুপ করে নেই। বলছে, "কী করব? অনেক করে বলল, ধরল তাই।" মহিলার ডাণ্ডী বা কাণ্ডী নেওয়া উচিত ছিল। এ বয়সে শরীরের এ অবস্থায় কেউ ঘোড়ায় চড়ে না। ডাণ্ডী অবশ্য বড্ড খরচ। আর কাণ্ডীতে খুব ভয় করে।

একটা মোড়ে দেখছিলুম প্রচণ্ড পেণ্ট করা, মুখময় রং মাখা এক ফ্যাশানেবল মোটা যুবতী, প্রচুর গরম পোশাকের মধ্যে টবের গোলাপ ফুলটির মতো কাণ্ডী থেকে মুখ বের করে বসে আছেন। মোটা শরীরে কষ্টের চিহ্ন নেই। কাণ্ডী-ওলাটি তরুণ। সে কাণ্ডীটি একটা পাথরে ঠেস দিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। প্রায় জিব বেরিয়ে পড়েছে তার। দেখে বড্ড মায়া হল। আর লজ্জাও। অমনি শুনলুম মেমসাব বলছেন, "চলো চলো, দের্ কিউ কর্‌তা? ফির ঘুমকে তো আনা হ্যায়!" কাণ্ডীওলার কপাল থেকে এই শীতেও সহস্রধারায় ঝর্না ঝরছে।

কাণ্ডী হচ্ছে একরকম কুলোর মতো গড়নের চ্যাপ্টা ঝুড়ি, কুলিরা ভালো করে পিঠে বেঁধে নেয়। ঝুড়ির মধ্যে উবু হয়ে বসে থাকে যাত্রী। বসার এই ভঙ্গিটা ভালমতোই প্র্যাকটিস করা থাকে—ভ্রূণাবস্থায়। মাতৃজঠরে আমরা এই ভঙ্গিতেই থাকি, হাঁটু দুটি চিবুকের কাছে গুটিয়ে। আর একবার একজন কাণ্ডীওলার পিঠে একটি দেহ দেখলুম। দেহে প্রাণ আছে কি নেই বুঝিনি। মুখ হাঁ, চোখ উল্টোনো, ঘাড় কাত। দেহাতী বৃদ্ধা। মুখ-চোখে মাছি বসছিল না। হয়ত জীবিতই ছিলেন, অচৈতন্য। পিঠে পিঠ দিয়ে ঝুলে থাকা নিশ্চয় আরামপ্রদ নয়। গ্রীসে এককালে বড় বড় জালার মধ্যে মৃত মানুষকে এই ভঙ্গিতে পুরে গোর দেওয়া হত, অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আথেন্সের জাদুঘরে দেখেছিলুম।

মাঝে মাঝে হুম্-হাম্ করে সদর্পে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ডাণ্ডী। শেঠজী আর তাঁদের বিবিজীরা আরামকেদারায় কাত হয়ে আছেন। কাণ্ডী শিশু ও বৃদ্ধদের জন্যে। কাণ্ডীর আর খচ্চরের একই খরচ পড়ে। তবে ভারবাহী

মানুষটির চেয়ে পার্বত্য পশুটি বেশি ভারসই এবং নিরাপদ এবং মূল্যবান প্রাণীও বটে। কিনতে গেলে তো মূলধন চাই।

এবারে হেঁটে রওনা দিল পিকো। খচ্চরে চড়ল রঞ্জন। পথটা ভারি সুন্দর এখন। চওড়া সবুজ শস্যভরা উপত্যকা। চারিদিকে পাহাড়। ডান পাশে যমুনার নৃত্যলীলা পথটা একটুক্ষণ কিছু পাহাড়ী গাছের নিচে দিয়ে যায়। কী গাছ জানি না—চেনা ঝাউ, পাইন নয়। ঝিরঝিরে, বেঁটে, ছড়ানো ছাতার মতো নাম না-জানা গাছ। এখানেই কেবল দেখা গেল গোটা পঁচিশ-তিরিশ গাছ। যেন উপবন। তারপর শুরু হল খাড়া চড়াই। রাস্তা এবার জ্যামিতিক ধাঁচে ডাইনে বাঁয়ে কোনাকুনি বাঁক নিতে আর চওড়াতে কমতে শুরু করল। পিকোকে সুজন সিং ঘোড়ায় তুললো আর রঞ্জন চলল পাকদণ্ডী বেয়ে। পাহাড়ী মানুষজনদের দেখাদেখি।

পথটা সত্যি আশ্চর্য সুন্দর। চারিদিকে ঘিরেছে উদ্ধত সবুজ পাহাড়, একদিকে খুব নিচে—অনেক নিচে যমুনার খাদ। প্রপাত গর্জন পর্যন্ত মৃদু হয়ে যায়। তাকাতে ভয় করে। পথ ক্রমশ সরু হচ্ছে আর এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে হচ্ছে। ঘোড়া গেলে মানুষ যেতে পারে না। মানুষকেই দেয়ালে পিঠ সেঁটে দাঁড়িয়ে খচ্চরকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতে হয়। মাঝে মাঝে দেয়ালে একটু গুহামতো আছে। তাতে মাঝে মাঝে একটি তরুণ সাধুকে দেখছি, বসে গাঁজা খাচ্ছেন। অনেকবারই ওর সঙ্গে দেখা হল। পথে কখন যে আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন টের পাচ্ছি না। যখন বসে গাঁজা খাচ্ছেন তখন দেখতে পাচ্ছি। কুন্দন সিং বলল, "মরেগা শালা সাধো। গাঞ্জা খাকর চল রহা। বহুৎ খতরনাক রাস্তা।"

২৭
জানবরকো বিশোয়াস নহী

ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পথের অবস্থা, পাহাড়ের মধ্যে গর্ত খোদাই করে রাস্তা কোঁদা, ঢাকা বারান্দার মতন মাথার ওপর ঝুঁকে আছে পাথরের এবড়ো-খেবড়ো ছাদ। খচ্চরারোহীদের মাথায় যখন-তখন "অতিবাড় বেড়ো নাকো" বলে গোঁত্তা মারতে পারে। কুন্দন সিং চেঁচাচ্ছে, "শির বাঁচাকে, শির বাঁচাকে।" রেলিং দেওয়া আছে খানিকটা রাস্তা। এক জায়গায় দেখি রেলিং ভাঙা। কুন্দন সিং বলল, "কাল এক লড়্কী গির গয়ী।" সে কি? পনেরো-ষোলো বছরের উত্তরপ্রদেশী মেয়ে, নাচতে নাচতে আসছিল আগে আগে, বাবা মা দাদা পিছনেই ছিল, খচ্চরের হঠাৎ ধাক্কা সামলাতে না পেরে আট হাজার ফিট্ নিচের খাদে

যমুনার স্রোতে—"শালে জানবর্ কো বিশোয়াস নহী—আগে বাঢ় যম্নী ঈ ঈ ঈঃ লীঃ লীঃ—"

রেলিং পার হবার পরে হঠাৎ একটা জায়গায় যম্নীকে দাঁড় করালো কুন্দন সিং।—"উতার যাইয়ে। আব্ পায়দল এক-দো কিলোমিটার। খচ্চর নাহি যায়েগা। ডাণ্ডী, কাণ্ডী, কুচ্ বি নাহি যায়েগা।" সত্যি সত্যি এইখানে সব ডাণ্ডী-কাণ্ডীর চড়ন্দারদের একেবারে পথে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাঁটো। সরকারের বারণ আছে। এ পথে অন্যের ওপরে নির্ভর করে ওঠা যাবে না হতে পারে, হামা টেনেও উঠতে হতে পারে। এটা যার যার নিজের ব্যাপার। কিন্তু আগে কেন বলেনি? হয়তো বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেকেই তাহলে আসতেন না। সারাপথ ডাণ্ডীতে বা কাণ্ডীতে যাবেন বলে রওনা হয়ে, তারপর পথ চলতে বাধ্য হওয়া এবং সবচেয়ে কঠোর সবচেয়ে কঠিন চড়াই অংশেই—এটা ব্রীচ অব কনট্র্যাক্ট। বুড়ো মানুষদের মুখের সেই অসহায় চেহারা ভোলবার নয়। এমন তো কথা ছিল না! এটা কী হলো? পারবো তো? জয় যমুনামাঈ, বাঁচিয়ে দিও মা।

কিন্তু মা বাঁচিয়ে আর দেয় কই! আমার নিজের ঘরে একটা অবাধ্য ছটফটে পঞ্চদশী আছে। আমি কুন্দন সিংয়ের ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট স্বরে বলা পনেরো বছরের মেয়ের খাদে পড়ে যাওয়ার সংবাদে প্রস্তরীভূত হয়ে গেছি। ভুলতে পারছি না, এ দুর্ঘটনা মা-বাবার চোখের সামনেই ঘটেছে। অথচ আটকাতে পারেননি। তাঁরা অন্য বাঁকে তখন। পুণ্যার্জন করে ঘরে ফিরবেন কোলের সন্তানকে যমুনায় বিসর্জন দিয়ে। যমুনোত্রীর পথশোভা একেবারে বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল। কেবলই পিকোকে সামলাচ্ছি। সেও বড্ড স্বেচ্ছাপ্রবণ মেয়ে, বড়ই চঞ্চল। যমুনোত্রীকে মেয়ে উপহার দিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই আমার।—"পিকো, খুব সাবধান। ঝুঁকে ফুল তুলবি না। আমার সামনে সামনে চলবি।"

কিন্তু এখন তো হন্টন! হাঁটব কি? পথ জুড়ে শুয়ে পড়েছেন প্রায় এক বিশাল পাঞ্জাবী বৃদ্ধা। তাঁকে ধরাধরি করে তিন-চারজন ঘোড়াওয়ালা মিলে ঘোড়া থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দিয়েছে এই পিছল পাথুরে চড়াই পথে। তিনি কেঁদে ফেলেছেন আর কেবলই বলছেন, "আমার ছেলে কই? আমার থলি কই?"—"মেরে বেটা, মেরা থৈলিয়া?" এঁকেই জানকীচটিতে দেখেছিলুম। ভারী শরীর, প্রায় আশি বছর বয়েস। হিসি করে ফেলেছেন দৈহিক স্ট্রেনে এবং প্রাণভয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে কোনো আত্মীয়-বন্ধু নেই। সহিসটি খুবই দুষ্টু। খুব ধমকাচ্ছে এবং রুক্ষ ব্যবহার করছে। যেহেতু একেই গ্রাম্য, তায় জরাবিধ্বস্ত এবং অবস্থাপন্ন নিশ্চয়ই নন—তা হলে ডাণ্ডী নিতেন। এই বয়েসে কেউ (এই

রকম রাস্তায়) খচ্চরে ওঠে ? পিকোলো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। আমরা তাঁকে হাত ধরে পথ থেকে তুললুম।—"চলুন মাঈ, আমাদের ধরে ধরে চলুন—কোনো ভয় নেই।" দুই হাতে পিকো তাঁকে জড়িয়ে ধরল (নিজেই পায়ের টাটানি ব্যথায় ভাল করে পা-টাও ফেলতে পারছে না) আর আমি তাঁর ডান হাতটা শক্ত করে ধরলুম। হাঁফে, ভদ্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতেও জানি না, তারপর তিন রুগীর অপূর্ব প্রসেশান যেমন-তেমন করে এগিয়ে চলল ট্যারা-বাঁকা হয়ে যমুনোত্রী অভিমুখে। প্রথমটা উনি খুনখুন করে কাঁদছিলেন। ক্রমশ থামলেন, অল্প অল্প কথাও বললেন। ছেলে নিচে। হেঁটে উঠেছে দুটি নাতিও। থলিটি খচ্চরের গলায় বাঁধা। সে ব্যাটা আগে চলে গেছে। তাতেই সর্বস্ব। এখন উঠতে হাঁটতে পেরে ওঁর সেই যথাসর্বস্ব বিষয়ে উদ্বেগ হচ্ছে।—"ভাববেন না মাঈ, এরা চোর নয়, থলি ঠিকই থাকবে।" আশ্বস্ত হয়ে উনি পা ঠিকমতন ফেলবার চেষ্টা করতে থাকেন। জলন্ধরের এক গ্রামে ওঁদের বাড়ি। ছেলের সঙ্গে চারধাম করতে বেরিয়েছেন। যমুনোত্রী প্রথম ধাম।—"এমন জানলে আসতাম না। মরে যাবো আমি ঠিকই, নিশ্চয়ই মরে যাবো। কেউ বলেনি এত হাঁটতে হবে, কেউ বলেনি ঘোড়া এত ভয়ংকর—" বলতে বলতে প্রায় কেঁদেই ফেলছেন। অনেক কষ্টে শিশুর মতো ওঁকে ভুলিয়েভালিয়ে হাঁটি। পথশ্রমে বাক্যালাপ আপনি বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের ঘোড়াওলারা যে যার ঘোড়া নিয়ে সবাই অনেক এগিয়ে গেছে, কারুর টিকি দেখা যাচ্ছে না। কেবল ওঁর ঘোড়াওয়ালা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। স্বেচ্ছায় নয়, অন্যান্য ঘোড়াওলাদের চাপে। এক এক সময় পথ খুবই খারাপ যেখানে, তখন এসে সাহায্য করছে ওঁকে। পথটাও যেন ফুরোতে চায় না। যদিও আমার এটাই ভাল লাগছে। গাছপালা পথ পাথর ঝর্না আর ওদিকে পাহাড়ের গায়ে চার-চারটে ধবধবে গ্লেসিয়ার—চোখ মেলে তবু দেখতে পাচ্ছি। খচ্চরে চড়লে মন এতই একাগ্র, কেবল মাথার ওপরের পাথর সামনের মানুষ আর নিচের রাস্তাটি ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অথচ টের পাচ্ছি—যেতেছে বহিয়া সুসময়।

একসময় হামাগুড়ি সত্যিই প্রায় দিতে হল, বৃষ্টি-পিছল পথ, সিঁড়ির মতো বড় বড় পাথর সাজানো, কখনো বা ঝর্নার ভিতর দিয়ে যাওয়া, আমার মাথায় ডাফ্‌ল-কোটে হুড, পিকোর রেনকোটের ঘোমটা, ছাতা রঞ্জনের কাছে। রঞ্জনকে আর দেখিনি। ব্র্যাণ্ডি, গ্লুকোজও রঞ্জনের কাছে। অতএব বৃদ্ধাকে সাহায্য করার উপায় নেই। আবার ঠেলেঠুলে অতি কষ্টে দুর্গাশ্রীহরি সংকটনাশিনি বলে তো মাঈকে তাঁর খচ্চরে তুলে দেওয়া হলো। খচ্চর বিনীতভাবে গলায় তাঁর থলি

ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। থলি দেখেই অনেকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন মহিলা। ওঁকে রওনা করে আমরাও উঠে পড়ি। "উঠে পড়া" অত সোজা নয়। আমার প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে—এই শেষ, আর নয়। দুই পায়ের ডিমে বিশ্রী কাল-সিটে পড়েছে, জানি না কিসের ফাঁদ। সমানে চিম্‌টি কেটে যাচ্ছে ঐ একটা স্পটে। আর ঘণ্টাখানেক। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে। নামছেন এমন হলুদ পাগড়ী বাঁধা একটি দেহাতী বৃদ্ধকে যেই বলেছি "যমুনোত্রী মাঈকী জয়" (ঠিক কলকাতার বিসর্জন-পার্টির সুরে), উনি ফোকলা হেসে বললেন, "বাস্ আব্ তো জ্যায়দা তকলিফ নেহি হোগা—আ গয়ে হেঁ আপ।" আমার গলার স্বরে নিশ্চয় ক্লান্তি ছিল। জয়-ধ্বনিতেই লুকিয়ে ছিল প্রশ্ন।—"আরো কতো দূর?"

২৮

এক লড়্‌কি মিলে গা?

কি যে আরাম পেলুম ওই আশ্বাসে! চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছেছি তাহলে! হঠাৎ দেখি সুরথ সিং—সুরথ সিংই তো? আমাদের গাড়ির ড্রাইভার—নেমে আসছে।

"সুরথ সিং?" আমি চেঁচাই।

"হা বিবিজী। হো গয়া আস্মান হামারা।"

"ইতনা জলদি পহুঁচ গয়া?"

"মায় তো পাহাড়ী হুঁ? পাকদণ্ডীসে চলা আয়া। দেড়ঘণ্টে মে পৌঁছা। গাড়িকো দেখনেবালা রাখকেই আয়া হাম। বারিষ আ গয়া, আপ জল্‌দি যাইয়ে! যমুনা মুশকিল হোগা।" কেননা বৃষ্টি হচ্ছে। পথ পিছল হচ্ছে। ফেরার পথ আরো পিছল হবে। যেন অন্ধকারের আগে নিশ্চয় ফিরি। সুরথ সিংয়ের হাতে লাঠি নেই, তবু কত স্বচ্ছন্দ! রঞ্জনেরও হাতে লাঠি নেই—ওর খুবই উঠতে অসুবিধা হচ্ছে এজন্যে। লাঠিটা মস্ত ভরসা। অনেকখানি সাহায্য করে। জান্‌কীচটিতে ওর জন্যে একটা লাঠি চাইতে গিয়ে কী হেনস্থা! যেই বলেছি "মেরা ভাইকে লিয়ে এক লাকড়ি মিলেগা ভাই?" দোকানদারের চক্ষুস্থির। পিকো হেসেই গড়াগড়ি। ব্যাপার কি? আবার বলি।—"এক লড়কি!" এবার রঞ্জন তাড়াতাড়ি শুধরে দেয়, "লড়কি নেহি,—লাকড়ি, লাকড়ি! লড়কি নেই চাইয়ে—লাকড়ি চাই, লাকড়ি! স্টিক! লাঠি!"

"ওঃ লাকড়ি? কুছ পেড়সে তোড় লো না আপ? লাকড়ি নিচেসে লানা থা। ইধর নাহি মিলতা।"

হাঁটবার সময়ে টের পাচ্ছিলুম, লাঠি থাকলে কী কাজই দিত। গঙ্গোত্রীতে লাঠি নিয়ে নেব। তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে—যদি শেষতক্ যাই। যমুনোত্রী যেতে গায়ে হাতে পায়ে যে ব্যথা হয়েছে এরই মধ্যে, পরে আর কোথাওই খচ্চরে উঠব না। এটা নিশ্চিত। অতএব কেদার যাব না।

২৯
যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা?

যমুনোত্রীর পথ যেখানে শেষ হয় সেখানটা আরো সরু, খুব পিছল, পাথুরে এবং কাদাময়, নোংরা। ঘোড়া থেকে নামলুম যেখানে (অর্থাৎ খচ্চর থেকে), সেখানে ফের সেই পশুর মলমূত্রের বাড়াবাড়ি এবং তার মধ্যে বর্ষার জলস্রোত—হেঁটে পেরিয়ে খুব সরু একটা গলি দিয়ে যেতে হয়। সবে উঠেছি, হঠাৎ একটা ঘোড়া একজন গ্রাম্য জাঠ বুড়োকে ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াওলারা ধমকে উঠল, "কী, চোখে দেখতে পাও না? অন্ধ নাকি? মরবে একদিন, শালা বেওকুফ।" বুড়ো ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ গড়গড় করে পিছলে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়ে গেল। আমি চোখ বুজেই ফেলতুম—তার আগেই দেখি খানিক নিচেই একটা চত্বর মতো, তাতে এক বুড়ী জাঠনী ছুটে এসে বুড়োকে জাপ্টে ধরে ফেলল। নইলে ওটুকু চত্বর পার হয়ে, ওপাশে খাদের মধ্যে পড়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন ছিল না। দুই বুড়ো-বুড়ীর মাথা গা ঢেকে বিরাট বড় বড় দুটি লাল নীল প্লাস্টিকের শীট কাদায় লুটোচ্ছে, তারই ওপর পা পড়ে হড়কে গেছে। খুবই বিপজ্জনক বর্ষাতি।

যমুনোত্রীতে পৌঁছে মনে হল, কেন এলুম? এই জন্য আসা? এই কুশ্রী অপবিত্র নোংরা, মলমূত্র-জর্জরিত কর্দমাক্ত জায়গায়? পাহাড়ের ওপরে আকাশ কত পবিত্র, কত বীজাণুশূন্য, কত শুদ্ধ। আর মাটি এত অশুদ্ধ এত অপবিত্র এত রোগবালাইয়ের আড়ত হবে? একদিকে একটা ধর্মশালার দেয়াল। অন্যদিকে ছ' ইঞ্চি কাদার ওপর প্লাস্টিক বিছিয়ে ত্রিপলঢাকা চা-জিলিপি-পুরী-হালুয়ার দোকান। মাঝখান দিয়ে সরু যাতায়াতের গলিপথ। ডালায় করে পুজোর নৈবেদ্য বিক্রী হচ্ছে—৫৲, ৭৲, ১১৲, ২১৲ দেখলুম। মিসেস মুখার্জী বলেছেন তাঁর স্বামীর নামে পুজো দিতে। ৫০৲ সঙ্গে দিয়েও দিয়েছেন। পুজো কী করে দেয় কে জানে! একটা ১১৲ থালা কিনে আমি পিকোকে দিই। বলি, "যা, শিখে আয় দিকি কী করে পুজো দিতে হয়!" দোকানী বলে, "ছি ছি, এত-দিনেও নিজে শিখলে না?" তাড়াতাড়ি বলে দেয়, "থালাটাও যেন পুজোয় দিও না, ওটা আমাকে ফেরত দিও কিন্তু।" হয় মলিন অ্যালুমিনিয়মের কাঁসি, নয় নোংরা

এনামেলের প্লেটে পুজো সাজানো একটু সিঁদুর, একপাতা প্লাস্টিকের টিপ, একটা বিশ্রী চুলের ফিতে, একটা ছোট আয়না, কাচের চুড়ি এক জোড়া, একটা পুঁতির মালা, কিছু বাতাসা-এলাচদানা, তুলসী-ধূপ এই ২৫্। জিনিস যত কমবে দামও তত কমবে। নৈবেদ্যের ছিরি দেখেও খারাপ লাগলো খুব।

—মন্দির কই ?

—ওই পেছনে। প্রথম তো কুণ্ডে যান। সপ্তকুণ্ড। স্নানটা সারুন। চাল, আলু এনেছেন ? রুমালে বেঁধে কুণ্ডে ডুবিয়ে নিন, আলুভাতে ভাত খেতে পারবেন। আমরা এনেছি। ও বাবা, ঐ জলেই স্নান ! ভাতেভাত হয়ে যাবো যে !

—না না, ওটা স্পেশাল কুণ্ড। ওতে স্নান নয়। স্নানের আলাদা তিন-চারটে কুণ্ড আছে। অনেকগুলি বাঙালী এখানে। এঁদের পথেও দেখেছি। খচ্চরে চড়ে বিচ্ছিরি পথটা পার হচ্ছেন জোরে জোরে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে। মহিলারা সবাই সাধারণ করে সুতী তাঁতের শাড়ি পরেছেন, কিন্তু আমার মতো ঠ্যাং বেরিয়ে পড়ছে না কারুরই। সবাই নিচে পা-ঢাকা লম্বা গেঞ্জির আণ্ডারওয়্যার পরেছেন আব্রু রাখতে। ঘোড়ার ব্যাপারটার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল। ওঁদের কেউ শিখিয়ে রেখেছিল।

এইসব কথাবার্তা শুনছি চায়ের দোকানে বসে। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। দোকানে বসার জায়গা নেই। আর সবাই দাঁড়িয়ে। দুটিমাত্র চেয়ার ছিল টিনের— আমি আর পিকো প্রথমেই পেয়ে গেছি। এত ক্লান্ত ছিলুম আর যমুনোত্রী এতই হতাশ করেছে যে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। যদিও বয়স্ক কিছু লোক দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন। হঠাৎ দেখি সেই পাঞ্জাবী বৃদ্ধা। এসে পৌঁছেছেন তাহলে ? তাড়াতাড়ি তাঁকে চেয়ার ছেড়ে দিই। মেঝেতে বসার জায়গা নেই। সবটা কাদায় কাদায় লেপে গেছে। ইতিমধ্যে রঞ্জনও এসে যায়। হাতে একটা ভাঙা গাছের ডাল ল্যাকপ্যাক করছে।

"এই যে দিদি, এই নাও লড়কী !"

চা-জিলিপি-পুরী-হালুয়া দারুণ জমল। চায়ে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খাই। বৃদ্ধাকেও খাওয়াই। "দাবাই দিয়া ? চায়মে কুছ দাবাই ডালা ? অ্যায়সা লাগতা হ্যায় কিঁউ ?" বলে নাক ভুরু কুঁচকোতে কুঁচকোতে উনি চা খেয়ে নিলেন। এরপর গ্লুকোজের প্যাকেট খোলা হল। রঞ্জন কোনটাই খায়নি। বৃদ্ধাকে গ্লুকোজ খাওয়ানো এবং সঙ্গে পথের জন্য দেওয়া হল। ইতিমধ্যে নাতি দুটি এসে গেছে। নাতি দেখে ঠাম্মার ফোকলা মুখে কী হাসি ! ছেলের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। আমরা কুণ্ড দেখতে চললাম।

৩০

ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে

এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না এখানে। যদিও এখানে যমুনা-শিশুর খেলাধূলা সত্যি বড় চমৎকার। গ্লেসিয়ার থেকে নামছে তুহিনশীতল ঝকঝকে নীল ধারায় উন্মত্ত গর্জিত প্রপাত। তার মধ্যে মধ্যে উষ্ণ স্রোত—সপ্তকুণ্ডের সালফার স্প্রিংয়ের ধারা পাশেপাশেই ছুটছে, গরম, তাতে হাত-মুখ ধুচ্ছেন ক্লান্ত যাত্রীরা। বৃষ্টির পরে এই শিখর হঠাৎ-হঠাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। গাঢ় মেঘের চাদরে দু'হাত দূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারটে মস্ত গ্লেসিয়ার সমেত হিমালয় পর্বত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। বাপ রে, এভাবে ঐ ভয়াবহ পথ দিয়ে নামবো কেমন করে! মর্মভেদী হাওয়ার মধ্যেই উষ্ণকুণ্ডে বহু মানুষ স্নান করছেন। নারী পুরুষ শিশু। আমি অঞ্জলিতে জল নিয়ে মাথায় দিলুম। নমো বিষ্ণু। স্নানের জন্য প্রস্তুত নই, উৎসাহও নেই। পিকোরও প্রস্তুতি নেই। উৎসাহ থাকলেও তাই তার স্নান হল না। কেবল অপ্রস্তুত অবস্থাতেই রঞ্জন নেয়ে ফেলল। কুন্দন সিং চায়ের দোকান থেকে তোয়ালে ভাড়া করে এনে দিল। মেয়েদের পোশাক বদলের ঘরটর নেই। ভিজে কাপড়ে বেশ খানিকটা গিয়ে একটা দেয়ালের পাশে মেয়েরা কোনো-রকমে কাপড় পরছেন। অব্যবস্থার চূড়ান্ত। হঠাৎ শুনি গিটকিরি লাগিয়ে গলা ছেড়ে কেউ গাইছেন—"ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো—" এক পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রলোক। সদ্যস্নাত, পরনে গামছা, শীতের চোটে গলায় গান বেরিয়েছে। বাঙালী না হলে এরকম জমাবে কে!

মন্দিরও দেখবার মতো নয়। একটা বসবার চাতাল পর্যন্ত নেই। এত কষ্ট করে প্রাণ হাতে নিয়ে এই যে ছুটে আসছে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বিশ্বাসী মানুষ, তাদের বিশ্রামের কোনো ব্যবস্থা নেই। বসবার পর্যন্ত ঠাঁই নেই। তারা এসে একটু জুড়োবে কোথায়? একটু গা এলাবে কোথায়? দুটো খাবে যে রেঁধেবেড়ে তারই বা জায়গা কই? ঐ এক কালীকম্বলীওয়ালার ধরমশালাই আছে।

বিশ্বপ্রকৃতি যমুনোত্রীকে যতদূর সাধ্য সুন্দর, স্বাস্থ্যকর করেছেন। আমার দেশের মানুষ তাকে তার সাধ্যমতন অসুন্দর, অস্বাস্থ্যকর করেছে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিতে দেখেছি নৈসর্গিক রহস্যবিহ্বল কোনো সুন্দর জায়গাকে, হোক তা পর্বত-চূড়া বা সমুদ্রতীর, পশ্চিমী মানুষ মানুষের ভোগের উপযুক্ত করে তোলে। পারলে সেখানে সরাইখানা খোলে, নিদেনপক্ষে শুঁড়িখানা বসায়। পাবলিক টয়লেট বসায়। নিসর্গ দৃশ্য ভাল করে দেখবে বলে বাইনোকুলারও বসায়। সম্ভব হলে

(ট্রেকিং / স্কীইং / সুইমিং / বোটিং) খেলাধুলোর বন্দোবস্তও থাকে। আর আমরা ? সেই একই জায়গাকে ঈশ্বরের ভোগের ঠাঁই করি। মন্দির স্থাপনা করি। সেই ভাবেই আমাদের আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করি। মনটাকে ঊর্ধ্বে তুলে শরীরের সুখ স্বস্তি নয়, চিত্তের আনন্দ, শান্তির দিকে তাকাই। কত তফাত দুটো সভ্যতায়। এইটে ভেবে এতদিন আমার গর্ব হোতো।

যমুনোত্রীতে এসে বুঝলুম আমরা নশ্বর দেহধারী, সভ্যতা-শাসিত মর্ত্যবাসী। আমাদের পরিষ্কার টয়লেটের খুব জরুরী দরকার। পাঁচ ঘণ্টা খচ্চরে, অথবা আট ঘণ্টা পদব্রজে এই পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের পরে শরীর বিশ্রাম চায়, বসতে চায়, একটু স্বস্তি চায়। বেশিরভাগই আসেন ভক্তিপ্রাণ বুড়োমানুষ। তাঁদের অপরিসীম ক্লান্তির অপনোদন ঠিক ভাবে হয় না। এই মন্দিরের দর্শনের সুখ নেই। অনতি-বিলম্বেই উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচিত পথে টিকে দেবার এবং ডাক্তারের ব্যবস্থা করা। বিশেষত যেখানে ডাণ্ডী কাণ্ডী ঘোড়ার যাত্রীদের বিনা নোটিশে পদব্রজে পর্বতারোহণ করাচ্ছেন, সেই অংশে। ঐ দুটি শাদা ক্যানভাসের ক্ষুদ্র খোপের চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যক ও বেশি উন্নত পার্মানেণ্ট বাথরুমের আশু প্রয়োজন এবং যথেষ্ট মেথর চাই। পাবলিক কনভিনিয়েন্সের কোনোই সুবিধা নেই যমুনোত্রীতে। ছোট্ট জায়গা, বিস্তর লোক, খাড়া পাহাড়, পথহীন। বনবাদাড়েও যাওয়া যায় না। নদীর পাড় উন্মুক্ত। লোকে করবেটা কী ? সরকারের উচিত যমুনোত্রীতে একটা ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস জাতীয় বিশ্রামস্থল করা। নিদেনপক্ষে বিড়লা শেঠজী তো এদিকে তাকাতে পারেন ? অথচ এই অঞ্চল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দ্বারা সুরক্ষিত। মোটর রাস্তাগুলি বি. এস. এফের তৈরি। এক্ষুণি কেন্দ্রীয় সরকার মহারাজ ইচ্ছে করলেই যমুনোত্রীর রাস্তা উন্নয়ন সম্ভব। মিলিটারি লাগিয়ে যমুনোত্রীর ওখানে একটি সিমেণ্টের নাটমন্দির গোছের চাতাল অন্তত বানিয়ে দিতে পারেন, যেখানে ক্লান্ত সাধুসন্ন্যাসীরা এবং যাত্রীরা ঝড় বৃষ্টি বরফ রোদ্দুরের হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। কী অসামান্য পথশ্রম সহ্য করে গ্রাম্য বৃদ্ধবৃদ্ধাদের এই তীর্থযাত্রা ! চোখে না দেখলে টেরই পেতুম না, এ ব্যাপার যে আজও ঘটে।

যমুনোত্রীই হয়তো বা একমাত্র জায়গা, যেখানে "কৃচ্ছ্রসাধন" শব্দের অর্থবোধ হয় ! অথচ যাত্রাশেষে তীর্থের প্রার্থিত শান্তির স্বাদ আমি অন্তত পাইনি। অন্যদের কথা জানি না। তাঁদের মূল্যবোধের থেকে হয়ত আজ আমি দূরে চলে এসেছি। আমার যতটা অসহ্য লাগছে, শ্রীহীন, প্রীতিহীন, ভক্তিহীন ব্যবসাসর্বস্ব একটি অস্বাস্থ্যকর দমবন্ধ পরিবেশ মনে হচ্ছে, ওঁদের তেমন মনে না হতেও পারে। অন্ধ-বিশ্বাসের আফিম ওঁদের খাইয়ে রেখেছি আমরা।

তবুও, ওঁরা নিশ্চয়ই বিশ্রামাগার, শৌচাগার, স্নানের জন্য ঢাকা ঘরের দাবী করতে পারেন। না পেয়ে না পেয়ে ওঁরা চাইতে ভুলে গেছেন। গ্রামে যেমন কষ্ট করে বাঁচেন সেই ভাবেই মানিয়ে নিচ্ছেন। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে আধাআধি ভাগ করে নিচ্ছেন তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা। যেদিকে বেশিটা যায় যাক। ভয় কি? উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ। এই তো মহাপ্রস্থানের সেই পথ। কাশীতে মরলে তবু তারকব্রহ্ম শুনতে হয় কানে, তবে মুক্তি হয়। এখানে ও-সবেরও নাকি দরকার নেই। এহ বাহ্য। এখানকার শুদ্ধ বায়ুই কানে তারকব্রহ্ম শুনিয়ে দেয়।

৩১

"সব চেয়ে ভালো পা-গাড়ি"

ফেরবার পথে আমরা হেঁটেই নামলুম জানকীচটি পর্যন্ত। লাকড়ি না থাক, আমার লড়কি ছিল সঙ্গে, রঞ্জন আগে আগে একা একা নেমেছে। এই হেঁটে নামার সময়ে আমি পথের সৌন্দর্য দু'চোখে পান, লেহন ও চর্বণ করতে করতে এসেছি। এখন তা স্মৃতিতে চোষ্যে রূপান্তরিত।

জানকীচটিতে এসে বেজায় খিদে। আমাদের ঘোড়াওলারা আগেই হাজির। রবীন্দ্র সিং একটা ছোট হোটেলে বসে 'ডালরোটি' খাচ্ছে। দেখে আমরাও সেখানে যাই। চমৎকার ডালফ্রাই, নরম রুটি, আর গরম আলুর ঝোল। এবং চা। আঃ! দারুণ! খেতে খেতে রঞ্জন বলল, তার এবার বাহন চাই। জুতো পরে পায়ের একটা লম্বা নখ ওর একটা আঙুলে ঢুকে গেছে, ভীষণ ব্যথা করছে। ঘোড়া জুটলোও জানকীচটি থেকে, (খচ্চর না, ঘোড়াই) গোটা ত্রিশেক টাকাতে।

খচ্চর থেকে নামলেই আরাম। পথে একবার চা খেতে থেমেছি, চা নয় নামাই উদ্দেশ্য। জায়গাটির কোনো নাম নেই। চটি নয়, পথযাত্রীদের জন্য চা, পকৌড়ার দোকান। কিছু গাছপালা, পাথর-টাথর আছে। বড় পাথর খুঁজে যেখানেই বসতে চেষ্টা করি হাঁ হাঁ করে কুন্দন সিং বলে, "বোসো না, বোসো না, ওখানে ঘোড়ায় পিশাব করেছে।" ধুত্তোর, ঘোড়াদের কি মন্দ স্বভাব রে বাবা! শেষে দাঁড়িয়েই চা খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সেই গেঁজেল সাধুটি এবার নামছেন। যথারীতি কন্ধে হাতে বসে আছেন। আমি দৌড়ে কাছে যাই।

"সাধুজী? আপ কাঁহাসে আয়ে হেঁ?"

"মালুম নহী।"

"কিধর যায়েঙ্গে আপ?"

"মালুম নহী।"

মিষ্টি করে হাসলেন, কল্কেতে মুখ দিয়ে চোখ বুজে ফেললেন। আরেকজন সাধু চা খাচ্ছেন।

"সাধুজী, আপ কাঁহাসে আয়ে হেঁ?"

"মাদরাসসে।"

"কিধর যানা হ্যায়?"

"গঙ্গোত্রীধাম"

"আপ কিধর ঠাহরতে হেঁ?"

হাত উলটে হাসলেন। হাতে বালতি আর পুঁটলি। আজকাল সাধুদের সাজবদল হয়েছে। ধাতুর তৈরি কমণ্ডলু দেখা গেল না একটাও। দু'একজনের হাতে লাউয়ের কমণ্ডলু অবশ্য আছে। একজন কোঁকড়াচুল স্মার্ট গেরুয়াধারী সাধুকে মাঝে মাঝেই দেখেছি লাঠি হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন। এবারেও দেখি তিনি নেমে যাচ্ছেন। গায়ে নীল প্লাস্টিকের রেনকোট। সঙ্গে অনুরূপ রেনকোট শোভিত চেলা।

চেঁচালুম, "সাধুজী, আপ কাঁহাসে আতে হেঁ?"

"দেওঘর থেকে।" বলে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মোটেই এতক্ষণ টের পাইনি তিনি বাঙালী। গৈরিক আর জটাজুটের মধ্যে কে মাদ্রাজী কে বিহারী কে বাঙালী বোঝার কোনো উপায় নেই। ভাষাও সবারই ভাঙা হিন্দি। সাধুরা অবিশ্যি একদম বাইরে এক, আর একদম ভিতরে এক—মাঝখানে নানান ভেদ-বিভেদ। মঠ-মন্দিরে বড্ড ক্ষমতার লোভ, কাড়াকাড়ি, দলাদলি। দেখেছি তো। ভগবান নিশ্চয়ই শত হস্তেন দূরে থাকেন যাবতীয় ধর্মের মঠ-মন্দির থেকে। কিন্তু উত্তরাখণ্ডের এই শীতের মধ্যে ঘাম ছোটানো রাস্তায় সাধুদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। এখনও পর্যন্ত কেউ ভিক্ষে চায়নি। শতচ্ছিন্ন বস্ত্রে যাত্রীরা উঠছেন, প্রায় বস্ত্রহীন সাধুরা উঠছেন, কারুর কিছুই চাইবার নেই। মানুষের কাছে হাত পাতবার নেই। অন্যান্য তীর্থের চেয়ে অনেক আলাদা। সায়নচটিতে যে পাণ্ডাকে দেখলুম, তার ছেলে যমুনোত্রীতে মন্দিরে হয়তো পুজো দেন, কিন্তু পাণ্ডার অত্যাচার নেই। নিজেই তো পিকো গিয়ে পূজারীর হাতে পুজো দিয়ে এল মিস্টার মুখার্জীর নামে। একমুঠো ফুটকড়াই ভাজা ন্যাকড়ায় বেঁধে প্রসাদ দিয়ে বাকী সব কিছু নিয়ে নিয়েছে মন্দিরে। বুঝলুম, রি-সাইক্লিং হয়ে আবার দোকানেই ফিরবে। যেটুকু মন্দিরের সঙ্গে যোগ, সেইটুকুনিতেই আছে অসাধুতা, ব্যবসা বাণিজ্য, অধর্মীয় আচার। আশ্চর্য!

৩২

নৌকর হ্যায়

—"ভোক লাগা, বেটা?"—"নেহী।" সারাপথ এত যত্ন করছিল কুন্দন সিং রবীন্দ্র সিংকে, পিকো জিজ্ঞেস করলে, "তোমার বাবা?" রবীন্দ্র সিং ঘেন্নার সঙ্গে বললে, "ও? বাবা কেন হবে? ওকে আমি চিনিই না। নৌকর হ্যায়।" কুন্দন সিং তখন আমাকে বলছে—"রবীন্দ্র সিং কখনো যমুনোত্রী যায়নি তাই ভাবলাম নাহাকর্ লায়েঙ্গে। এই প্রথম ট্রিপ্, বাচ্চা ছেলে। ঘোড়া সামলাতে পারবে কিনা কে জানে তাই ওকে যমুনীর সঙ্গে দিচ্ছি। যমুনীর কোনো ঘোড়াওলা লাগে না। মোহনের বয়স অল্প, ওর সঙ্গে আমি আছি।" এতে আমিও খুশি কেন না মোহনের পিঠেই আমার মোহিনীটি বসে আছেন।

রবীন্দ্র সিং রঞ্জনের সেই গুরুমহারাজের ভাইপো। ওদের নানা ধরনের ব্যবসা, হোটেল আছে, কাঠের গুদোম আছে, ঘোড়া খচ্চর আছে আর আছে অহংকার। রবীন্দ্র ক্লাস সেভেনে পড়ে, কুন্দন সিং স্পষ্টতই তার খচ্চর শাস্ত্রের গুরু। পদে পদে শেখাচ্ছে কখন লাগাম আলগা করবে কখন কষে ধরবে, কখন ডাইনে ছুটতে হয় কখন বাঁয়ে, কখন জানোয়ারকে জল খেতে দেবে কখন দেবে না। অথচ রবীন্দ্র সিংয়ের কাছে তার পরিচয়—"নৌকর হ্যায়"।

একটি মানুষকে হঠাৎ সামনে দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে গেলুম। একটু আগেই কুন্দন সিং এক খচ্চরওয়ালাকে বকেছে—পিঠে বেশি বেশি মাল চাপিয়েছে বলে—"জানবরকো মার্ ডালেগা, ক্যা? জরাসা দিল্ লগা কর দেখ লো তো—উসকা কিতনা তক্‌লিফ হো রহা?" এই মানুষটির পিঠে তার চারগুণ বেশি মাল। সে বেঁকে আধখানা। দ-এর মতো হয়ে হাঁটছে। এত মালপত্র একজন কুলির নেওয়া উচিতই হয়নি। তিনজন কুলির মাল। মানুষের এত অপমান! যেন ক্রীত-দাসদের যুগের নকল দৃশ্য দেখছি—এ আমার সহ্য হয় না। রঞ্জনের ঘোড়া অত্যন্ত ঢিমেতেতালায় খুঁড়িয়ে গড়িয়ে পেছনে পেছনে আসছে। আমাদের খচ্চরগুলি ঘরে ফেরার উল্লাসে দ্রুত পায়ে পথ অতিক্রম করছে। হনুমানচটি থেকে আরো চার কিলোমিটার ওদের বাড়ি।

"কুলিটা অত বেশি মাল বইছে, কত বেশি টাকা ও পাবে, কুন্দন সিং?"

"কত আর পাবে? এই আড়াইশো মতন! ভালই পাবে বলে মনে হচ্ছে ঐ পাহাড়প্রমাণ মাল দেখে। ঠিকসা খানাভি নহী খাতা, একরোজ মর যায়েগা শালা বুদ্ধু।" ওর পুরো চেহারাটাই বলছে, "নৌকর হ্যায়"।

৩৩

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্

আমরা যখন নেমে এলুম, দেখি রোগা একটি সাধু উঠছেন তখন—তাঁর চোখের দৃষ্টির তীব্রতা মনে থাকার মত। একটিমাত্র পা। দু'হাতে একটি দীর্ঘ লাঠি ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছেন। অনায়াসে। কোথা থেকে আসছে এই শক্তি? দু'পায়ে এবং ছ'পায়েও যে আরোহণ কঠোর কৃচ্ছ্র, এঁর চলার ধরনে তা মনেই হোলো না। আমি আর পিকোলো দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য কথা বলতে পারলুম না আর।

হনুমানগঙ্গার কাছেই হনুমান মন্দির হচ্ছে। তাঁবু পেতে কিছু সন্ন্যাসী বসে আছেন ধুনি জেলে। খচ্চর থামিয়ে মুখে চিনি-প্রসাদ ধরে দিলেন। আগে খচ্চরকে খাওয়াছেন।—"আ বেটা, বহুৎ পরেশানি হুয়া তুঝকো?" তার পরে সওয়ারীকে। তারপর থালাটি পাতছেন। সাধুর মাথায় মাংকিক্যাপ, পায়ে হান্টার জুতো। হিউয়েন সাং-এর মত দেখাচ্ছে। যমুনোত্রী যাত্রায় এই প্রথম থালা। মন্দির নির্মাণের চাঁদা। পুণ্যার্জন করে ফেরার পথে এঁদের কেউ বিমুখ করতে পারছে না। শেষে ঐটুকু কার্পণ্যের জন্য না পুণ্যে খুঁত পড়ে যায়।

যখন আমরা বরকোটে পৌছোলুম, নড়তে চড়তে কষ্ট হচ্ছে। হনুমানচটিতে আর না থেমে সোজা বরকোটে। সেই বাঙালী ছেলে দুটি বলেছিল ১৫৲তে ডবল বেডওলা ঘর আর ৫৲তে গরম গরম মাংস ভাত পাওয়া যায় বরকোটে।

৩৪

অমৃতাঞ্জনের সন্ধানে

সূর্যাস্তে উদ্ভাসিত শান্ত সুশ্রী বরকোটে পৌছে দেখি ট্যুরিস্ট লজটি বন্ধ। স্ট্রাইক চলছে। ওদেরই একজন সঙ্গে এসে একটি হোটেল দেখিয়ে দিল। গাড়ি থামলেই পিকো খুব খুশি হয়। যতক্ষণ গাড়ি চলে পিকোর মেজাজও ক্রমশ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে। যতই গা গুলোয়, মাথাও তত গরম হয়। ঝর্নায় ঝর্নায় তোয়ালে ভিজিয়ে তার মাথা ঠাণ্ডা করতে করতে ভয়ে ভয়ে যাওয়া হচ্ছে। যমুনোত্রী থেকে বরকোটে আসার পথে স্নোভিউ যতবারই দেখি, অমনি "ঐ ছাখ ছাখ" করে আমি চেঁচিয়ে উঠি। পিকো বিরক্ত হয়ে বলে—"আমাকে নিজে নিজে দেখতে দাও তো? অত চেঁচামেচির কী আছে?" স্বভাবই যে আমার আহ্লাদে চেঁচামেচি করা। "কিছু" থাক বা না থাক। আমার বাবার মতন।

বরকোটের হোটেলটা মন্দ নয়। দোতলায় জোড়াখাটওলা ঘর। একটা নেয়ারের খাটিয়া দিয়ে দিল রঞ্জনের জন্যে। কুড়ি টাকা সব মিলিয়ে। স্নানের গরম জল নিলে বালতি প্রতি দু'টাকা। তিনটে লেপ দিয়ে দিল, দু'টাকা করে। চা একটু দামী। ষাট পয়সা। যমুনোত্রীতে সত্তর। জানলা আছে পর পর তিনটে। খুলে দেখি হিমালয়ের ছায়ামূর্তি চাঁদের আলোতে স্থির হয়ে আছে। জানলা বন্ধ করতে ইচ্ছে করল না। বরকোটে খুব বেশি ঠাণ্ডা নেই। মশারিও অবশ্য নেই। তবে মাছির উপদ্রবটাই দেখা গেল উত্তরাখণ্ডে বেশি। মশা নেই তেমন। ঝুপ করে বাতি নিবে গেল। অমনি চেঁচাই।—"রঞ্জন, ভালো করে মোমবাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে নে বাবা ঘরে আবার টারানটুলা মাকড়সা আছে কিনা?"

"টারানটুলা কেবল আফ্রিকায় হয় মা। এখানে কেমন করে আসবে?"

"কিন্তু এসেছিল তো। হনুমানচটিতে আসেনি কি?"

"সেটা টারানটুলা কে বললে?"

"যা হোক একটা নাম দিতে হবে তো?"

ঘরে পোকামাকড় ছিল না। বিজলীও মিনিট পনেরের মধ্যে ফিরে এল। হোটেলের নিচেই খাবারের দোকানে ডালফ্রাই মাংস রুটি দই খেতে তিনজনের কুড়ি টাকা লাগলো—এবং চা।

খচ্চর পিকোকে একটুও কাহিল করতে পারেনি। কিন্তু রঞ্জনের আর আমার সারা গায়ে ব্যথা। রঞ্জন বেরুলো অম্রুতাঞ্জনের সন্ধানে। পিকোকেও বললুম ঘুরে আয় ফাঁকা হাওয়ায়। আমার তো নড়ার শক্তি নেই। ওরা এসে বলল দোকানে অম্রুতাঞ্জন তো আছেই, ক্যাসেট টেপও আছে। লতা, হেমন্ত, মেহদী হাসান, গুলামালি। 'আর যাব না আর যাব না যমুনায় জল আনিতে'।

শুধু যমুনা কেন? অশ্বপৃষ্ঠে কোথাও যাব না। কেদারনাথ আউট হয়ে গেলেন। ঐ চোদ্দ কিলোমিটার হেঁটে-ওঠা আমার সাধ্য নয়। ডাণ্ডী চড়তে রুচিতে বাধে। কাণ্ডীর প্রশ্ন নেই। অতএব কেদার হল না। কৃচ্ছ্রসাধন না করলে তীর্থভ্রমণ হয় না, তা কৃচ্ছ্র দিয়েই শুরু হল যাত্রা। চারধাম হল না, তিনধাম।

সাহেবরা এত আরামের ব্যবস্থা করে রাখে, যে আরামে ডুবে বসে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নিয়ে মুগ্ধ হবার সুযোগ হয়। হয়তো ওরা খোলসটার আরামের ব্যবস্থা করে বলেই আত্মার দিকে আপনি নজর গিয়ে পড়ে। আমরা খোলসটার কথা না ভেবে শুধু আত্মার কথাই ভাবছি—ফলে খোলস বলে—"আমাকে দেখ"—বলে সবটা মন টেনে নেয়। অধ্যাত্মর দিকে আর যেতেই দেয় না। মেটিরিয়্যাল কম্‌ফর্টস মোটেই ইম্‌মেটিরিয়্যাল নয়, প্রাথমিক পরিচয়ে শরীরধারী জীব তো আমরা।

৩৫

ব্রহ্মখাল, ধরাসু ডুন্ডা

বরকোটে ভোরবেলা মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙলো। ঘরে বসেই পর্বতের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করলাম। যতবার দেখার সৌভাগ্য হয়, ততবারই ধন্য বোধ করি। হোটেলে একজন পাঁড়েজী আছেন, খাটিয়া থেকে বেড-টী পর্যন্ত তিনিই সাপ্লাই করেন, গরম জল এল। অন্ধকূপ বাথরুমে স্নান সেরে ফের গরম ভাত, মাংস, ভিণ্ডিকা সবজি, ডালফ্রাই, দই খেয়ে রওনা হয়ে পড়ি।

বরকোট থেকে প্রচুর ঝাউবনের মধ্য দিয়ে পথ। আর একটু পেরিয়েই অপূর্ব স্নো-রেঞ্জ দেখা যায়। বেশ অনেকক্ষণ। বরকোট থেকে প্রায় ব্রহ্মখাল পর্যন্ত এই ঝাউবন-ঘেরা পথ। মাঝে-মাঝে আশ্চর্য সুন্দর ঝর্ণা।

সারাটা পথ রাস্তায় শুধু সাধুদের হাঁটতে দেখেছি। হিমালয় সত্যিই সাধু-সন্নিসির স্থান।

মোটরের রাস্তা বেয়ে সমানেই একা একা যাঁরা হাঁটছেন, তাঁদের বগলে একটু-খানি কম্বলের পুঁটলি, হাতে একটি ঝুলন্ত জলপাত্র। লোটাকম্বল। কমণ্ডলুকে রিপ্লেস করেছে অ্যালুমিনিয়ামের 'হারা'। তোমরা সাধুরাই আমাদের পথসঙ্গী। যদিও আমরা তোমাদের পথসঙ্গী নই। যদিও তোমরা আমাদের দিকে ঘেন্না করেও ফিরে তাকাবে না, জানি এই নীলপর্দাওলা শাদা গাড়ির সঙ্গে মিলিটারি ট্রাক আর ঝড়ঝড়ে বাসের কোনো প্রভেদ নেই, তোমাদের কাছে সবই এক, সবই এহ বাহ্য। তবু, তোমরা জানো না এই যে ঝাউবন, এই যে ঝর্ণা, তোমরাই এদের আলাদা করেছো, জ্যোতির্ময় করেছো। এই তোমাদের গৈরিকের ছোঁওয়া লেগেই এই সব গ্লেসিয়ার আল্পসের আর আন্দেজের ধবধবে গ্লেসিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি শুভ্র। আমার চোখের বাইরেই শুধু থেকো না। এসো ভেতরে এসো। এই গাড়ি, এই আরাম, এই পর্দা, এ আমার নয়। এ আমার গায়ে ফুটছে, তোমরা জানো না তোমরা জানো না। আমারও আছে তোমাদের মতোই লোটাকম্বল, আছে জটাজুট। পূর্বাশ্রমের পরিচয় বিসর্জন দিয়ে আমিও এখন নতুন জন্মে—। কেবল একটু সময়ের অপেক্ষা। দেখা হবে। একদিন সমানে সমানে দেখা হবে। এমনি মেঘের আলোছায়া ভরা ঝাউবনের পথে, এমনি ঝর্ণার ধারে। দেখা হবে। এ তো তারই প্রস্তুতি। সবাই তো লালাবাবুর মতো ডাক শুনতে পায় না। আর কেউ কেউ ডাকাডাকি শুনেও কানে হাত চাপা দিয়ে থাকে।

একটা প্রচণ্ড ঝর্ণায় বাচ্চা পাহাড়ী ছেলেরা স্নান করছে। হঠাৎ দেখি ঝর্ণা

বেয়ে পাথরে পা রেখে রেখে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছেন এক সন্ন্যাসী। হাতে জলপাত্র। শুদ্ধতার আশায়। এই ঝর্ণা বেয়ে ওঠাই আমাদের একমাত্র উপায়। উৎসের সন্ধানে ওঠা।

ঝাউবনের ছায়ায় মাটিতে পথের ধারে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সুখী গেঁজেলরা। চোখ উদাস, গাড়িতে, গাছে, মেঘে উড়ে বসছে কি বসছে না।

উত্তরাখণ্ডে এসে ইস্ট ইউরোপ আর রুশদেশের সঙ্গে একটা বড় মিল চোখে পড়ল। দেওয়ালগুলি ফাঁকা। কোথাও কোন বিজ্ঞাপন নেই। একমাত্র সরকারি বিজ্ঞাপন "দো ইয়া তিন" ছাড়া।

এইখানে অবশ্য মালুম হয় স্থানমাহাত্ম্যটি। ওদেশে দশ ছেলের মা সোনার মেডেল পায়। একটু ভুল হলো—ছিল, হাতে লেখা বিজ্ঞাপন ছিল বটে একটা। প্রত্যেক গ্রামেই কোনো না কোনো দেয়ালে হয় পূরণবিড়ি নয় তো পাবনাবিড়ির বিজ্ঞাপন। হঠাৎ ডুন্ডা গ্রামে একটি দোকানে দেখি "জেণ্টেলম্যানস টেলারিং শপ্"-এ বসে বসে পায়ে সেলাইকল চালাতে চালাতে ট্রানজিস্টার শুনছে একটি ছেলে, দেয়ালে মস্তবড় অমিতাভ বচ্চন গোমড়ামুখে চেয়ে আছেন। এই প্রথম ট্রানজিস্টার, বোম্বাইচিত্র। সেলাম ডুন্ডা!

ধরাসুর কাছ থেকেই নদী পাথরে পাথরে ধবধবে শাদা, ফুটন্ত দুধের মতো উথলোচ্ছে। বাবা-মার সঙ্গে যখন ইণ্টারলাকেন গিয়েছিলুম, ট্রেনের ধারে ধারে ঠিক এমনি একটা দুধশাদা ঝর্ণা নদী ছুটছিল। আমার সঙ্গে মনে মনে তার সখিত্ব হয়ে গিয়েছিল। একসময়ে ইণ্টারলাকেন এসে গেল। ট্রেন থেকে আমি নেমে এলুম। উন্মত্ত নদী ছুটেই চলল। বুকের মধ্যে মন-কেমন-করা নিয়ে চললুম। হোটেলে পৌছে ঘরের জানলা খুলেই—কী দেখি? আমার জানলার নিচে দিয়েই হাসতে হাসতে ছুটে যাচ্ছে আমারই সেই প্রিয় সখী—ফুটন্ত দুধের নদীটি! এতটা আনন্দ জীবনে কবার হয়? হঠাৎ শাদা নদী দেখে সেই কথা মনে পড়ে গেল!

৩৬

বেরিয়ে পড়লুম ভগবানের নাম করে

উত্তরকাশী নামটা আমাকে চিরকাল টেনেছে। উত্তরকাশী, গুপ্তকাশী, যোশীমঠ—নামগুলোই যেন গৈরিক অক্ষরে লেখা। উত্তরকাশীর গৈরিকা গঙ্গা হৃষীকেশের স্বচ্ছ তরুণীটির চেয়ে বহুগুণ বেশি চঞ্চলা, বরকোট থেকে ধরাসু, ধরাসু থেকে ভাগীরথীকে ধরে ফেলে উত্তরকাশী।

ডুন্ডার পর মাতলিগ্রামের মস্ত সৈন্য শিবির সত্ত্বেও ভাগীরথী তীরের অসহ্য

সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারেনি। উত্তরকাশী ট্যুরিস্ট লজে একটা বাজে ঘর পেলুম। বাজারের মধ্যে বাস স্টেশনের গায়েই ট্যুরিস্ট লজ। জায়গাটির নিসর্গশোভার মূল্য শূন্য, কিন্তু সুবিধে অনেক। যাঁরা বাসের যাত্রী তাঁদের হাঁটতে হবে না। উখীমঠের দিকে রাস্তাটা যত উঠে যাচ্ছে, গঙ্গার তীরে একের পর এক সাধুর আশ্রম। পুরাণের গল্পে এই উখীমঠেই উষা-অনিরুদ্ধর ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। অনেক বয়স্ক বাঙালী যাত্রী দেখলুম, যে যাঁর গুরুদেবের আশ্রমে বেড়াতে এসেছেন। উত্তরকাশীই তাঁদের গন্তব্য, চারধাম নয়। একজন সাধুকে বিশ্বনাথ মন্দিরের পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি ইংরিজিতে উত্তর দিলেন। নিজেই কামাখ্যা থেকে এসেছেন। অসমীয়া! উত্তরকাশী চেনেন না। উত্তরকাশীতেও বিশ্বনাথ মন্দির আছে। আমরা গেলুম মিস্টার মুখার্জীর নামে পুজো দিতে। মিসেস মুখার্জী ভার দিয়েছেন। বিশ্বনাথ মন্দিরটি ভেঙে গিয়েছিল, পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশ শান্তিপূর্ণ। অনাড়ম্বর। জনমানবহীন ধূপ ধুনো ফুলের গন্ধওলা বড় উঠোন, ইঁদারা, বেলগাছ, টগরফুল; করবীফুলের গাছ। ভারী সুন্দর অতি সাধারণ। না আছে ইতিহাসের গৌরব, না শিল্পের দম্ভ, কেবল দেবতাটুকুই তার সর্বস্ব।

আমি মন্দিরের মধ্যে যাচ্ছি না। রঞ্জনকে বললুম, "যা, পুজোটা তুই দিয়ে আয়।" এক বৃদ্ধা বসেছিলেন সিঁড়িতে। বললেন, "বেটি, কোথা থেকে আসছো? যাবে কোথায়?" চারধামযাত্রী শুনে বললেন, "গোমুখে যেও না যেন। খুব কষ্ট হবে। আমার নাতি কালই ফিরেছে, পা ফুলে নীল। প্রচণ্ড বরফে পা জমে ঘা হয়ে গেছে। বেটি, গোমুখ নাহি যানা। এবার ওদিকে যাও—সঙ্কটমোচনের মন্দিরে পুজো দিয়ে এস। তাঁর কাছে যা চাইবে তাই মিলবে।" ওদিকে যে আরেকটাও মন্দির আছে, বুঝিনি। ভিতরে গিয়ে দেখি মস্ত হনুমান মন্দির। সঙ্কটমোচনের মন্ত্র লেখা দেয়ালে। কাশীতেও সঙ্কটমোচনের মন্দির দেখেছি, নৌকো থেকে নেমে। ভারী সুন্দর সে মন্দির। বিশ্বনাথ মন্দির থেকে বেরুতে যাব, দেখি সেই দেওঘরের বাবাজী ঢুকছেন। সঙ্গে চারজন সোয়েটার ট্রাউজার পরিহিত যুবক বাঙালী চেলা।—"এই যে, দেওঘরের বাবাজী!" মস্তিষ্ক কিছু ভাববার আগেই আমার জিব কাজ করে।—"কবে এলেন?"—"আজই!" বলেই বাবাজী চলে যাচ্ছিলেন। আমি আবার চেপে ধরি। "গঙ্গোত্রীতে কি যাচ্ছেন? কেদার বদ্রী?"—"নিশ্চয়ই। আপনারা?"—"আমি তো ভাবছি ফিরে যাব কিনা? সোজা বদ্রীনাথ হয়ে বাড়ি। যমুনোত্রীতে বড্ড কষ্ট হয়েছে।" অবাক হয়ে বাবাজী বললেন, "সে কি? ফিরে যাবেন কেন? গঙ্গোত্রীতে কোনো কষ্ট

নেই। পুরো রাস্তা বাস পাবেন। মাঝে তিন কিলোমিটার কিছুতেই বাগ মানাতে পারেনি। সেটুকুই হাঁটা। কষ্ট হয় না। আর কেদারনাথ না গিয়ে যাত্রা সম্পূর্ণ হয় কখনো? কেদারের পথ যমুনোত্রীর চেয়ে ভাল। বেরিয়ে পড়ুন তো ভগবানের নাম করে, কিছু হবে না। ঠিকই পেরে যাবেন।" বলেই তিনি পালালেন।

সন্ধ্যাবেলায় তারপর গঙ্গার একটি বাঁধের ওপরে বসে বসে চা ডালমুট বিস্কুট খাচ্ছিলুম। সুরথ সিং একটা সময়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গেলাসে করে জল এনে হাতে দিল।—"গঙ্গামায়ী।" স্বচ্ছ তুহিনশীতল। চোখে মুখে মাথায় দিলাম। বাঁধের নীচে বড় বড় পাথরে ঘুরে ঘুরে যে উদ্দাম, উত্তাল জলস্রোত ছুটছে, তার রং কিন্তু গেরুয়া। সূর্যের অস্তগমনটি দেখা হল না, পাহাড়ের পিছনে ঘটে গেল। জলের রংয়ে তার ছায়া ধরা পড়ল এইমাত্র—যেন তাম্রপত্রের মত আকাশ আর গঙ্গা।

৩৭

মরণ বলে আমি তোমার জীবনতরী বাই

রাত্রে দেখি ট্যুরিস্ট লজে একদল বঙ্গসন্তান। যমুনোত্রীতে এদের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। কবে এলেন? কোথায় যাচ্ছেন? ইত্যাদির পরেই তাঁরা বললেন, "জানেন তো সেদিন কী কাণ্ডটা হলো! আপনারা তো অনেক আগেই চলে এলেন। বৃষ্টিতে পথের সে যে কী অবস্থা!"

মহোৎসাহে এক মহিলা বললেন, "অ্যাক্সিডেণ্ট। বিরা-ট অ্যাক্সিডেণ্ট। সেই তো বৃষ্টি শুরু হল, আমাদের ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। বেশ অন্ধকার। কী কষ্টেই যে ফিরেছি! তারই মধ্যে একজন পাঞ্জাবী মহিলা ঘোড়াসুদ্ধ, সহিসসুদ্ধ, খাদের মধ্যে পড়েই গেছেন। আমি তাঁকে দেখিনি, তবে দুটি ছোট ছোট ছেলে বুড়িকে খুঁজছিলো দেখলাম। তাদের নাকি ঠাকুমা। তাইতে জানলুম। কী কেলেঙ্কারি ভাবুন! পরপর দুদিন। আগের দিনই একটা বাচ্চা মেয়ে গেছে। এদিন গেল ফের এই মহিলা। তা, বয়েস হয়েছিল যথেষ্ট, শুনলাম। ভালই গেছে, উত্তরাখণ্ডে মরলে নিশ্চিত স্বর্গবাস। সঙ্গে নাকি ছেলেও আছে।"

পাছে পিকোলো শুনতে পায়, আমি খবরটা চেপে গেলুম।

"এমন জানলে কক্ষনো আসতুম না, আসতুম না! মরবো। আমি এ যাত্রায় নিশ্চয় মরবো। আমার ছেলে? আমার থলে?"

এখন তো আমরা পর্বতশিখরে নেই। তবে বুকের মধ্যে এত অসম্ভব চাপ

লাগছে কেন ? এই কি উচিত, হে বিরাট উদার হিমালয় ? একটি কচি প্রাণ, একটি দরিদ্র প্রাণ, একটি ভীরু প্রাণ কেড়ে নিয়ে তোমার কী উপকারটা হল ? থাক। তীর্থে তীর্থে বৃথা ভ্রমণে আর যাবো না। মন তো কেবলই ধাক্কা খাচ্ছে। লোভী যমুনা, তোমাকে মা বলে ডাকবো না।

৩৮

ম্যাগনেটিক ফীল্ড

তবুও খেতে গেলুম ক্যান্টিনে। পিকোকে না নিয়েই। ও শুনেছে কিনা বুঝছি না, শুয়ে পড়েছে। বলছে মাথা ধরে আছে। রুটি, ভিণ্ডিকা সব্জী, ডাল-ফ্রাইয়ের চিরাচরিত খানা অর্ডার দিয়ে বসে আছি। ওদিকের টেবিলে দুটি মার্কিনী যুবতী তর্ক করছে। পরনে সালোয়ার কামিজ। কিন্তু হিপি বলে মনে হয় না। খাওয়া শেষে ওদের কাছে গিয়ে বসলুম। অস্টিন আর হান্না ওদের নাম। আমেরিকার মধ্য পশ্চিম থেকে এসেছে। অস্টিন কাজ করত প্যানঅ্যামে। সে কুমারী, প্যানঅ্যামে ছাঁটাই হয়েছে। হয় ১৮ মাস দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানোর দুটি টিকিট নয়তো কিছু টাকা ওদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছিল, ও নিয়েছে দুটি টিকিট।

দুই বোনে বেরিয়েছে। হান্না আর্টিস্ট। বিয়ে করেছে ৬/৭ বছর। স্বামী জাপানী ছাত্র। সে শুধুই নামেমাত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছে। পড়াশুনো আর শেষই করে না। চাকরি-বাকরিও করে না। কিছুই করে না। হান্না এবারে ডিভোর্স চেয়েছে। তাতেও সে রাজী নয়। তাহলে আমেরিকার ভিসা নিয়ে গণ্ডগোল হবে। খাবেই বা কী উপায়ে ? ওর কোনোই উপার্জন নেই। তাই হান্না ছুটিতে বেরিয়েছে। ঘোর ঈশ্বরবিশ্বাসী। হান্না হিন্দু। নানান বিভূতিতেও সে বিশ্বাস করে। মার্কিন দেশেই হিন্দু গুরুজী পেয়ে সে হিন্দু হয়েছে। কিন্তু তার জাপানি স্বামী হিন্দু হয়নি। সে বৌদ্ধও নয়। সে ক্যাথলিক। ক্যাথলিকরা ডিভোর্স দেয় না। জাপানি ক্যাথলিক তো আরও খারাপ !

অস্টিন ঘোরতর মার্কিনী যুবতী। হিন্দু কৃশ্চান সে কিছুই নয়। ধর্মকে সে 'সঙ্গম' করে। কিন্তু অস্টিন ডিভোর্স-টিভোর্স পছন্দ করে না। "আমি চাই সংসার, সন্তান, স্টেবিলিটি। এমন একজন পাত্র চাই, যে বেশী ব্রিলিয়ান্ট নয়, নেহাৎ সাধারণ। সৎ। বুদ্ধিমান। তার জীবনে আমিই হবো সবার আগে। প্রধান মানুষ। নাম্বার ওয়ান ইন হিজ লাইফ। ডোণ্ট ইউ ওয়ান্ট টু বি নাম্বার ওয়ান ইন্ সামওয়ান্স্ লাইফ ?"

অন্তরের কানে ঘণ্টাধ্বনির মতন আজও লেগে আছে অস্টিনের হঠাৎ ঝরিয়ে দেওয়া কঠিন সত্যের আর্তিটুকু। কে চায় না? কে না চায় জগতে আর একজন মানুষের জীবনে সবার আগে আসতে? প্রথম নামটি হয়ে ওঠার মহা সৌভাগ্য অর্জন করতে? সন্তানের মা হলে অবশ্য কিছু দিনের জন্য এ সৌভাগ্য ঘটিয়ে দেন প্রকৃতি। কিন্তু ঐ। কিছুদিনের জন্যে। তারপর সন্তানের জীবনে প্রথম নামটি অন্য কিছুর। অন্য কারুর।

"আমি বাপু স্বামী ত্যাগ করতে পারতাম না হান্নার মতো। ছেলেটা দোষ তো করেনি কিছু। কেবল বোরিং হয়ে গেছে। তার বেলায় হিন্দুয়ানা কোথায় গেল? হিন্দুরা কি স্বামীকে ত্যাগ করতে বলে?" অস্টিন তেরছা চোখে দিদিকে শাসায়। আর্টিস্ট দিদিটি পরমা সুন্দরী। দীর্ঘ পেলব, লতানে শরীরে উদাস দুটি বড় বড় নীল ফুলের মতো চোখ সপল্লবে ফুটে রয়েছে। "আমি স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করতে চাই, এদিকে বরই খুঁজে পাই না। হান্না সন্ন্যাস নিতে চায়। সংসার ওর দু'চক্ষের বিষ। অথচ ওরই ঘরে স্বামী আছে। ভাখো তো মজাটা!"

"তা তুমিই হান্নার স্বামীকে বিয়ে করে ফেললে পারো?"

"এটা অবশ্য স্ট্রাইক করেনি আগে। আমার আবার ওসব জাপানী-টাপানীর প্রতি প্রণয় নেই কিনা। আমি অল্-অ্যামেরিকান মেয়ে, অল্-অ্যামেরিকান ছেলের কথাই ভাবি। এবার এটা ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য হান্নার বরকেও আমি ঠিকই চাকরি করিয়ে ছাড়তুম, যদি সে ব্যাটা আমার বর হত!"

"আনন্দময়ী মাকে চেনো?" হান্না হঠাৎ বলল।

"আলাপ হয়েছিল। কেন বলো তো?"

"ওঁর ম্যাগনেটিক ফীলড সৃষ্টির ক্ষমতার কথা জানো?"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"ওঁর সমাধিস্থলে ম্যাগনেটিক ফীল্ড তৈরি হয়েছে। আমরা কিছুতেই সরে আসতে পারছিলুম না, পা দুটো যেন কেউ জোর করে আটকে রেখেছিল মাটিতে। আমি আবার যেতে চাই কন্‌খলে। ওখানে থাকতে চাই। মা আনন্দময়ীকে তুমি দেখেছো? তুমি কী ভাগ্যবতী!"

ওদের ডাঃ ত্রিগুণা সেনের ঠিকানা দিয়ে বললুম কন্‌খলে কোন দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারে।

৩৯

জাঠ, গুর্জর, গাঢ়োয়ালী

উত্তরকাশী থেকে যাত্রা সোজা হিমালয়ের শিখর অভিমুখে। লংকাচটির পথ কিন্তু হনুমানচটির মতো নয়। নওগাঁ—বরকোট হয়ে রাস্তাটি যমুনোত্রীর পর্বতের পায়ের কাছে পৌঁছে দেয় আমাদের, ভাটওয়াড়ী গাঙ্গনানী হয়ে লংকাচটিতে পৌঁছে দেওয়া পথটি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। এ পথে গ্রাম, বন, ঝর্ণা, নদী সবই ঢের বেশী বেশী। এবং স্নো-ভিউও। পথের একপাশে প্রবল কলোচ্ছ্বাসে গভীর খাদ কেটে ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছেন। পিকোলো বললে, "মা, ফেনিল ধবধবে জল ছুটে যাচ্ছে, মনে হয় যেন হিমালয়ের শাদা ভেড়ার পাল যাচ্ছে—তাই না?" সত্যি যখন জাঠেরা তিন-চারশো ধবধবে ভেড়া নিয়ে মোটর রাস্তা দিয়ে যায়, সঙ্গে নেকড়েবাঘের মতো কুকুর, তখন পথটাকে এমনি উন্মত্ত কল্লোলিত তটিনীর মতোই দেখায় বটে। (অবশ্য নদীর নাম এখন ভাগীরথী) দেবপ্রয়াগে পৌঁছে অলকানন্দার সঙ্গে মিলন হবার পরে তার নাম হবে গঙ্গা। গঙ্গার নাম কী একটা? যা আদুরে মেয়ে আমাদের!

পাহাড়ের গায়ে গায়ে লুকোনো আর খোলামেলা হাজারটা গাঢ়োয়ালী গ্রাম। প্রায় পাহাড়ে সিঁড়ির মতো জমি কেটে কেটে নানারকম শস্য চাষ হচ্ছে—'টেরাস্‌ড' শস্য ক্ষেত্র, কোথাও কোথাও ঝুম চাষও হয়—পাহাড়ের খাড়াই গা বেয়ে আশ্চর্য চুম্বকী উপায়ে ছাগল ভেড়া এমনকি মহিষও চরছে। আর পথে হাঁটছেন কারা? সাধুরা।

ভাগীরথী স্রোতকে বেঁধে ফেলে তৈরী হয়েছে মানেরী বাঁধ। এখনও কাজ চলছে। তার ফলেই হয়তো দেখতে পেয়েছি ভাগীরথীতে চওড়া বিস্তীর্ণ চড়ার পর চড়া ভেসে উঠেছে। মানেরী হাইড্রো প্রজেক্ট পার হয়ে রাস্তা চলল। প্রজেক্টের ভিড়ভাট্টা ভরা কলোনী পেরিয়েই দেখি এক বিরাট মহিষের মৃতদেহ পথের আধখানা জুড়ে। সেখানে শকুনিদের মেলা। দুর্গন্ধের রেশ চলন্ত গাড়িতেও ঢুকে এল।

এত কাছে এতগুলি মানুষের বাস। তারা এই দূষিত পরিবেশে কাজ করছে। সারাদিন বাস যাচ্ছে, ট্রাক যাচ্ছে মিলিটারির (গঙ্গোত্রী বর্ডার ফোর্সের দ্বারা প্রোটেকটেড এরিয়া)—মৃত পশুটার একটা গতিও হচ্ছে না? জাতীয় চরিত্র এখানে সুস্পষ্ট। এত শীতেও যখন পচ ধরছে, বেশ কদিনের ব্যাপার নিশ্চয়। তখন বুঝিনি যে দুদিন পরে গঙ্গোত্রী থেকে ফেরবার সময়েও আবার সেই মৃত

মহিষ, সেই তৃপ্ত শকুনিরা আমাদের স্বাগত জানাবে উত্তরকাশীতে। আরো তীব্র উৎকট পচনের গন্ধে। অথচ বিজ্ঞানই এখানে দেবতা, এই মানেরীতে। এ তো যমুনোত্রী তীর্থের পর্বতশিখরে তুষার নদী নয়। এই আমাদের জাতীয় চরিত্র। পাবলিক হেলথ বিষয়ে পরিপূর্ণ অচেতনতা, এবং সর্ববিষয়ে দীর্ঘসূত্রতা। এখানে, কে জানে, হয়তো জাতপাতের ব্যাপারও আছে। মৃত পশু সরানোর যোগ্য জাতের কেউই হয়তো এদিকে বাস করে না। অতএব থাকুক পড়ে।

মানেরী পার হয়ে ভাটওয়াড়ী, তারপরে গাঙ্গনানী। আশ্চর্য দুধ-সমুদ্রের মতো কল্লোলিত পাহাড়ী ভেড়ায় আর ছাগলে মাঝে মাঝেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখতে! এত দেশ দেখেছি—অনেক রকমের গরু ভেড়া দেখা আছে, আমেরিকার তো তার ক্যাট্‌ল সম্পদের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু এমন হিমালয়ের ছাগলের মতো সুন্দর ছাগল আমি কখনো দেখিনি। ধবধবে সিল্কের মতো দীর্ঘ লোমে ঢাকা শরীর, গোলাপী খরগোশের মতো চোখ। দেখে লজ্জা হয়েছিল—এই জিনিস আমি কেটেকুটে রেঁধেবেড়ে খাই, আমার মনে হল, আর মাংস খাব না। যাঃ! এত সুন্দর জীবকে মেরে ফেলি! কিন্তু এ সদিচ্ছা রাখতে পারিনি। রসনা হৃদয়ের চেয়ে প্রবল। এখানকার ভেড়াও বড় রূপবান, লাবণ্যময় প্রাণী। স্কটল্যাণ্ডের সবুজ পাহাড়ে চরে বেড়ানো ভেড়াদের স্বাস্থ্য ঈর্ষণীয়, কিন্তু এত রূপ তাদেরও নেই। প্রায়ই গাড়ি থেমে থাকছে। দু-তিনটি রাখাল ছেলে দু-তিনশো ছাগল ভেড়া নিয়ে চরাতে যাচ্ছে। ধবধবে শাদা ছাগলগুলোর দীর্ঘ লোমে ভরা শরীর।—"জাঠ। সব জাঠ। কেউ গাড়োয়ালী নয়—" বলে সুরথ সিং। "জাঠেরা জানোয়ার পোষে, আর কসাইদের কাছে বেচে দেয়। এই সব নিয়ে যাচ্ছে মিলিটারি ক্যাম্পে বেচবে।" গাঢ়োয়ালবাসীরা জাঠদের খুব ভাল চোখে দেখে বলে মনে হয় না। "গাড়োয়ালীরা কী করে?"—"চাষবাস করে। ভেড়াও অবশ্য পোষে। পশম বানায়। ছাগলও যে পোষে না তা নয়, তবে কেবল দুধ খাবার জন্য। কসাইদের কাছে বেচবার জন্য নয়।"

এক সময়ে কিছু অদ্ভুত পুরোনো নেপালী পাজামার মতো প্রচুর কুঁচি দেওয়া সালোয়ার, শার্ট উড়নি পরা কিছু সুন্দরী গেল ঘোড়ায় চেপে। বেশ কিছু মাল-পত্তর সমেত।

—ওরা কারা? জাঠ?

—না না, জাঠ কেন হবে, ওরা তো গুর্জর।

—মানে?

—জাঠেরা যেমন পাহাড়ী নয়, তাদের নাক চোখ আলাদা। গুর্জররাও

পাহাড়ী নয়। তারা সেই বহু দূর দেশের মানুষ। কাশ্মীরের ওপাশের উপত্যকার জংলী লোক। মুসলমান। মহিষ চরায়। দুধ বেচে। গুর্জররা মোটে গ্রামের ভেতরেই থাকে না, ওরা জাঠদের মতো নয়। ওরা বনের মধ্যে বাস করে। তাঁবুতে। "জানবর লোগোঁকো সাথ সাথ রহতা।" শীতে নিচের দিকে নামতে শুরু করে। জানোয়ারদের নিয়ে হৃষীকেশের সরকারি সংরক্ষিত অরণ্যে চলে যায়। অন্যান্য বনবাদাড়ে জীবজন্তুরা নির্ভয় হতে পারে না।

৪০

ইন্দর সিং

ভাটওয়াড়ীর পর গাঙ্গনানীর কিছু আগে অবশেষে একটা ছোট চায়ের দোকান দেখা গেল। গাড়ি থামিয়ে নামলুম। সকাল বেলাই বেরিয়ে পড়েছি, চা পর্যন্ত না খেয়ে। ছোট্ট কাঠের ঘরে কাঠের উনুন জ্বলছে। একজন বৃদ্ধ গাঢ়োয়ালী চা তৈরী করছে। আমি আর সুরথ সিং ঘরের মধ্যে বসলুম। ছোটরা বাইরের পাথরের ওপরে বসে ভাগীরথীর শোভা নিরীক্ষণ করছে।

ঘরটা ছোট্ট। একদিকে কাঠকুটো জমা করা। অন্যদিকে পাটাতনে বসে আছে ইন্দর সিং। তাকের ওপর ডিম, বিস্কুট, ছোট্ট ছোট্ট পাউরুটি, চা চিনি। দুটো বেঞ্চি পাতা। একটাতে আমি, অন্যটায় সুরথ সিং। সুখদুঃখের কথা হচ্ছে দুই পাহাড়ী বৃদ্ধে।

ইন্দর সিংদের গ্রামের জাঠ-গাঢ়োয়ালী জল-চল একটু-আধটু থাকলেও, বিয়েথা একেবারেই হয় না। গুর্জরদের সঙ্গে জল-চলও নেই। গুর্জররা তো কোনো গ্রামেরই বাসিন্দা নয়। গ্রীষ্মে থাকে গঙ্গোত্রীরও পিছনের গহন বনে। শীতে নেমে যায় সেই হৃষীকেশের জঙ্গলে। জংলী আদমি সব। ওদের সঙ্গে জল-চল থাকবে কি করে? ওরা না জানে রাঁধতে, ঝুপ্‌ড়ি মতন বানিয়ে, কি তাঁবু খাটিয়ে মাথা গুঁজে থাকে। না জানে চাষবাস করতে, না রাঁধতে-বাড়তে। পোড়া রুটি, পোড়া মাংস খায়। মেয়েরা পর্যন্ত যখন-তখন যেখানে-সেখানে আগুন জেলে রাঁধতে বসে যায়। রান্নাঘরের আব্রুও নেই। ওরা যা তা।

পাহাড়ীরা নিজেদের জাত নিয়ে খুবই গর্বিত দেখলাম, বিষ্ণুই হোক বা ছেত্রীই হোক, ওরাই পাহাড়ী যোদ্ধার জাত, রাজপুতের জাত। আর জাঠরা? জানবর পালনেবালা জাত হ্যায়। আর গুর্জর তো জংলী লোগ। ঝকঝকে স্টীলের গ্লাসে ভর্তি চমৎকার দুধ-চা এল। রুমালে জড়িয়ে গেলাস ধরতে হল।

ছোট্টখাট্টো ফোকলা দাঁত, ছানি পড়া চোখ, কুলুর টুপি মাথায় ইন্দর সিং

বারবার বললো, "আমার এখানে তো যাত্রীরা কেউ থামে না। কোঈ নেহী; কোঈ নেহী রুখতা। সবাই সামনে দিয়ে চলে যায়। বাস যায়, ট্রাক যায়, মোটর যায়। কেউ কোনোদিন থামেনি। আজ পর্যন্ত নয়। তোমরাই প্রথম। যাত্রীরা সবাই ভাটওয়াড়ী বা গাঙ্গনানীতে চা খায়। এত গাড়ি যায় আমি কেবলই ভাবি, কে থামবে? কেউ কি থামবে না? আমার কত ভাগ্য যে আজ তোমরা থামলে। সারা জীবনই এটার কথা কল্পনা করেছি।" চায়ের দাম নিল পঞ্চাশ। দশ পয়সা কম। কারা এই দোকানে আসে? কেবল পাহাড়ী রাখালরাই! আমি ইন্দরকে কথা দিলুম, ফেরার পথেও থামব, চা খেয়ে যাবো। ইন্দর সিংয়ের দোকানে। তার নাতিরা এখন ভেড়া চরাচ্ছে ঐ ৩/৪টে যা আছে। আর ছেলেরা ক্ষেতে চাষবাস করছে। বুড্ঢা হয়েছে ঠাকুর্দাদা, তাই এখানে চায়ের দোকান খুলে চুপচাপ বসে আছে। যথালাভ! "গঙ্গোত্রী গিয়েছ? ইন্দর সিং?"

"নাঃ। ক্যায়সে যানা? গরীব আদমী।"

৪১

ঝর্ণা! ঝর্ণা!

গাঙ্গনানীর পর থেকে পথটা সত্যি খুব অদ্ভুত। কাঁচা রাস্তা তো বটেই, নুড়ি পাথর ধুলো কাদা আর ঝর্ণার পরে ঝর্ণা। এত ঝর্ণা আমি জীবনে আর একবারই দেখেছি, একটা বন্যায় আটকে যাওয়া ট্রেন থেকে। ফেদার রিভার ক্যানিয়নে যখন প্রচণ্ড বর্ষণে বিশালকায় রেড-উড-ট্রীদের শিকড়সুদ্ধ উপ্‌ড়ে রাস্তার ওপরে টেনে আনছিল এই সব নবজাত জলপ্রপাতের মরণস্রোত। কিন্তু এখানকার ঝর্ণার জাত আলাদা। এরাই এইসব পাহাড়ী গ্রামের প্রাণধারা। গাড়িকে প্রায়ই নিয়ে যেতে হচ্ছে ঝর্ণার ওপর দিয়ে, খুব সাবধানে, যাতে পিছলে পড়ে না যাই। প্রত্যেকটা বাঁক ঘুরতে হচ্ছে ভীষণ যত্নের সঙ্গে, প্রত্যেকটাই ব্লাইণ্ড করনার। এবং প্রায়ই ইউ-বেন্‌ড, হেয়ার পিন বেনড। উল্টোদিক থেকে মত্ত বরাহের মতো প্রায়ই চলে আসছে "যাত্রা" চিহ্নিত বাস। ট্যাক্সি চোখে পড়ল দুটি-একটি। প্রাইভেট একটিও না। একটি জায়গায় বাঁ পাশে চওড়া, চমৎকার ভাগীরথী নদী —সেই উন্মত্ত পার্বত্য মূর্তি নেই—মাঝে চড়া, গ্রামের মেয়েরা তামা-পেতলের কলসীতে জল ভরছে।

আমরা প্রত্যেক ঝর্ণায় থামছি আর ফ্লাস্কে খাবার জল ভরছি। ঝর্ণার জল ফ্রিজের মতো ঠাণ্ডা আর কি মিষ্টি! একটাও অস্বচ্ছ, অমিষ্ট ঝর্ণার জল দেখিনি।

থামবার প্রধান কারণ অবিশ্যি ফ্লাস্ক নয়। ইঞ্জিন। উত্তরকাশী ছাড়বার পরেই আমাদের গাড়ির একটা তেষ্টা রোগ হয়েছে। কেবলই তার জল শুকিয়ে যাচ্ছে, ইঞ্জিন গরম হয়ে যাচ্ছে। এ রাস্তা যে জীপগাড়ির। আয়েসী অ্যাম্বাসাডারের রাস্তা তো এ নয়? তার স্নায়ুতে চাপ পড়ছে এত চড়াই ভাঙতে। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ঝর্ণায় র‍্যাডিয়েটারে জল ঢালছি, আর দুটো বোতলে জল ভরে নিচ্ছি। পিকোর গা গুলোনো সেরে গিয়েছে। এই পথ যথেষ্ট ঠাণ্ডা, খোলা মেলা। বারবার থামতে হচ্ছে, নামতে হচ্ছে, ঝর্ণা-টর্ণার সঙ্গে মাখামাখি হচ্ছে, ভাববিনিময় হচ্ছে, এসব পিকোর খুব পছন্দ। মনের সুখে ছুটোছুটি, জল ঘাঁটাঘাঁটি করছে সুরথ সিং আর রঞ্জনের সঙ্গে। আমিও করছি না এমন বলতে পারি না।

পথটির সৌন্দর্য ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না। প্রাণ জুড়ানো। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে গেলে পথ এমনটিই হওয়ার কথা। তবে এই মুহূর্তে খুব বিপজ্জনক হয়ে রয়েছে। যে কোন ঝর্ণায়, যে কোনো বাঁকে, গাড়ি পিছলে যেতে পারে। উন্মত্ত বাসের সঙ্গে ধাক্কাও লাগতে পারে। বর্ডার ফোর্সের লোকেরা রাস্তা মেরামতির কাজ করছে।

৪২

কে তুমি?

পথের ধারে হঠাৎ দেখি বিরাট, সুগোল, একটি শাদা গ্লোবের মতো বস্তু। কি সুন্দর, কতো বড়ো শ্বেত পাথর! এখানে পাথরের নানারকম রং—কমলা, শাদা, ধূসর, কালো—দুদিকে কালো মধ্যে কমলা, শাদা কালো লাল কতরকমের স্যাণ্ডুইচের মতো প্রস্তরখণ্ড—পিকো আর রঞ্জন চেঁচাচ্ছে—"মেটামরফিক রক্ ফর্মেশন", "স্ট্র্যাটিফায়েড রক্", ভূগোলে পড়া পাতি-ভূতত্ত্ব। আমি দুয়েকবার "ফসিল! ফসিল!" বলে চেঁচিয়েও পাত্তা পেলুম না তবে এতবড় শ্বেতপাথরের চাঁই একটাও দেখিনি। রঞ্জনের চেঁচানি শুনে হাসিমুখে সুরথ সিং বলল, "উয়ো তো পথল্ নহি হ্যায়। বরফ্ খণ্ড্ হ্যায়। আইস। স্নো থা, জম্ কর্ আইস বন্ গয়া হোগা।" ও হরি, এই রোদের মধ্যে ঝকমক করে পথের ধারে গোলচে হয়ে বসে আছেন। আপনি তবে তুষার বাবু! এই প্রথম স্নো-র নৈকট্যে এসে দুই বাঙ্গাল, সুরথ সিংয়ের দুই "বাবা" ঔর "বেবি" মহা উত্তেজিত। কিন্তু হায়! গাড়ি থামলো না। "ঔর বহোৎ মিলেগা। বদ্রীমে বরফকা উপরসে চল্না হ্যায়। কেদারমে বরফ্সে পায়দল যানা। ইয়ে তো কুছ বি নেহি!"

৪৩

লংকাকাণ্ড

লংকাই পৌঁছে গেলুম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। এখানেই মোটরবাস্তা শেষ। ট্রেকিং শুরু। তিন কিলোমিটার পরে "ভৈরবঘাঁটি" শিখরে পৌঁছে ফের মোটর রাস্তা মিলবে। মিলিটারিদের তৈরী রাস্তা। গঙ্গোত্রীর ওপারেই মিলিটারি ঘাঁটি—ভারত তিব্বত বর্ডার। ভৈরবঘাঁটিতে জীপগাড়ি আর বাস থাকবে। এই মাত্র তিন কিলোমিটার রাস্তা মোটরেব্‌ল করা যায়নি। একটা ব্রীজ তৈরী হচ্ছে যমুনার মাথায়—সেটা শেষ হয়ে গেলেই আর সমস্যা থাকবে না। সোজা মিলিটারি ট্রাক চলে যাবে ভৈরবঘাঁটি পর্যন্ত। সেই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের বাসও।

যাত্রীদের জন্য লংকাতে 'হাট' আর 'টেণ্ট' আছে বলেছে ইউ পি ট্যুরিজমের গাইডবই। সেখানেই রাত্রে থাকবো ঠিক করেছি। এটা এক বিশাল বাস স্ট্যাণ্ড। বিশ-পঁচিশটা বাস দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন কোম্পানির, কিছু রেগুলার পাবলিক ট্রান্সপোর্টের, কিছু রিজার্ভ ট্যুরিস্ট কোম্পানির। প্রত্যেকটিরই শিয়রে লেবেল আঁটা "যাত্রা"—ইংরিজিতে হিন্দিতে। মাথার ওপরে বুকে পিঠে লেখা—"যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-কেদারনাথ-বদ্রীনাথ।"

সারাপথ এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ভেতরে আকুল কিছু পুণ্যার্থী মুখচ্ছবি। —অধিকাংশই দেহাতী। কিছু বঙ্গসন্তান।

রঞ্জন বললে, "আগে চল খেয়ে নিই।" পিকো থাকার ব্যবস্থাটা করে আসতে গেল। এসে বলল, "তাঁবুর ভেতরটা দেখা হয়নি। তবে বাথরুম নেই, ঐ ক্যানভাস —'মূত্রাগার' ইত্যাদি ছাড়া। আর কুটির বলতে টিনের বিস্কুটের বাক্সের মতন কয়েকটা ঘর। বাথরুম আছে। ঘোর অন্ধকার কিউবিক্‌লে, একটা গর্ত! অফিসার লাঞ্চ খেতে ব্যস্ত, কথা বলবেন না এখন।"—"চল্ তবে আমরাও খেয়ে নিই।" লংকা-চটিতে খাবারের দোকানের সমুদ্র—সেখানে একধারে খাদ্য অন্যধারে কাঠের পাটাতনে শতরঞ্চি পাতা। আর লেপ-তোষক ডাঁই করা। খেতে পেলেই বোধহয় যাত্রীরা শুতেও চায় এখানে। গরীব দেহাতী যাত্রীরা রাত্রে এখানেই আশ্রয় পায়, বোধ হয় দু'তিন টাকায় লেপ-তোষক ভাড়া করে।

বেঞ্চি পেতে খেতে বসলুম। দোকানী খুবই যত্নআত্তি করল। নিম্বু? হরা মির্চা? পাপড়? আচার? ঘিউ? পাঁচ টাকায় এক শো ঘি দিয়ে ডালফ্রাই করে দেব কি? শেষে দেখা গেল, নুন আর জল ছাড়া প্রত্যেকটা এক্সট্রাই এক

রুপাইয়া, আচার দো রুপাইয়া! রঞ্জন সর্বত্র জিলিপি খাচ্ছে। আমি আর পিকো খাচ্ছি না, কেউ টিকে নিইনি কলেরার। কেবল ওকে হিংসে করছি। আর, "খাসনি, খাসনি" বলছি।

রোদ ঝাঁ ঝাঁ। বাসস্ট্যাণ্ডের একধারে গাছতলায় ছায়া ছায়া খানিকটা জায়গা। তীর্থযাত্রী মানুষেরা সেখানে সংসার পেতেছেন। তিনপাথরের অনেক উনুন জ্বলছে, বিভিন্ন সংসারের হাঁড়ি চড়েছে, গরম ভাতের গন্ধ বেরুচ্ছে। যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করছেন। বিছানাও পাতা হয়েছে এখানে ওখানে। বাচ্চা ঘুম পাড়ানো হচ্ছে। রঙের মেলা বসেছে—উজ্জ্বল নীল, হলুদ, বেগুনী, খয়েরী। দেখে মনে হয় দলে দলে পিকনিক পার্টি, ওপাশে সেই ক্ষুদে ক্যানভাস ঘেরা দুটি শৌচাগার আর মূত্রালয়, মহিলা, পুরুষ। যথেষ্ট মোটেই নয়, মানুষের তুলনায়।

চার-পাঁচটা মানুষ লাঠিহাতে ফিরে এলো। দেখে মনে হল বাঙালী—জিজ্ঞেস করি, "খুব ক্লান্তিকর কি?"

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "নাঃ, খুব বেশি নয়। যাবার সময়ে তত কষ্ট নেই, তবে ফেরবার সময়ে একটু বেশি চড়াই মনে হয়। একদিনেই দু'বার যাতায়াত না করলে সেটুকুও হত না।"

"রাত্রে রইলেন না কেন?"

"এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, তা ছাড়া বাস ধরতে হবে তিনটের সময়। এখনই রান্না-বান্না আছে—"

"কী করে রাঁধবেন? উনুন বানিয়ে?"

"না না, স্টোভ কিনে ফেলেছি। প্রথম প্রথম বাইরেই খাচ্ছিলুম। বড্ড বেশি খরচ—দিনে পার পারসন দশটাকা, চারজনে চল্লিশ টাকা পড়ে যাচ্ছে। শেষে স্টোভ, হাঁড়ি, কেরোসিন, চাল ডাল আলু পেঁয়াজ নুন তেল কিনে ফেললুম। খিচুড়ি-ডিমভাজা দিব্যি চালাচ্ছি, দশটাকাতে হয়ে যাচ্ছে। এখনও কেদারবদ্রী বাকী, বুঝলেন না? খরচের দিকটা তো দেখতে হবে?" আমি মন দিয়ে শুনছি। পিকো প্রচণ্ড বোর্ড হচ্ছে। 'খরচের দিকটা' ওকে তো দেখতে হয় না, এ প্রসঙ্গ ওর অচেনা।

"মা, অফিসে বলেছিল আফ্টার লাঞ্চ খোঁজ নিতে।"

না, গঙ্গোত্রীতেই থাকবো ভাবছি, লংকাতে নয়। এখানটা সুবিধের হবে না, একদিনে দুবার যাতায়াত না করলেই তো ভালো। গঙ্গোত্রী নাকি যমুনোত্রীর

মতো নয়। চমৎকার মন্দির আছে বড় চত্বরওলা, গঙ্গার ঘাট আছে প্রাণ জুড়োনো, মুনিঋষিদের আশ্রম আছে। ধরমশালা, ট্যুরিস্টলজ, বাসস্থানের অভাব নেই। অফিসার বললেন "এখানে বুকিং নিষ্প্রয়োজন। ওখানে গিয়েই জায়গা পাবেন। তাছাড়া এখান থেকে খবর দেবার উপায়ও নেই। যাবার সময়ে লাঠি ভাড়া করতে ভুলবেন না যেন। অনেক চড়াই উৎরাই আছে।"

রঞ্জনের সঙ্গে সুরথ সিং লাঠি আনতে গেল। ওর মন ভালো নেই। গঙ্গোত্রীতে স্নান হবে না। লংকা অনেক দূর। এখানে গাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না বেচারী।

৪৪

রামশরণ

অফিস থেকে বেরিয়ে গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কম্বল মুড়ে একজন তীর্থযাত্রী শুয়ে। তার পাশে বসে এক মধ্যবয়সিনী দেহাতী নারী খুনখুন করে কাঁদছেন। অসুখ করেছে?

"কী হয়েছে, মাঈ?" মাঈ আর কোনো উত্তর দেন না। ওড়নায় মুখ ঢেকে খুব মৃদুস্বরে কাঁদেন। এই সময়ে একজন বৃদ্ধা আর একটি বালিকার উদয় হল। বৃদ্ধা বললেন, "উস্‌কা রামশরণ হো গয়া, বেটি।"

"ক্যা হুয়া!"

"রামশরণ। রামজীকা পাস্ চলা গয়া উয়ো।" শান্ত কণ্ঠস্বর।

মাথায় বাজ পড়লো আমার। মৃতদেহ? মৃতদেহ আগলে বসে আছেন এই মহিলা? এই দূর বিদেশে?

"কাঁহাসে আয়ে হেঁ?"

"গাঁওসে—রাজস্থানসে—"

"সাথমে ঔর কোঈ—?"

"হাঁ হ্যায়, সাথমে তিস্ আদ্‌মি হ্যায়, উস্‌কো দেশওয়ালে সব গঙ্গামাঈকে পাস নাহানে গয়া। ইস্‌কো ভাই হ্যায় না? ইস্ লিয়ে ইয়ে জা নহী সকা। ইস্‌কো গঙ্গোত্রী দরশন বি নাহি হুয়া। বিচারা। তক্‌দীর।"

"কল্ জাউঙ্গী," কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ মহিলা বলেন। একটু চম্‌কে যাই।

কী হয়েছিল? দাস্তবমি? জ্বর? হঠাৎ দেখি একটু দূরেই দাস্ত পড়ে আছে। মাছি ভন্‌ভন্।

মুহূর্তেই বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো ভয়। অমনি নিজের মেয়েটিকে কোলে

টেনে নিয়েছি আর বলেছি—"পিকো রে পালা! কলেরাও হতে পারে! আর এখানে এক মিনিট নয়। চল—থানায় খবর দিই গে।"

যেতে যেতে শুনি বালিকাটি কিছু জিজ্ঞেস করছে। কান্না থামিয়ে মৃত ব্যক্তির বোন তাকে বুঝিয়ে বলছেন পুঁটলির কোনখানে আটা পাওয়া যাবে, কোনখানে ঘিউ, কোথায় শক্কর—এই সব শুনে পিকোটা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। এই প্রকট মৃত্যু আগলে বসে মহিলা কী করে ঘি-আটা-চিনির কথা ভাবছেন? কিন্তু আমি অবাক হইনি। শুধু মৃত্যু আগলে থাকলেই তো হবে না? জীবনটাও তো আগলাতে হবে! ঐ বাচ্চাটা খাবে তো? এখন যে সবার 'খানা পকানেকো টাইম'!

সদাশিব পুলিস বললে, কুছ দিক্কত্ নেহী। যদি পোড়াতে চায়, লাকড়ি লা ডুংগা, যদি ঘরে নিয়ে যেতে চায় সার্টিফিকট ডুংগা। ইয়ে তো হামেশাই হোতা হ্যায়। হর্ রোজ কোঈ ন কোঈ মরতা ইধরমে আ কর্।

তবু যাত্রী আসবে, যদিও পথ দুর্গম, যদিও রোজই কেউ মরছে এখানে পৌঁছে। তথাপি আসা কেন? তীর্থভ্রমণ কিসের আশায়? আশা একটিই। চিরত্বের, স্থিরত্বের আশা। অহনি অহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি। এর পরে আর আশ্চর্য কী?

৪৫

জাহ্নবী-যমুনা

হাঁটা পথের রাস্তাটা অনন্যসুন্দর। যমুনোত্রীর পথের মতো নয়, অনেক চওড়া। গঙ্গা অনেক কাছাকাছি, যমুনার মতো অতো গভীর খাদ নয়, গঙ্গার সঙ্গে চেনাশুনো হয় সহজে। রূপসীও সে অন্য ধরনে। সারাটা পথ কতো ঝর্ণা ঝরছে, গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে এসে মিলছে। প্রথমে খানিকটা উৎরাই। তারপর সিঁড়ির মতো চড়াই। পথে অনেকখানি রাস্তা কাঠের রেলিং ঘেরা। বেশ মনের আনন্দে চলেছি। ভাগ্যিস খচ্চর নেই এখানে! প্রথম কিলোমিটার যখন ফুরালো, কী উল্লাস আমার মনে, পরিশ্রম অবশ্য হল পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার মতন। হাঁপানিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, খুব আস্তে আস্তে হাঁটছি। পথে দলকে দল মানুষ 'জয় গঙ্গামাঈ' বলে হাতে জলপাত্র নিয়ে ফিরছেন। মাথায় পুঁটুলি। কোলে শিশু, হাতে জলপাত্র। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই। যমুনোত্রীর মতো বন্য নয় গঙ্গোত্রী—যমুনোত্রীর বন্যতা যদি হয় সাবলাইম, গঙ্গোত্রীর সভ্যতা তাহলে বিউটিফুল।

এ পথে রাখাল বালিকা বাছুর নিয়ে হাঁটে। পথে ডাণ্ডীর উৎপাত নেই। খচ্চরও

নেই ভেবেছিলুম। কিন্তু কার্যত তা হল না। সারা পথটা খচ্চরের মোকাবিলা করতে করতে যেতে হল। এই খচ্চরগুলি হিমালয় পর্বতের উপযুক্তই বটে। মিলিটারি মিউল এরা, ভারত সরকারের সেবায় নিযুক্ত। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যে কোনো উচ্চবংশীয় অশ্বকে হার মানাতে পারে। "অশ্বতর" মানে "অশ্বের চেয়েও অশ্ব" যদি হত, তাহলে এরা সেই সংজ্ঞা পাবার যোগ্যতা রাখে। কী বিশালদেহ, তেজোদৃপ্ত, তেলচক্‌চকে চামড়া দলাই মলাই করা চেহারা। কে বলবে, এরাও খচ্চর। খচ্চর যারা গালি হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছিল তারা নিশ্চয় এদের দেখেনি। ভালো ঘোড়ার সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্য ঔজ্জ্বল্য এবং খচ্চরের পার্বত্য কুশলতার এক অসামান্য সমন্বয় এরা। একটি সিঁড়িপথে একশো কুড়িটি খচ্চর নামলেন। সব যাত্রীরাই যাত্রা স্থগিত রেখে, পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব খচ্চর মিছিলকে গার্ড অব অনার দিতে লাগলুম। তাঁদের প্রত্যেকের পিঠে কামান বাঁধা। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দু'তিনজন করে সেবক জোয়ান ছুটছেন। মুগ্ধনয়নে এই দৃশ্যের ছবি তুলব বলে আমি প্রস্তুত, হঠাৎ মেয়ে ছুটে এসে বললে, "লেন্সের ঢাকাটা বন্ধ।" লেন্সের ঢাকনি খুলে ফের ক্যামেরা তাক্ করেছি, এবার পিঠে টোকা পড়ল। ফিরে দেখি এক গুরুগম্ভীর মিলিটারি অফিসার। "মিলিটারির ছবি তুলতে হয় না, সিস্টার"।

"এমন কি তার খচ্চরেরও না?"

হেসে ফেলে অফিসার বলেন, "না, এমন কি খচ্চরেরও নয়। এটা মিলিটারি অপারেশন।"

"অ।"

বর্ডার থেকে যখন কোনো রেজিমেণ্ট বদ্‌লি হয়ে যায় তারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সমেত চলে যায়। পরবর্তী রেজিমেণ্ট তাদের নিজেদের কামান-টামান সঙ্গে করে আনবে। আমার এটা খুব আশ্চর্য মনে হল। এই পার্বত্য অঞ্চলে, কঠিন পথে এত কষ্ট করে বারংবার কামান ওঠানো নাবানো কি একান্তই আবশ্যক? এতে কেবল জন্তুগুলিরই কষ্ট হচ্ছে তা নয়, মানুষের কষ্টও কম নয়। সিঁড়ি ভাঙতে খচ্চররা ভয় পায়। সেই তাদের সিঁড়ি ভাঙানোর চেষ্টায় কি মানুষেরই কম কষ্ট হচ্ছে? ভীত, অনিচ্ছুক জীবগুলিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হচ্ছে পিঠে ভারী কামান বয়ে। শেষদিকে ৪/৫টি কামান এলো মানুষ-বাহিত হয়ে। চারজন করে জোয়ান স্ট্রেচার বহনের মতো কামান বহন করে ছুটছে। মুখে ছাদ-পেটাইয়ের কি রাস্তা-পেটাই কুলিদের মতো ছড়ার গান শুনেই বুঝেছি তাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে। ঘর্মাক্ত মুখগুলি নেহাৎ কচি। ভৈরবঘাঁটির সৈন্যশিবির থেকে আসছে এরা।

গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বলে একটি জায়গায় লেখা আছে। সেখানে দুই রঙের দুটি নদী প্রচণ্ড বেগে এসে মিশছে। একটি নীল অন্যটি গেরুয়া। দুটি রং স্পষ্ট আলাদা। এই নদীর পাথরগুলির গড়নও খুব অদ্ভুত। বিরাট গোলাকার। ইংরিজিতে যাকে "বোলডার" বলে তাই। যমুনা যথারীতি গভীর সোজাসুজি খাদ তৈরী করে বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে—ভাগীরথীর তীরটা আরেকটু ছড়ানো। সঙ্গমের কাছে নামা যায়, পাথরে গিয়ে বসা যায়। একটি পরিবার শিশুসমেত ওখানে বসে খাওয়াদাওয়া করছেন দেখা গেল। যমুনার দুধারে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার ফিটের খাড়া পাথুরে দেওয়াল উঠে গেছে, ঠিক যেন কোনো কেল্লার পরিখা।

৪৬

হৃদয়ে তোমার দয়া

ভৈরবঘাঁটি যত কাছে আসে, পিকো ততই দেহাতীদের দেখাদেখি পাকদণ্ডী বেয়ে উঠতে চায়। আমি যমুনোত্রীর গল্প শুনে এসেছি, আমি তো ওকে কিছুতেই পাকদণ্ডী বাইতে দেব না। অত্যন্ত বিরক্ত ও বিমর্ষ হয়েই পিকো শেষ পথটুকু অতিক্রম করল।

পৌঁছুতে পেরে আমার কী গর্ব! তিন কিলোমিটার যে পারে, তেরো কিলোমিটারও সে পারে। তবে টাইম লাগবে তিন যদি দেড় ঘণ্টা হয়, তেরো তবে সাত আট ঘণ্টা? নাঃ, থামতে হবে। বেশ, দশ ঘণ্টা? যমুনোত্রীটা হেঁটে উঠলেই ঠিক হোত। এত কষ্ট হোত না। দেখাটাও সুসম্পূর্ণ হয়নি। চোখের ভেতর মনটা ছিল না।

ভৈরবঘাঁটিতে পৌঁছে দেখি সেই বাঙালী দলটির একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। "মেসোমশাই, বেশ তো এত আগে একা একা উঠে এসেছেন, দলের বাকীরা কই?"

একথা শুনে তিনি খুব খুশি—"ভেবেছিলুম পারবোই না, তা কার্যত দেখছি আমি ফার্স্ট হয়েচি।"

আমরা চা খাবো। মেসোমশাইকেও খাওয়ালুম। একসঙ্গে বসে গল্প করছি, কেননা এখন কোনো বাস নেই। জীপ দশ-বারোজন লোক চায়। ষাট টাকা ভাড়া, ও বারোজন মানুষ না হলে ছাড়বে না। ঠিক আছে, বাকি বাঙালীরা চলে আসুন, তারপর ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। আরেকজন বৃদ্ধ এসে গেলেন ওঁদের দলের। অল্পবয়সীদের চিহ্ন নেই। চা খেতে খেতে গল্প হোলো। মেসোমশায়ের প্রবল বাত। এককালে বাতে পঙ্গু ছিলেন। এখন সত্যি সত্যিই পর্বত লঙ্ঘন

করছেন। বিনা কষ্টে। আর অন্যজনের (কাকাবাবু ?) একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হিপজয়েন্ট পুরো ভাঙা। একটি লৌহশলাকা ঢুকিয়ে অস্থি দুটি গাঁথা আছে। কলকাতায় বেশিদূর হাঁটা বা দোতলা বাসে চড়া তাঁর বারণ। তিনিই খচ্চরে চড়ে যমুনোত্রী করে এসেছেন। এখন পদব্রজে গঙ্গোত্রী।

"তিনি দয়া না করলে হয় না।"

"তাঁর দয়া থাকলে সবই হয়।"

হাসিমুখে পাকা দাড়ি নেড়ে চকচকে টাক নিয়ে কাকাবাবু আর মেসোমশাই ঈশ্বরকে সার্টিফিকেট দিলেন। মনে মনে বলি, "আমার যা হাঁপানি, তবু এই আমিও তো পেরে যাচ্ছি!"

একটু বাদেই তাঁদের দলবল এসে পড়ে। ভৈরবঘাঁটিতে ভৈরবমন্দির আছে। সেখানে গিয়ে ওঁরা ছবি তুলতে লাগলেন। ওঁদের সঙ্গে একটি তরুণ ব্রহ্মচারী আছেন। তিনিই পথপ্রদর্শক। অনেকবার এপথে এসেছেন। তাঁর তো সমগ্র উৎসাহ দেখলুম তাঁর দলের তরুণী ছাত্রীটির প্রতিই অনন্য-নিবদ্ধ। এটা খেয়াল করেছে রঞ্জন। (সেও হয়তো ছাত্রীটির প্রতি উৎসাহিত বোধ করতে গিয়েছিল!) তাঁরা বাসের খোঁজ নিচ্ছিলেন। আমি জীপের কথা তাঁদের বললুম। এবং ঠাঁই চাইলুম। মেসোমশাই পিকোকে "নাতনী" ডাকছেন এবং চা খেয়ে খুব খুশি। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল একসঙ্গে যাওয়ার।

"কেন জায়গা হবে না? যদি হও সুজন, তেঁতুলপাতায় ন'জন, সবাই মিলেই যাবো।"

কিন্তু ওঁর দলটি মেসোমশায়ের "সৌজন্যপূর্ণ" কথা শুনলো না। তাঁরা জানালেন জায়গা নেই—জীপ ভর্তি হয়ে গেছে। ওঁরাই যথেষ্ট সংখ্যক। "দুঃখিত ভাই" বলে মিষ্টি হেসে ওঁরা চলে গেলেন। বাস-স্টেশন তখনও ফাঁকা। মরীয়া হয়ে মেসোমশাই বলে ফেললেন, "এরা আমাদের আগে এসেছে, কতক্ষণ দাঁড়াবে? নাতনীকে অন্তত আমি কোলে নিয়ে যাই—"

পিকো রাজী হল না।

পিকো গেল না। তক্ষুনি উল্টোদিক থেকে বাস এসে দাঁড়াল। কুলকুল তার করে চতুর্দিক দিয়ে শতধারায় মানুষ ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। ঝরতে ঝরতে বাস খালি হতে না হতেই মানুষ আরেক দিক থেকে চড়ছে (দুটো দরজা আছে)। রঞ্জন এসে বলল, "তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো—জীপ আর নেই।"

দৌড়ে গিয়ে আমি আর পিকো উঠে পড়ি। ড্রাইভারের পাশের সরু সীটে অনেক মালপত্র নিয়ে এক মহিলা। তাকে ঠেলেঠুলে মাল সরিয়ে আমি বসে পড়ি। পিকোকে গিয়ারবাক্সোর ওপর তুলে বসাই। মিনিবাসে ওখানে তো সীট পর্যন্ত সেঁটে দেয় আজকাল! রঞ্জন ছাদে গিয়ে উঠলো। রঞ্জনের কাঁধেই প্রধানত আছে রাকস্যাকটি। কখনো বা পিকোর কাঁধেও থাকছে। সেটা নামিয়ে ভেতরে নিয়ে নিয়েছি।

খানিক পরে বাসের মধ্যে সার্ডিন মাছের টিন ঠাসার মতন সূচীভেদ্য অবস্থা হল। ঠিক এই সময়ে পেছনে একটা করুণ আর্তি কানে এল—"দিদি! ছাদ থেকে নামিয়ে দিয়েছে।"

রঞ্জন সারারাস্তা বাসের শেষ সীটের সামনে দাঁড়িয়েছিল, বাসের পশ্চাদ্বর্তী পথ দেখতে দেখতে এসেছে। আমরা একদম সামনের কাচ দিয়ে পরিষ্কার বিপুল তুষার মেঠলি ভগীরথ পর্যন্ত এবং তাঁর আশেপাশের সব শুভ্র চূড়াগুলি দেখতে দেখতে এসেছি। স্বচ্ছনীল আকাশের গায়ে ঝকঝকে রূপোলি শিখরমালা। সবুজ বনে ঢাকা উপত্যকা। আর সেই অবিরাম ঝর্ণা, ঝর্ণা। তফাৎ এই, ইচ্ছেমতন বাস থামে না—। ঝর্ণার জল স্পর্শ করা, পান করা যায় না আর বাস যেন উন্মত্ত হাতীর মতো দাপিয়ে ছুটছে। মোড় নিচ্ছে কী স্টাইলে—যেন সে বাসই নয়, মোটরবাইক!

আমার প্লেনে যেতে সবচেয়ে খারাপ লাগে। কিছুই দেখা হয় না। তার চেয়ে ট্রেন ভালো। কিন্তু ট্রেনও বাঁধা লাইনে যায়। তার চেয়ে বাস ভালো। বেশ গাছপালার ভেতর দিয়ে, বনজঙ্গল ভেদ করে, জীবজন্তুর চোখে আলো ফেলে, নদী-ঝর্ণার গা ঘেঁষে কিম্বা জল ছুঁয়েই বাস ছোটে। তার চেয়েও গাড়ি ভালো, কেননা তার কন্ট্রোল নিজেরই হাতে। ইচ্ছেমতন থামা যায়, যা খুশি ছোঁয়া যায়। একটা বইতে পড়েছিলুম যে গাড়ির চেয়েও মোটরবাইক ভালো। সেখানে পা বাড়ালেই মাটি, আর তোমার চারিপাশে আলো হাওয়া বৃষ্টির সর্বাঙ্গীন

স্পর্শ। কিন্তু যেটি সবার চেয়ে ভালো, সারা হিমালয় জুড়ে সাধুরা সেটাই করে দেখাচ্ছেন। পায়ে হাঁটা। গঙ্গোত্রীর এই তিন কিলোমিটারের জন্যে আমি সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। যমুনোত্রীতেও অবশ্য ফেরার পথে হেঁটে নেমেছিলুম জানকী চটি অবধি। সাত কিলোমিটার। ভালো লাগা বলতে যেটুকু সেই জন্যেই। কিন্তু ওই বৃষ্টি কাদা এবং তার পূর্ববর্তী অপ্রিয় অভিজ্ঞতায় সেই যাত্রার পরিপূর্ণ রসাস্বাদন ঘটেনি। আজ আকাশে ঝকঝকে অথচ অনুষ্ণ রোদ, গায়ে শীতের তাজা বাতাস, চারদিকে উজ্জ্বল হাসিমুখের শোভাযাত্রা, সেদিনকার মতো অত ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখের সারি নেই—আজ গঙ্গোত্রী অন্য স্বাদ দিয়েছে। হিমালয়ের বাস-যাত্রাটিও মন্দ হলো না। মাত্র সাড়ে তিন টাকা ভাড়া। তিনজনের সাড়ে দশ। জীপে না গিয়েই ভালো হলো। এদের সঙ্গে, এই জনতা যাত্রীদের সঙ্গে 'যাত্রা' হলো। এটা না হলে এ-যাত্রা সম্পূর্ণ হতো না।

৪৮

কাহারে হেরিলাম! আহা!

গঙ্গোত্রীতে নেমে আমরা দেখি, ভাল ট্যুরিস্ট লজটি নদীর ওপারে। ব্রিজ পার হয়ে। দণ্ডীস্বামীর আশ্রমের পাশে। ওখানে অ্যাটাচড বাথ আছে। যদি দু'তিন-দিন থাকতে হয় তবে ওটাই ভাল। কিন্তু একবেলার জন্যে যদি ওখানে উঠি তবে যাতায়াতেই প্রচুর সময় এবং শ্রম ব্যয়িত হবে। গঙ্গামন্দির অনেক দূরে। চললুম দ্বিতীয় ট্যুরিস্ট লজে। সেটি মন্দিরের পাশেই। প্রথমেই তো মন্দিরে ঢুকেছি। সত্যি মনজুড়োনো মন্দির। প্রাঙ্গণটি পরিচ্ছন্ন, চারদিকে ছোট ছোট অনেক মন্দির, তাদের সামনে বারান্দা আছে, বসার জায়গা আছে, যাত্রীরা পুঁটলি বোঁচকা নিয়ে বসে আছে মন্দিরপ্রাঙ্গণে। যমুনোত্রীতে এসব নেই। এ-মন্দিরে গঙ্গাদেবীর প্রতিমা।

বেরিয়ে এসেছি, ভাবছি ট্যুরিস্ট লজটি কোন্‌দিকে, অকস্মাৎ কানে এলো—"নবনীতা মাসী!"

স্বপ্ন? মায়া? না মতিভ্রম?

"নবনীতা মাসী! এই যে, ওপরে!"

ওপরে চোখ তুলে দেখি সামনেই কিছুটা ওপরে একটি হোটেল জাতীয় আস্তানা। তারই চত্বর থেকে ঝুঁকে পড়ে আমাকে ডাকছে খুব মিষ্টি একটা গলা।—"কে রে তুই? আমি দেখতে পাচ্ছি না।" তখন আঁধার নামতে শুরু করেছে আর মেয়েটা আলোর বিপরীতে।

"আমি তো ঘুচাই!"

"ঘুচাই? তুই এখানে?"

"তুমি এখানে? আমি তো মা'র সঙ্গে এসেছি। এই ট্যুরিস্ট লজে আছি।"

"ও, ঐটেই ট্যুরিস্ট লজ বুঝি? আমিও ওখানেই থাকবো। দাঁড়া, আসছি।"

সেখানে লাঠি হাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো কানঢাকা টুপি-মাথায়—কে? কবিতাদি! হ্যাঁ, পাঠক, হ্যাঁ। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কবি কবিতা সিংহ, সশরীরে। নবনীতার সামনে। সপুত্রকন্যা। দুজনেই একসঙ্গে গঙ্গোত্রীধামে গিয়ে হাজির? বললেই হোলো? এতক্ষণ তবু সব ঠিকঠাকই হচ্ছিলো, এবারে গল্প বানানো শুরু। এই ভাবছেন তো? ভুল করছেন, গল্প নয় সত্যি। ভুললে হবে না, এটা গোড়া থেকেই ম্যাজিকট্রিপ। গুপী গাইন! তাই এরকম হোলো। কবিতাদি, পুতুল, ঘুচাই, সমরেন্দ্র—মহাখুশি স্বগোত্রের মানুষ পেয়ে। আমিও খুব খুশি। পিকো-ঘুচাইতে মুহূর্তে শ্যামদেশী যমজ হয়ে গেল! সমরেন্দ্র আর পুতুলের সঙ্গে জুড়ে গেল রঞ্জন। এই ট্যুরিস্ট লজেই উঠেছেন আমাদের তেঁতুল-পাতার নি-সঙ্গীরা। মেসোমশাই আমাকে দেখে যতখানি খুশি—ততটাই লজ্জিত —"যাক—তোমরা এসে পড়েছো! ইয়ে, ছাখো, আমি তো বুড়োমানুষ, আমার কোনো হাত ছিল না—"

আমি জানি। বুড়োমানুষদের এক ফোঁটাও কোনো হাত-না থাকার দিনেই আমিও বুড়ো হবো।—"মেসোমশাই, আপনি কিছু ভাববেন না। আমাদের কোনোই অসুবিধে হয়নি।"

"ঠিক তো মা? যাক!"

নিচের বাজারটা ছোট্ট, সেখানে অল্পই দু'চারটি চা-জিলিপি-পকৌড়ার দোকান, চা খেতে গিয়ে আবার দেখা সশিষ্য দেওঘরের বাবাজীর সঙ্গে। ব্রহ্মচারীর সঙ্গেও তাঁর চেনাশুনো আছে দেখা গেল। সম্ভবত গুরুভাই। একটা গ্র্যাণ্ড রি-ইউনিয়ন চলতে লাগলো। চা এবং গঙ্গাজলের মধ্যে বসে।

সন্ধ্যায় গঙ্গামন্দিরে আরতি দর্শন করলুম প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। বড়ো ভালো লাগলো। অবাক হয়ে দেখলুম এবং কানে শুনলুম, এখানেও সেই বিরাট দক্ষিণ ভারতীয় ভেঁপু (এই কি তুর্য?) বাজছে, কর্ণাটকের মন্দিরে যা শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলুম।

বদ্রীনাথের মন্দিরে শুনেছি কেরালার নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পূজারী হন। এই এক

আশ্চর্য নিয়মে দক্ষিণ সমুদ্রকে গাঁথা হয়েছে উত্তরের তুহিন শিখরের সঙ্গে। এই গঙ্গোত্রীতেও তো দেখছি দক্ষিণী বাজনা বাজছে। কে বলে ভারতবর্ষ এক দেশ নয়?

৪৯

মহাদেবের জটা

অঙ্গনেই অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আড্ডা। ধুনিটুনি জ্বলছে, গাঁজাটাজা চলছে। দক্ষিণে সিঁড়ি নেমেছে ছোট্ট ভগীরথ মন্দিরে, সেইখানেই নাকি প্রথম গঙ্গাদেবী উৎসারিত হয়েছিলেন। এদের মতে ছ'হাজার বছর আগে। এখন গ্লেসিয়ার সরে গেছে বিশ কিলোমিটার দূরে। ভগীরথ পর্বতের গ্লেসিয়ার থেকে নেমেছে গঙ্গা। শুনেছি তুষার নদীরা হাজার বছরে মাত্র এক ইঞ্চি মতন সরেন। সেই হিসেবে সময়টা হাজার হাজার বছর আগে হবার কথা। এই সিঁড়ি থেমেছে গঙ্গা-তীরে। তারপর উপলকীর্ণ বালির পথ গেছে জলধারার কাছ পর্যন্ত। আরতির বাজনা থেমে যাবার পরে নৈঃশব্দ্যে অন্ধকার যেন ঘনতর হোলো। গঙ্গার কল-ধ্বনি মন্দ্রতর। পায়ে পায়ে এগোলুম জলের দিকে। প্রচণ্ড শীতল বাতাস দিচ্ছে —এগোনো সমীচীন মনে হোলো না। অসুস্থ হলে অন্যদের মহামুশকিলে ফেলবো। হেঁটে হেঁটে লংকাচটিতে ফেরা বাকি। গঙ্গাতীর থেকে ফিরে এসে ট্যুরিস্ট লজেই খেয়ে নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছি। পিছনের পর্বতের বিপুল ছায়ার দিকে তাকিয়েই হঠাৎ স্পষ্ট দেখলুম শিবের মাথায় চাঁদ। হিমালয়ের বিরাট অন্ধকার ছায়াশরীরের মাথায় এক অসম্পূর্ণ রূপোর তৈরি চাঁদ উঠছে। মুহূর্তেই পুরাণের চিত্রকল্পটির সত্যতা চোখের উপর প্রমাণিত হয়ে গেল। ছায়ার নীচেই গঙ্গার ঝিক্‌ঝিক্ কুলুকুলু।—"নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? মহাদেবের জটা হইতে।"

ওই তো মহাদেবের জটা। জটাজুটধারী চন্দ্রমৌলি দেবাদিদেব। এই স্থির, নিশ্ছিদ্র প্রাপ্তির অনুভূতি নিয়ে শুতে গেলুম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব।

শুতে গেলুম, কিন্তু ঘুম আসে না। ছোট্ট ঘর, তিনজন লোক, ঠিক উত্তর কাশীর সেই ট্যুরিস্ট লজের মতোই। কেবল আরো ছোট ঘর। লণ্ঠন দিয়ে গেছে। সেটা কমিয়ে কোণে রেখেছি। একটাই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা উঁচু পাথরের তৈরি দেয়াল। প্রচণ্ড শীত। সে জানলাও বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ছাদে আর দেওয়ালের মধ্যে যথেষ্ট বড় বড় ফাঁক আছে, দম আটকে

মরবো না। রঞ্জন হঠাৎ বেদম হাঁচতে এবং ঠকঠক কাঁপতে শুরু করলো। ক্রমশ দুটো কম্বল প্লাস দুটো পুলোভার। পায়ে মোজা, কানে মাথায় উলের মাফলার। তবুও ঠকঠক্। উঠে এবার বিলিতি ওভারকোট চাপালো। তবুও দাঁতে দাঁতে মিউজিক। এটা স্ট্রেট ব্র্যাণ্ডির কেস! ওপরে উল চড়িয়ে কিছু হবে না, ভেতরে অ্যালকোহল চড়িয়ে গরম করতে হবে। চটপট ব্র্যাণ্ডি গিলিয়ে ঝট্‌পট কম্বলের তলায় গোর দিলুম থরথর-কম্পিত রঞ্জনকে। তার পালা চুকলো। এবার পিকোলো। উঠলো। মাথায় কম্ফর্টার জড়ালো। শুলো। আবার উঠলো। গায়ে বড় কোটটি চড়ালো। শুলো। আবার যেই উঠেছে আমি বললুম, "দাঁড়া, এবারে গরম হওয়ার ওষুধটা খেয়ে ফ্যাল!" তারপরে আমিও যথাক্রমে কম্ফর্টার, কোট, গরম হয়ে ওঠার ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে রাত দেড়টা নাগাদ গঙ্গোত্রীদেবী দয়া করে তিনটি শীতকাতর হিমার্ত সকরুণ বঙ্গসন্তানকে নিদ্রাদেবীর উষ্ণ কোলে তুলে দিলেন।

৫০

ইয়েতি!

পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠেছি। পরিষ্কার বাথরুমে যাবার দুর্লভ পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাদ সাধছে পিকো স্টুপিড। পিকোলোর ধারণা, তার মহার্ঘ্য মা-জননীটিকে কোনো ইয়েতি কিম্বা রেপিস্ট থপ্ করে তুলে নিয়ে যাবে বলে ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে আছে নিশ্চয়। পিকো সঙ্গে যাবার জন্যে জেদ ধরলো। সে পালোয়ান গেলে অবশ্যই দুষ্কৃতকারী প্রাণীরা পালাতে পথ পাবে না! শেষ পর্যন্ত মায়েতে-মেয়েতে দোর খুলে গলিতে নামি। বাড়ির পিছনে বাথরুমের সারি। সেখানে ওটা কে? ইয়েতি নাকি! দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছে? ছেলে-টাকে চেনা-চেনাই লাগলো। এই লজের ক্যান্টিন চালায়।—"কী? চা হুয়া?"

"আবি ক্যায়সে হোগা? চুলা তৈয়ার করতা হ্যায়।" তারই জিম্মায় পিকোকে সমর্পণ করি। আহা! ফিনাইলের সুবাতাস মনেপ্রাণে নটভৈরব বাজিয়ে দিলো। এই প্রথম!

আমি বেরুতে পিকোলো গেল। সামনে ধ্যানস্থ শান্ত ভোরের হিমালয়। নীচে উত্তাল গৈরিক স্রোত। কাল রাত্রের সেই জ্যান্ত ছবিটা মনে ভেসে এলো। কুয়াশাচ্ছন্ন তারাহীন আকাশে বদ্ধ অন্ধকার যেন কঠিন, ঘন ওজনদার ধাতব পদার্থ হয়ে উঠেছে—সেই পটভূমিতে আরো অন্ধকার, আরো ভারী পাথরের মূর্তির মতো হিমালয়ের একটি অংশ। যেন জটাজুটধারী শিবের সিলুয়েট—মাথার ওপরে চাঁদ। পায়ের কাছে চিক্‌চিক্ করছে গঙ্গা। সকালে সেই আকাশই নীলচে, বেগুনী, স্বচ্ছ,

ফিন্‌ফিনে পাতলা, বাতাসে যেন থির্‌থির্‌ কাঁপছে, পাহাড়টি ফিটফাট সবুজ পরিচ্ছন্ন, দাড়ি কামানো তরুণের মতো, আর উত্তাল, পিঙ্গলা, কলস্বনা গঙ্গা নিজেই যেন শিবের জটার একটি গুচ্ছ।

পৃথিবীতে যে কোনো ব্যাপারেই প্রথম হতে পারলে যে বিমল আহ্লাদ হয়, সেটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করে ঘরে ফিরে দেখি রঞ্জন বসে চা খাচ্ছে। এক পাহাড়ী বালক তাকে চা দিচ্ছে। সে পিকোকে দেখেই বলল, "আপকো ঘড়িকা ভাও কিতনা!" পিকোলো আমার দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেললো। এই বিদেশী ইলেকট্রনিক ঘড়িটা আগে ওর বাবার ছিল। এর দাম আমি জানি না। এত সোয়েটার, কোটের হাতার নীচে ঘড়িটি আবিষ্কার করাও সহজ নয়। বাঃ। খোকার বেড়ে নজর আছে তো? অন্তদৃষ্টি আর কাকে বলে!

"ঘড়িটা আমরা বেচবো না।"

"না না, সেজন্যে নয়। একজন আমাকে এই রকমই একটা ঘড়ি বিক্রী করতে চায়। দামটা জেনে নিতে চাইছি। সে বলছে সাড়ে তিনশো। নেপাল সে লায়া। আম্রিকান, ইয়া জাপানীজ হোগা।"

"এই রকম চারটি বোতাম আছে? স্টীলের ঘড়ি তো? প্লাস্টিক বডি নয় তো? সাড়ে তিনশো খারাপ নয়। অ্যালার্ম আছে কি? আমার ঘড়িতে তিন রকমের অ্যালার্ম আছে, অ্যালার্ম এনোগ্রাফ আছে, স্টপওয়াচ আছে, ডেট আছে, ডে আছে।"

"অ্যাঁ, এত সব আছে? মিউজিকাল অ্যালার্মও আছে?"

"এবারে ঘড়িটা চুরি যাবেই।" রঞ্জন ফিসফিস করে জানালো, "পিকো যা গুণকীর্তন শুরু করেছে! ঘড়িটা সাবধানে রাখতে বলব।"

"মিউজিক নেই, অ্যালার্ম আছে।"

"আমারটা ভালো করে আগে দেখে আসতে হবে। আর চা চাই? আরতি দেখতে যাবেন না? শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে।"

"নিশ্চয়ই যাবো!" মন্দিরে ছুটলুম। চা চুলোয় যাক। ছুটলো রঞ্জনও। পিকোটা পাশ ফিরে ঘুমোতে লাগলো।

৫১

গঙ্গাতুলসী

বাজারে গিয়ে মিস্টার মুখার্জীর নামে পূজোর থালা কিনে এনে পূজো দিলুম গঙ্গামন্দিরে। বিশ্বাস করে দেওয়া পরের টাকা সঙ্গে এনেছি, বাবা, সর্বত্র সদ্ব্যবহার

করে যাই। বিশ্বনাথে, সঙ্কটমোচনেও পুজো দিতে ভুলিনি। গঙ্গাদেবীর নৈবেদ্যটিও সুন্দর। দিব্যি পিতলরঙা আয়না-বসানো ছোট্ট সিঁদুরকৌটোভর্তি সিঁদুর (প্লাস্টিকের দায়সারা টিপ নয়), দিব্যি একজোড়া নীল কাচের চুড়ি, চুলের সোনালি ট্যাসল, এলাচদানা, মটরভাজা, ধূপ আর গঙ্গাতুলসীপাতা। পুষ্পবিহীন পুজো। কোথাও ফুল নেই। পথে ফুল ফুটতেও দেখিনি। এদেশে নাকি তুলসী-গাছ হয় না, এটিই তার বদ্‌লি খাটে—কাজ-চালানো পবিত্র উদ্ভিদ। গঙ্গাতুলসীকে কিন্তু আমার খুব চেনা-চেনা লাগলো। তারপর গন্ধ শুঁকেই নিঃসন্দেহ। ও হরি! তুমি তো আমার মুসৌরী পাহাড়ের গায়ে আবিষ্কার করা সেই আগাছা, যাতে ফুল নেই, কিন্তু পাতাতেই মিষ্টি সুবাস। পিকোর গা-গুলোনো সারাতে তোমায় ব্যবহার করেছিলুম। এখানে এসে তুমিই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাতুলসী হয়েছো? তা ভালো। কবিতাদি কয়েকটি শিকড়সুদ্ধ চারা তুলে সঙ্গে এনেছিলেন, জানি না তারা কলকাতার মাটিতে বসে গেছে কিনা। আমি ডায়ারির পাতায় যেটিকে ভরে এনেছিলুম, সে তেমনই আছে।

মন্দিরে পুজো দেবার পর সবাই দেখছি ডালিসহ গঙ্গায় যাচ্ছে, সেখানেও পুজো দিচ্ছে, গঙ্গাতুলসীর পাতা জলে ভাসিয়ে আসছে। আমিও চললুম। রঞ্জন সুদ্ধু। নদীর ধারে ভোরবেলা ভয়াবহ ঠাণ্ডা। সুন্দর বালি-বিছানো সরু পায়ে-চলা পথটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে নদীতীরের বড় বড় পাথরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

বাইরে পাঁচিলের ধারেই মস্ত ধুনি জালিয়ে বেশ কয়েকজন মস্তান সাধু আড্ডা গেড়েছেন। কুম্ভমেলাতে এমনি একটা দলের মধ্যে আমি ঢুকে বসে পড়েছিলুম। পেতলের বাটিভর্তি দুধ-চা দিয়েছিলেন সাধু আমাকে, কিন্তু হাতে হাতে যে কল্কেটি ঘুরছিল তার টার্ন আসেনি আমার। রঞ্জন বললে মহোৎসাহে, "কল্কের টার্ন মেয়েদের দেয় না। আমাকে দেবে। দেখবে?"

"দেখে কাজ নেই ভাই। অমনিই বিশ্বাস করছি।"

নদীতীরে পাণ্ডারা যাত্রীদের পুজো করতে সাহায্য করছেন। যাগযজ্ঞ, তর্পণ, পিণ্ডদান, নানা রকমের ধর্মীয় কার্যকলাপ চলছে। আর চলেছে এই কাকভোরে ঐ হাড়-হিম-করা উদ্দাম বেপরোয়া স্রোতে ঘটি ডুবিয়ে ভয়ে ভয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে পুণ্যস্নান। জলে নেমে ডুব-টুব দেবার প্রশ্ন নেই এদিকটাতে। প্রচণ্ড ঘূর্ণি, দুর্বার স্রোত। ভাগীরথী অগভীর, পার্বত্য নদীজলে হাঁটুও ডোবে না। কিন্তু পাথরে পদস্খলন ঘটলেই সি-ধা মানেরী ড্যাম। উত্তরকাশী। সেই মরা মহিষের অবস্থা হবে। কিম্বা হয়তো মধ্যপথে যমুনা তুলে নেবে, চলে যাবো সেই লালকেল্লা,

তাজমহল, মথুরা, বৃন্দাবন। হয়তো আবার দেখা হবে জালন্ধরের ঠাকুমা আর তাঁর সহিসের সঙ্গে, সেই অদেখা পঞ্চদশীর সঙ্গে। স্থানমাহাত্ম্যে কতটা মনের উন্নতি হয় জানি না, তবে অধিকাংশ নারীরই দেখলুম বসন-ভূষণে আর রুচি নেই। এই ভূষণটির নাম লজ্জা। এদের হায়াহীনতায় আমার মতো বেহায়াও লজ্জা পাচ্ছে।

নাঃ, এখানে স্নান আমার পোষাবে না। একেই সোজা তুষার নদী থেকে বেরুনো বরফগলা পানি। যতই পবিত্র হোক, একবার বুকে সর্দি বসলেই ব্যাস। একলা তো আসিনি যে অসুখ করলে ভগবান দেখবেন। এখন ভগবান নিজে না এসে আমার মেয়েকে, ভাইকে ডেপুটি করে দেবেন। অতএব কমলাকান্তের উপদেশই ভালো, আপনারে আপনি ঢাখো, যেও না মন কারো ঘরে।—"চল্ রঞ্জন, আমরাও গঙ্গাতুলসী ভাসিয়ে আসি নদীর স্রোতে।" নমো গঙ্গা। নমো গঙ্গায়ৈ নমঃ।

তারপর আরেকটু এগোই। প্রথমে শুধু জলস্পর্শ করে বসা। তারপরে সাহস বাড়ে। তখন অঞ্জলিতে পুণ্যবারি গ্রহণ করে প্রথমে বাবাকে, তারপর শ্বশুর-মশাইকে জলাঞ্জলি দিই। তৃপ্ত হও, হে মৌদ্গল্য-বংশোদ্ভূত দেবশর্মণঃ, তৃপ্ত হও, ওহে ধন্বন্তরী গোত্রের সেনশর্মণঃ। তোমরা আমার অপটু হাতের এই নির্মল পবিত্র উদকে আরেকবার চিরতরে পরিতৃপ্ত হও। পিপাসামুক্ত হও। বাসনামুক্ত হয়ে এই বিচিত্র বিশ্ববীজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হও তোমরা। আর স্মরণ করি তোমাদের, যাদের জল দেবার কেউ নেই। হে অভাগা আত্মারা, তোমরা আমার ভালোবাসার অর্ঘ্য গ্রহণ করো। আমার প্রদত্ত উদকে তোমাদের তৃষ্ণামোচন হোক, আত্মার শান্তি হোক।

এইটুকু, দু'মিনিটের মাত্র কথাবার্তা। বাবা, শ্বশুর অথবা এইসব নাম-না-জানা স্বজনহীন পরিজনদের সঙ্গে কথা কইতে ক'মুহূর্তই বা লেগেছে? হাত অসাড় হয়ে গেছে বরফজলে। এরা নাইছে কী করে? কী করে আবার, যে ভাবে পঙ্গুতেও গিরি লঙ্ঘন করে, সেই উপায়ে।

৫২
দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে

উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে পড়তে সদ্য নেয়ে ওঠা এক সাধু জলসুদ্ধু জটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কাঁপতে কাঁপতে এসে গঙ্গামন্দিরের চওড়া পাঁচিলের ওপরে উঠে বসলেন। রোদ উঠলেই এখানটায় রোদ পড়বে। সাধু শুরু করলেন ভজন গান।

মাথার ঝাঁকুনিটা আর থামলো না, গানের ছন্দে গ্রথিত হয়ে গেল।

আধফোটা সকালে হিমালয়ের খোলা হাওয়ায় গঙ্গার কলধ্বনির সঙ্গে ভাঙা পাঁচিলে তরুণ সন্ন্যাসীর ভোরালী ভজনের সুর কানে রয়ে গেল।

সদ্যোস্নাত তিনটি দেহাতী মানুষ নদীর ধারে ষড়যন্ত্রীর মতো উবু হয়ে বসেছে। বয়স্কাটি একটি বড় কৌটো খুলে তিনটি ছোট কৌটো বের করলেন, একটিতে প্রচুর কাঠের চোকলা, পাতলা এবং কুচোকুচো, একটিতে ঘি, আর একটাতে মেটে সিঁদুর। এছাড়া ধূপ, দেশলাই, একজোড়া কাচের চুড়ি। আর গঙ্গাতুলসী।

তিনটি ছোট নুড়ি সাজিয়ে হোমের উনুন হলো, তাতেই ঐ ছুতোরের দোকান-ঝাঁট-দেয়া কাঠের চাঁচি ঢেলে তাতে ঘি দিয়ে আগুন ধরানো হলো। ছোট্ট প্রদীপ বেরুলো সলতে সমেত, জ্বালানো হলো। নদীর তীরে প্রবল বাতাসে দীপ জ্বলে রইল না। হোমাগ্নিও কেবল নিবে যায়। ধূপ জ্বললো, চিনির এলাচদানা বেরুলো আরেকটা খুদে কৌটো থেকে, তিনজনের মাথা একত্র করে ভক্তিভরে দেহাতী উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ হলো, ঘৃতাহুতি দেওয়া হলো। বারে, এরা তো বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ তীর্থ-পার্টি! ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ছাড়াই দিব্যি পুজোপাঠ মায় যাগযজ্ঞাদি পর্যন্ত করে ফেলছে। দেহাত থেকেই বয়ে এনেছে পিকনিক-পুজোর যাবতীয় দরকারী সরঞ্জাম মায় মন্তরটি পর্যন্ত। এই পুতুলখেলার মতো মিনি-হোমানল জেলে মিনি-পুজো দেখতে খুব ভালো লাগছিলো।

সবটা দেখা হলো না। আমার সঙ্গে সঙ্গেই কোট প্যাণ্টুলুন পরা এক ভদ্র-লোক হাতে পুজোর ডালি নিয়ে পাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসছিলেন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে করতে। এখানে এসে সেটা স্থগিত ছিল। আমি আর তাঁকে খেয়াল করিনি। হঠাৎ আবার প্রচণ্ড উৎসাহে সশব্দে মন্ত্রপাঠ শুনে দেখি সেই ভদ্রলোক—পরনে শুধুই আণ্ডারওয়্যার আর পৈতে। সযত্নে পাট-পাট করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে প্রচণ্ড চেঁচামেচি অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, স্নান সমাপ্ত। ক্ষুরধার বাতাসে আমিই প্রায় পোশাকের মোড়কসুদ্ধু নিহত হবার যোগাড়। ভক্ত ভদ্দরলোক মন্ত্রের ঢাল-তলোয়ারে নিজেকে রক্ষা করছেন। ঐ ভাবে পুজোও বোধ হয় করেছেন, কে জানে? নাঃ, এলেম আছে। একেই কৃচ্ছ্র বলে।

যেসব মহিলারা 'ট্রিপ' করছেন গঙ্গাতীরে (কিন্তু 'টীজ' করছেন না) তাঁদেরও আছে। ভক্তি এবং শক্তি। শিল্প-সাহিত্যে নারীদেহের গুণগান শুনে শুনে নিজেদের না-জানি কী একটা দারুণ ব্যাপার মনে হয়েছিল। এখানে একসঙ্গে এতগুলি এত বয়সের এত বৈচিত্র্যময় উন্মুক্ত নারীমাংস দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে

উঠলো। অনেকেই যৌবনবতী, বয়স যাই হোক। কিন্তু এই প্রথম মনে হোলো, লজ্জা না থাকলে বোধ হয় রূপ ব্যর্থ হয়। সবাই এরা ধবধবে ফর্সা, বাঙালী চোখে তো ফর্সা মানেই 'প্রকৃত সুন্দরী'। গঙ্গার ঘাটে আমি তর্পণ করতে যাই মহালয়ায়, অনেক বাঙালী বেদিং বিউটি দেখি, সেখানে এতটা অলজ্জা দেখিনি। উত্তর ভারতের চামড়ার জাতই অন্য। একটিও শ্যামলা শরীর দেখলুম না। জামার নিচে বেশ মজার একরকম ভি-গলা হাতকাটা রঙিন সুতী ফতুয়া পরে আছেন—যাত্রী-যাত্রিণী দুজনারই—পিরানের মতো তেরছা করে বুকে একটা খাপ। এবং দুটি পকেট। ফতুয়ার মধ্যেই, বুঝলুম, যাত্রার মালমশলা সর্বস্ব থাকে। বুকে ছুরি না বসালে সেসব পকেট কাটা যাবে না। যমুনোত্রীর বৃদ্ধা পাঞ্জাবী মহিলার পরনে এরকম ফতুয়া নিশ্চয়ই ছিল না। তাই "মেরে থৈলিয়া"!

রঞ্জন গেল কোথায়? সে তো গঙ্গারীরে নেই! খুঁজে পেতে দেখি রঞ্জন সেই ধুনি-জ্বালানো সাধুদের আড্ডায়, নেমন্তন্নবাড়িতে কাঙালিভোজনের আশায় যেমন দাঁড়ায়, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে একধারে। আগুনে গরম হচ্ছে, না গঞ্জিকায় কে জানে?—"চ ব্যাটা চ, বাড়ি যাই। চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

ঘুচাই আর পিকো ইতিমধ্যে উঠে নিজের মনে ঘুরছে। লাফাতে লাফাতে এসে বললে, "মৌনীবাবার আশ্রমে গিয়েছিলুম মা! ফোটো তুলেছি!" সবাই মিলে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম ব্রেকফাস্ট খেতে। ভগীরথ পর্বতের বরফচূড়োটি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তার তুষার নদী, সূর্য উঠে গেছেন। কবিতাদির গলার রুদ্রাক্ষের মালাটি সারদামায়ের সাক্ষাৎ আশীর্বাদ-ধন্য—সেই গল্প শুনতে শুনতে আলু-পরটা আর চা খেতে খেতে নেমে যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলুম। রঞ্জন ভয়ানক 'তং' করছিল—গোমুখ যাবেই। কাল রাত্রের ঠক্‌ঠক্ কাঁপুনি এর মধ্যেই ভুলে গেছে। এ তো গঙ্গোত্রী। গোমুখ আরো বিশ কিলোমিটার উত্তরে, তুষার নদীর মধ্যে। কে তোকে যেতে দিচ্ছে? মরে যাবি তো রে ঐ আহ্লাদী-পেহ্লাদী শরীর নিয়ে। আসলে সমরেন্দ্র-পুতুলরা গিয়েছিল বলেই ওর এত দুঃখু। যেতে ওদের বেশ কষ্টই হয়েছে বললে। ঘুচাই, পিকো আর রঞ্জনকে বললুম, "বড় একটা জলপাত্র কিনে, বেশ করে গঙ্গোত্রীর নিরুমল পানি ভরে নে।" খানিক বাদে তারা 'বাপ্‌রে মারে' করতে করতে জল নিয়ে ফিরল—"হাতে প্যারালিসিস হয়েছে"—"আট্টু হলেই আজ জলের মধ্যে পাত্র বিসর্জন হয়ে যাচ্ছিল"—'ওরে বাবা'র মধ্যেই কবিতাদি জানালেন, উনি ঐ জলে দুদিন সশরীরে সবস্ত্রে চান করেছেন। ভিজে কাপড়ে, এই বাতাসে—! নাঃ, সারদামায়ের আশীর্বাদী রুদ্রাক্ষের ক্ষমতা আছে!

ঘুচাই আর পিকো আবার পালিয়েছে। গঙ্গোত্রীর ট্যুরিস্ট লজের কর্মকর্তা ছেলেটির বয়স বেশি না। সে খুব একটা ধর্মকর্মের জীবনে বিশ্বাসী বলে মনে হল না। তার খুব ফাঁকা, একা লাগে এখানে।—"এই তো মোটে ছ'মাসই লোকজন আসে, তারপর সব বন্ধ সুনসান্ হয়ে যায়। একটা সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই। উত্তরকাশীর আগে কোনো শহরই নেই। শহুরে মানুষ টিকতে পারে এখানে? এখানে ঐ এক সাধু-সন্নিসি আর মিলিটারি রেজিমেণ্ট, এই দু'ধরনের সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বাস করা সম্ভব। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয় দীপাবলীতে। কেদার-বদ্রী গঙ্গাযমুনা, সব মন্দিরের। পুরো উত্তরাখণ্ডেরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়, দীপ নিবে যায়, শঙ্খঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে যায়। লজ বন্ধ করে আমরাও তখন উত্তরকাশীতে নেমে যাই। বেয়ারা, কুক এরা সবাই তো টেম্পোরারি। এদের তখন চাকরি যায়। আমি অবশ্য সরকারী চাকুরে। আমার চাকরি যায় না।"

ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম চা-ওলা ছোকরার দামী ঘড়ির জন্য অমন লোভ কেন। ছ'মাস পরেই ওর জীবনে তুষার-যবনিকা নামবে। এর মধ্যে যা পারো, যতটা পারো, যোগাড় করে নাও। দুদিন বাদে ভাতও জুটবে কিনা ঠিক নেই। ট্যুরিস্ট লজের পাশেই কালীকম্বলীওয়ালার ধর্মশালা। মাটির ঘুপচি ঘর। পাশাপাশি ৫/৬টা দরজা-জানলা আছে। সামনে ফালি বারান্দা। যাত্রী ভর্তি। ইলেকট্রিক আছে বলে মনে হোলো না। ওপাশে গ্রামের গৃহস্থবাড়ি। পিকোলো একটি বউয়ের সঙ্গে ভাব করলো। বউটি ওর সমবয়সীই হবে, নাম ভাগীরথী। এই গাঁয়েরই মেয়ে। শাশুড়ীটি খুব তিরিক্ষি। শাশুড়ী এসে পড়লেই ভাগীরথী ভয়ে আর কথাই বলছে না। একটা টাটকা টোমাটোর মতন মুখটা ভাগীরথীর, হাসিখুশি, স্বাস্থ্যে-প্রাণে উজ্জ্বল। কোনোদিন উত্তরকাশীর চেয়ে দূরে যায়নি তাদের বাড়ির কেউ। কলকাতাকে কিন্তু সে নামে চেনে। গর্বের হাসি হেসে বলেছে—"উধার তুমলোগ গঙ্গাজী কো ভাগীরথী ক্যাহতা, না?" তার কাছে কলকাতার মানে, গঙ্গার যাত্রার শেষ ইস্টিশান। গঙ্গাকে দিয়েই তার ভারতবর্ষের মাপজোক। আর নামের মাহাত্ম্যে সে নিজেকেও পবিত্র আর বিশিষ্ট মনে করে। গল্প করতে করতেই সংসারের কাজ করছিল ভাগীরথী। তারই কাছে পিকো শুনল, এখানে হেলিকপ্টারে চড়ে ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন। অমনি ঘুচাই আর পিকো ছুটলো হেলি-প্যাড দেখতে। যদি

এসে পড়ে কেউ ? বিরলার কি মিসেস গান্ধীর কি ধীরেন ব্রহ্মচারীর প্লেন ?

খানিক বাদেই আবার পাঁইপাঁই ছুটে ফিরে এল। কোথায় যেন সাধুদের ছবি তুলতে চেষ্টা করেছিল, তাঁরা চিমটে তুলে তেড়ে এসেছেন। ঘুচাইরা দুদিন দণ্ডী-স্বামীর ধর্মশালায় ছিল। প্রসাদ খেয়ে স্বহস্তে বাসন মেজেছে। এঁটো পেড়েছে। সেই নতুনত্ব খুব ভাল লেগেছে। পিকোর মহাদুঃখু। ধর্মশালায় থাকা হল না। যত বলি, বাড়ি গিয়ে রোজ-রোজই না হয় এটো পাড়িস বাসন মাজিস, চটে যায়। —"তোমার কেবল ইয়ার্কি।"

"আর তোমার কেবল গুস্‌সা। আলবার্ট পিণ্টো কাঁহাকা।"

"চলরে ঘুচাই, ওদিকটা ঘুরে আসি। ওখানে গঙ্গার তীরে একজন সাধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গায়ে একটুকরো সুতো পর্যন্ত নেই অথচ হাতে একটা লম্বা বাঁশ। তাতে নানান রং-বেরঙের কাপড়ের টুকরো আঁটা—কাপড়গুলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়ছে—দেখেছিস তাঁকে ?"

"না তো! চল চল দেখি!" দুজনে মুহূর্তে হাওয়া।

৫৪
শিবখৃষ্টস্বামী

খানিক পরে ঘুচাই আর পিকো ছুটতে ছুটতে এসে বললো, "কলম আছে ?"

"কী হবে ?"

"দরকার আছে। ঠিকানা লিখতে হবে।"

"একজন সাধুর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়েছে তো!"

কলম নিয়ে লাফাতে লাফাতে আবার দুজনে পালালো। দুটো প্রজাপতির মতো নেচে বেড়াচ্ছে। ওপর থেকে দেখলে দুজনেই গঙ্গোত্রীতে কিছুটা বেমানান। ছোট করে ছাঁটা চুল, পরনে ব্লু জীনস আর সোয়েটার, আমাদের ছেলেবেলায় এরকম সাজপোশাককে বলত 'ট্যাঁশ ফিরিঙ্গিয়ানা'। ঠিক দুই বোনের মতন দেখাচ্ছে। দুজনেরই চোখে মোটা কাচের ভারী চশমা আর পায়ে ফড়িংয়ের পাখার লঘুচাঞ্চল্য। মালপত্র গুছিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মেয়েদের টিকি দেখা যাচ্ছে না। ট্যুরিস্ট লজের ছেলেটি বলছে, "আজই চলে যাচ্ছেন ? অথচ আগামী কাল ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সেই তিথি। কালই বাৎসরিক গঙ্গাপূজার উৎসব। গঙ্গাদেবীর মন্দিরের মূর্তিকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হবে শোভাযাত্রা করে। লোকে দূর দূর থেকে এই গঙ্গাসেবার পুণ্যস্নানের জন্যেই আসে। আপনি থেকেও চলে যাবেন ? দেখে যাবেন না ? স্নান করবেন না ?

আজ কেউ গঙ্গোত্রীধাম ত্যাগ করে যায় ?"

কিন্তু কবিতাদি তো যাচ্ছেন। বাঙালীদের দলটিও আগেই নেমে গেছে। এঁরা কেউ কি জানেনও না কাল এত বড়ো উৎসব ? কবিতাদি বললেন, "জানি বৈকি। কিন্তু কাল এখানে যে কী কাণ্ড হবে তা ধারণা করতে পারছো না। দেহাতী লোক শ'য়ে শ'য়ে আসবে। বাসে আর জায়গা থাকবে না ফেরার সময়ে। তারাও তো সব ফিরবে ? তাই আগেই—"

কবিতাদির ছেলে পুতুল বললো, "তাছাড়া খাবার-দাবারেরও অসুবিধে হবে—ছোট্ট জায়গা, যথেষ্ট কিছুই নেই—নোংরামিও হবে—নাইতে পারবেন না, প্রচণ্ড ভিড় হবে—ছোটখাটো কুম্ভমেলার মতো।"

সমরেন্দ্র বললে, "আজ কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নতুন আর কী দেখবেন ?"

আমি ওদের থাকতে বলছি না, বাসে জায়গা না পাওয়ার সমস্যাটা খুবই সত্য। কিন্তু আমাদের তো শুণ্ডিমার্কা ম্যাজিকট্রিপ, ওসব ঝামেলা নেই। আমি তবে কেন থেকেই যাই না ? একটা দিনের তো মামলা। কালই বরং বিকেলের মধ্যে নেমে যাবো। ভিড় তো কালই ভাঙবে না, যারা আসবে তারা তো কালই নামবে না ?

পিকো আর ঘুচাইকে খুঁজতে মন্দিরে গিয়ে দেখি পাঁচিলের ওপরে বসে বসে দুজনে এক ন্যাড়ামাথা সাধুর সঙ্গে গল্প করছে। আমি যেতে পিকো ছুটে এসে বললে, "এই নাও, এই খামটা একটু রেখে দাও তো—" বলে একটা নোংরা মতন খাম আমাকে এগিয়ে দিয়েই পালালো।

ঘুচাই চেঁচিয়ে বললো, "ওতে আড়াই হাজার টাকা আছে—" বলে ফের গল্প করতে লাগলো।

আমি চেঁচাচ্ছি—"চলে আয় ঘুচাই—ওঠ, বাস চলে যাবে—" বলতে বলতে হঠাৎ কথাটা বোধগম্য হলো।—"ঘুচাই, কী বললি ?"

"ওতে আড়াই হাজার টাকা আছে ?"

"কার টাকা ? কিসের টাকা !"

"পিকোর কাছে রাখতে দিয়েছে। ঐ যে ঐ সাধুর টাকা। বলেছে, কলকাতায় গিয়ে আবার ফেরত নেবে।"

"কেন ? ও বাবা, ওসব হবে না। এক্ষুনি ফেরত দাও। পরের ধন আমি যক্ষ হয়ে সামলাতে পারবো না বাপু ! আমার নিজেরই সর্বস্ব হারিয়ে যায়। শেষকালে আড়াই হাজার টাকা নিজের পকেট থেকেই গচ্চা দিতে হবে।" সাধুর

কাছাকাছি তেড়ে যাই খর্‌খর্‌ করে। ইয়ার্কি নাকি? কাছে গিয়ে দেখি গল্পটা হচ্ছে ইংরিজি ভাষাতে।

সায়েব সাধু। ও, তুমি বুঝি কৃষ্ণকন্‌শাস? "মাই নেম ইজ শিবখৃষ্টস্বামী, আই অ্যাম আ ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ইন লাভ উইথ হিন্দুইজম অ্যাণ্ড ইন্‌ডিয়া।"

"নমস্কার।"

খাস ইংরেজি উচ্চারণ। ওরে বাবা, একি মাল? একে তো সোজাসুজি সি আই এ কিম্বা কে জি বি কোনো প্লট্‌-এই ফেলা যাচ্ছে না? বেশি ঝামেলায় না গিয়ে আমি সোজাসুজি 'পয়েণ্টে' চলে যাই—"সব আপনার টাকা?"

"ঐ একরকম বলতে পারেন। টাকা কি কারুর হয়!"

"আমি এর দায়িত্ব নিতে পারব না।"

"দায়িত্ব তো আপনার নয়। আমি ওটা আপনার মেয়েকে দিয়েছি।"

"আমার মেয়ে ছোট, তার দায়িত্বটাও এখনও আমারই। ধরুন যদি এখন আমার মেয়ে হঠাৎ মরে যায়? হিন্দুধর্মে বলে অঋণী মরতে হয়।"

"মরবে কেন? বালাই ষাট! বাচ্চা মেয়ে!"

"বেশ। ধরুন হয়তো আপনিই স্বর্গে গেলেন। আর টাকা ফেরত নিতে এলেনই না। তা হলেও তো ও ঋণী হয়ে মরবে।"

"ঋণী কেন? ওকে তো আমি ঋণ দিইনি?"

একমুখ হেসে সাধু বলেন, "ওটা তো ওকে আমার 'দানম্‌'। দান নিলে ঋণী হবে কেন?"

"'দানম্‌' মানে? আমার মেয়ে হঠাৎ আপনার দান নিতেই বা যাবে কেন। আপনি কলকাতায় গিয়ে টাকাটা ফেরত নেবেন বলেই না ও রেখেছে।"

"তখন সেইটে হবে আমাকে ওর দানম্‌। ইচ্ছে না করলে নাও দিতে পারে। টাকাটা এখন তো ওরই সম্পত্তি। আমি দিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ কথা। ওর সম্পত্তি। সেটা দিয়ে ও কী করবে?"

"পিকোলো জানে। জানো না পিকোলো, টাকাটা দিয়ে কী করবে? আশ্রম হবে। অনাথ শিশুদের জন্য। ভারতবর্ষে গরীব লোকেরা বড় কষ্টে থাকে। আমি একটা জমি কিনতে চাই। ঐ টাকা সেই জন্যে জমাচ্ছি। জমি কিনে আশ্রম করবো। অন্তরা বলল কী সব স্কীমে যেন টাকা বাড়ে। তাতে জমি কেনার সুবিধে হবে।"

এতক্ষণে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে সাধুকে। শিবখৃষ্টস্বামী নাম ওকে দাক্ষিণাত্যের এক আশ্রমে দিয়েছে। সাধুর নাম ক্রিস্‌, ক্লাস সেভেনের পরে

এখানে ওখানে চাকরি করে বেড়িয়েছে। পনের বছর থেকে সে ঘরছাড়া। শেষে সাধু হয়ে গেছে। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম তাকে শান্তি দেয় না, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা তাকে তিষ্ঠুতে দেয় না। তাই ভারতবর্ষ। হিন্দু ভারতবর্ষকেই সে বেছে নিয়েছে।

"সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরবো না বলে হৃষীকেশের এক চায়ের দোকানেও তিনশো ডলার জমা রেখে এসেছি। নেমে গিয়ে নেবো।"

"রসিদ আছে?"

"রসিদ?" আশ্চর্য সরল চোখে তাকালেন, নীলাক্ষ সন্ন্যাসী।—"না তো?"

'তবে গেছে। ও টাকা আর পাবেন না। গরিব লোক খরচ করে ফেলবে।"

"না না, ওদের দোকানে আমি রোজ চা খেতাম। ওরা খুব সৎ। টাকা মারা যাবে না।"

একগাল হাসলেন ফোকলা সাধু। না গেলেই ভালো। কথা ঘোরাই। —"কবে ফিরবেন?"

"আর তো ফিরবো না? এবারে এখানে থাকবো বলেই এসেছি। জমি কিনবো। আশ্রম করবো। সেবা করবো দরিদ্রের।"

তারপর আমাদের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ হল। কেদারনাথ যাবো না, গঙ্গোত্রী থেকে নেমে সোজাই বদ্রীনারায়ণে চলে যাবো শুনে শিবখৃষ্টস্বামী অত্যন্ত বিচলিত হলেন।—"সে কি? কেদারনাথে না গেলে হয়? কেদারনাথই সবচেয়ে সুন্দর।"

"এই গঙ্গোত্রীধামের চেয়েও? আরও সুন্দর হওয়া কি সম্ভব?"

"আরো সুন্দর। ইটস ওপেন-ও-পেন নট সো ক্লোজড—মনটা উদার হয়ে যায়। খোলা হয়ে যায়—কত বরফচূড়া কত তুষারনদী—না না, তোমরা অতি অবশ্যই কেদারনাথে যাবে। নইলে চারধাম সম্পূর্ণ হবে না।"

ক্যাথলিক সাধুর চারধাম সম্পূর্ণ করানোর উৎসাহে একটু অবাক না হয়ে পারি না। তারপরে বলি, "ছাখো সাধু, বড্ডই কষ্ট পেয়েছি—প্রচণ্ড মানসিক টেনশানে এবং গায়ে ব্যথায়। খচ্চরে চড়ে এখনো সর্বঅঙ্গে কালশিটে। ওই অভিজ্ঞতাটি আমি আর দ্বিতীয়বার চাই না। আমি তো হেঁটে উঠতে পারবো না, হাঁপানী রুগী —তাই যাবোই না। বরং ওরা যায় যাবে, আমি গৌরীকুণ্ডে থাকবো।"

"কেন? তুমি ডাণ্ডী নিয়ে যাবে। কষ্ট হবে না।"

"না সাধু। প্রথমত বড্ড বেশি খরচ। দ্বিতীয়ত, ওইভাবে যাবার বয়েস আমার এখনো হয়নি। আমার লজ্জা করবে বুড়োদের মতন শুয়ে বসে যেতে।

তার চেয়ে না যাওয়া ভালো।"

"আরে ছি ছি! এটা কি রকম দাম্ভিক কথা হল? ভগবান দর্শনে যাবে, কী ভাবে যাচ্ছো, তাতে কী এসে যায়? ভগবানের কাছে যাবে, ঠিক যেভাবে তোমার শরীর সহজে যেতে পারবে, সেই ভাবেই যাও। স্বয়ং কেদারনাথকে বাদ দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়েই বা তুমি কী করবে? ডাণ্ডী নাও, কাণ্ডী নাও। যৌবনের গর্ব কোর না। ঈশ্বরের সমীপে বিনীত হয়ে, বিনম্র হয়ে যেতে হয়।"

হঠাৎ ভয়ঙ্কর লজ্জা করলো।—"বি হাম্বল, ডোণ্ট বি সো প্রাউড," যেন বুকের ভেতরে হাতুড়ির ঘা মারলো। কী ভুল, কী ভুল করছিলুম! কত সহজে, কত প্রকাণ্ড একটা ভুল ধরিয়ে দিলেন শিবপৃষ্টস্বামী।—নাঃ, যেতেই হবে কেদারে। "চারধাম" বলে বেরিয়েছি যখন! কেদারনাথ যাবো বরং ফেরার পথে। স্ট্রেন হলে হবে। তখন তো ঘরমুখো। আগে কেদার, পরে বদ্রী, এটাই যাত্রার রীতি। —"যদি আগে বদ্রীই চলে যাই? পরে কেদার গেলে কিছু হবে না তো?"

"হবে আবার কী? যখন যেখানে যাবে, সেটাই ঠিক সময়। চলে যাও। শুভযাত্রা। আবার দেখা হবে।"

"কলকাতায়।"

"অথবা অন্যত্র!"

৫৫

তেঁতুলপাতায় ক'জন?

বাস স্টেশনে এসে দেখি, এক ভয়াবহ ব্যাপার চলছে। বাস আসছে বেঁকে—ছাদের ওপরে ভর্তি পোঁটলাপুঁটলি আর মানুষ। কী প্রচণ্ড ভিড়। অনেকগুলো জীপও আছে—প্রত্যেকটা থেকেই মানুষ খসে খসে পড়ছে। বিশ-পঁচিশজন করে তুলছে। ছ'টাকা ভাড়া। সমরেন্দ্র, রঞ্জন, পুতুল ছুটোছুটি করতে লাগলো। বাসে ওঠার প্রশ্ন নেই। দলে দলে মানুষ আসছে গঙ্গাদশেরার জন্যে। একটা জীপ শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল ছেলেরা।

"দৌড়ে এসে উঠে পড়ো এক্ষুণি।"

আমরা ছুটে গেলুম, যেই উঠে বসেছি, তেঁতুলপাতার সুজন সেই বাঙালীদের ৪/৫ জন নারীপুরুষ দৌড়ে এলেন—"একটু জায়গা হবে আপনাদের জীপে?"

ওঁরা কোথাও উঠতে পারছেন না—বাকী ক'জন, মেসোমশাই সমেত, আগেই চলে গেছেন অন্য এক জীপে। আমরা আছি সাতজন—পুরো জীপ ভাড়া নিয়েছি। কবিতাদিদের সত্যি প্রচুর মালপত্র।—"নিশ্চয়ই, অবশ্যই। চলে

আসুন। যদি হও সুজন, তেঁতুলপাতায় ন'জন।"

ওঁরা অলরেডি ন'জনই ছিলেন, তাই আমাদের আরো তিনজনকে ওঁদের জীপে আঁটেনি। কিন্তু আমরা তো কপালকুণ্ডলা পড়েছি, তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? অতএব গঙ্গামাঈর জয়ধ্বনি দিয়ে রওনা হয়ে গেলুম ভৈরবঘাঁটির দিকে। নোব্‌ল রিভেঞ্জের নৃশংস আনন্দের পাপে যদিবা একটুকুও পুণ্যসঞ্চয় করে থাকি, সবই ঘুচে গেল সন্দেহ নেই।

ভৈরবঘাঁটির ভৈরবমন্দিরে পিকো গেল একটা উঁকি মেরে আসতে, কবিতাদিরা তখন কুলি সংগ্রহে ব্যস্ত। ১১ টাকাতে একজন মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে লংকায়। মন্দিরের সামনে সাধুদের আখড়া। সেখানে সাধুবাবারা গঞ্জিকা সেবনে ব্যস্ত, ধুনি ঘিরে সুখী-সুখী মুখে বসে আছেন। পিকোকে দেখবামাত্র এক সাধু দৌড়ে মন্দিরে গিয়ে একটি বই খুলে তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং জোরে জোরে ভাবগম্ভীর স্বরে কুমারসম্ভব পাঠ শুরু করে দিলেন—"তারপর শিব পার্বতীকে আলিঙ্গনপূর্বক বললেন,—'হে পার্বতী—তোমার অঙ্গের অপরূপ সুরভি'—"

পিকোকে দেখেই তাঁর গাঁজা ছেড়ে উঠে কেন যে কুমারসম্ভব পড়বার গূঢ় ইচ্ছেটি হলো, কে তা বলতে পারে? পিকোকে বললুম, "গেঁজেল সাধুর ধ্যানভঙ্গ করেছিস, উমারই যোগ্য উত্তরসাধিকা তুই।"

এই উচ্চপ্রশংসায় পিকো একটুও বিচলিত হল না। ঠোঁট উলটে—"সাধু না ছাই" বলে নাচতে নাচতে ঘুচাইয়ের সঙ্গে পাকদণ্ডী বেয়ে অন্যায়পথে স্বেচ্ছাচারপূর্বক নামতে শুরু করে দিল। দুদিকে দুই মেয়েকে নিয়ে খুব আহ্লাদেই খানিকটা এগোলাম।

পথে হঠাৎ একজন সাধু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা বাঙালী? কোথায় চললেন, কেদারবদ্রী? ওখানে তো দারুণ অ্যাকসিডেন্ট।"

"সে কি? সে কি? কি রকম?"

"বাস্ খাদে পড়ে গেছে। ত্রিশ-চল্লিশজন যাত্রী খতম।" বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সাধুটি জানালেন, যেন সুখবর।

"আপনি কি বাসে চড়েন না?"

"খুব কম।"

"এখন কোথা থেকে আসছেন?"

"যমুনোত্রী। পথে শুনে এলাম খবরটা।"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"থাকি না কোথাওই, ঘুরি তো! বছরে একবার করে উত্তরাখণ্ডে আসা আমাদের নিয়ম। এখানে তাই আসি প্রত্যেক বছর। অভ্যাস আর কি—ত্রিশ

বছর বাংলাদেশ ছাড়া।"—সাধুর বয়েসই ত্রিশ-বত্রিশের বেশি মনে হয় না।

"বাংলাদেশে কোথায় আপনার বাড়ি?"

"হাওড়া জেলা।"

পিকো বলে, "হাওড়া তো বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গে।"

"তখন সবই বাংলাদেশ ছিল ভাই। আমার কাছে বাঙালীর চিরদিন যে মাটিতে জমিজমা, জন্ম, কর্ম, সেই মাটির নাম বাংলাদেশ। হাওড়া বাংলাদেশ, হুগলী বাংলাদেশ, কলকাতা বাংলাদেশ—বুঝলেন? বাঙালীর দেশ মানেই বাংলা-দেশ—তাই না?—দেবেন নাকি, মা, গঙ্গাদশেরার জন্যে সন্ন্যাসীকে কিছু দান?" প্রসারিত তালুতে দুটো টাকা রাখি।—"জয় হোক মা, মঙ্গল হোক।"

এই যাত্রায় এই প্রথম ভিক্ষে। এতদূরে এসেও তীর্থে প্রথম ভিক্ষেদান বাঙালী সাধুকেই! 'দান' শব্দে স্যাৎ করে মনে পড়ে গেল, গলায় ঝোলানো পার্সে আমার নিজস্ব সম্বলটুকুর সঙ্গে এখন আছে আরো একটা খাম—শিবখুষ্টস্বামীর 'দানম্'। যাবো, তোমার অত প্রিয় কেদারনাথে নিশ্চয় যাবো, স্বামীজী। দরকার হলে ডাণ্ডী নিয়েও যাবো। অন্তত এটুকু বিনয় আমার শিক্ষা হোক।

৫৬

পায়ে চলার পথের শেষে

হেঁটে হেঁটে হেঁটে চড়াই উৎরাই ভেঙে গঙ্গা-যমুনার হাত ধরে লংকায় এসে পৌছুই। পথে একবার দেহাতী এক যাত্রী হঠাৎ অনে—ক উঁচুতে দুটি অদৃশ্যপ্রায় পর্বতচূড়ায় গভীর যমুনার খাদের ওপর খাড়া দুটি পাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "উয়ো বন্ রহা হ্যায় মিলিটারি পুল। যব খতম হো যায়গা ইস রাস্তে বি, ব্যস্, খতম্! সি-ধা আ যায়গী বাস্-মোটর, হর্ চীজ। যাত্রা খতম্।"

আমারও মনে হল কথাটা ঠিক। এই এত সুন্দর, অসামান্য পথটি মিথ্যে হয়ে যাবে। এমন কি সাধুরাও এপথে যাবেন না, লোটা কম্বল নিয়ে মিলিটারি পুল দিয়ে শর্টকাটে চলে যাবেন ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। এত চমৎকার নদী, ঝর্ণা, বন পাথরের জলছবি—সব আবার অনধিকৃত, বুনো হয়ে যাবে? ফিরে যাবে প্রকৃতির নিজস্ব তোরঙ্গে। অব্যবহারে অব্যবহারে আবার প্রথম দিনের মতো নতুন হয়ে উঠবে। একমাত্র প্রকৃতিতেই এটা সম্ভব। ভাগ্যিস তুমি এখনও তৈরি হওনি ভৈরঘাঁটির পুল, ভাগ্যিস এখনও এই অলোকসামান্য পথে আমার অধিকার অক্ষুণ্ণ!

লংকায় পৌছে খবর নিলুম বাস-ড্রাইভারদের কাছে। না, সাধুজী পুরোপুরিই বঙ্গসন্তান। ত্রিশ বছরে স্বভাব পালটায়নি কিছুই। কেদারবদ্রীতে কোনোই বাস্

পড়েনি! অকারণ গুজব। হ্যাঁ, এগারোই একটা বাস্ পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আটকে গেছে। কেউ মরেনি।

দেখতে পেয়ে ছুটে এল সুরথ সিং।—"নমস্তে। হমভি গঙ্গাজীমে নাহাকে আয়া।"

"আরে, কখন গেলে?"

কালই সে গেছে, স্নান করেছে এবং ফিরেও এসেছে। হেঁটে। আগাগোড়া। ভৈরবঘাটির বাসের জন্যে বসে না থেকে হেঁটেই মেরে দিয়েছে সাত সাত চোদ্দ কিলোমিটার। ওর কাছে নস্যি। বাসের জন্যে বসে থাকলে হতই না স্নান!

কালকের সেই মৃতদেহের কী হলো?

সে তো কালই পোড়ানো হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আরও তিনজন মারা গেছে।—ইধর ইয়ে তো হামেশা কী বাত। যাত্রা কা পরেশানিসে বুড্ঢা লোগ গুজর যাতা।"

কবিতাদিরা লাঞ্চে বসলেন, বাসের বুকিং পেয়ে গেছেন। আমরা রওনা হই উত্তরকাশী। পথে ইন্দর সিংয়ের কাছে চা খেয়ে যেতেই হবে। কথা দেওয়া আছে। এখন সমস্যা, দোকানটা খুঁজে পাওয়া নিয়ে। ছোট্ট একটা কাঠের ঘর, ভাগীরথীর তীরে। গাঙ্গনানীর পরে, ভাটওয়াড়ীর আগে পড়বে। চিনতে পারবো তো? আমাদের বেজায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, অর্থাৎ রঞ্জনের এবং আমার। কিন্তু পিকোলো ভয়ের চোটে কিছুতেই খেয়ে রওনা হবে না। ওর ধারণা খেলে গা গুলোবেই। আসার সময়ে খালি পেটে ছিলুম, ওর শরীরও তাতে খারাপ হয়নি। অতএব সবাই খালি পেটে রওনা হই। ডালমুট আর বিস্কুট ভরসা করে। একটা একটা করে যত চেনা ঝর্ণা পার হচ্ছি, যতই গঙ্গোত্রী পেছনে পড়ে যাচ্ছেন, ততই আমার মন খারাপ হচ্ছে। একসময়ে সেই বিশাল তুষারখণ্ড পার হয়ে যাই। ফেরার পথে সেই সব ঝর্ণাগুলো চেনা বন্ধুর মতো আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। যাবার পথে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় হয়েছে। এবারেও থামছি, ইঞ্জিনে জল ভরছি, বোতলে জল ভরছি, মুখ ধুচ্ছি, সুখে জলকেলি করতে করতে এগোনো হচ্ছে। একসময়ে গাঙ্গনানী পেরিয়ে যাই, অপূর্ব সুন্দর স্নো-ভিউ এখানেই শেষ। এরপরে হঠাৎ হঠাৎ একটু-আধটু। দয়া করে দর্শন দেয়া।

৫৭

দিল্‌নে ফির্ ইয়াদ কিয়া

পথের বাঁকে হঠাৎ দেখা গেল ইন্দর সিংয়ের দোকানঘর। অমনি কোরাস—"থামো, থামো, সুরথ সিং? এই তো!"

সুরথ সিং নিজেও দেখেছে। আমরা নামবার আগেই দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে ইন্দর সিং। ফোক্‌লামুখের সেই অভাবিত আনন্দের জ্যোতির তুলনা আমি দিতে পারবো না। আমাদের মুখেও নিশ্চয় তার কিছুটা প্রতিবিম্বিত ছিল।…"সচমুচ ইয়াদ রাখা? সচমুচ আয়া আপলোগ? ফির্‌ভি আ গয়া? হম্ তো কাল্‌সে হর্ গাড়িকো দেখ্ রহা থা। ম্যায়নে সোচা কি ভুল গয়া হোগা। ইত্‌না দূর যানা হ্যায়, দোবারা রুখেঙ্গে নহী।"

ভুলবো কেন? ভোলা যায় নাকি? পিকোলো, রঞ্জন, সুরথ সিং আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা করে মনে আছে, তোমার কাছে কথা দিয়ে গেছি। জীবনে ক'টা কথাই বা রাখা যায়, ইন্দর সিং? বেশি করে দুধ দিয়ে খুব যত্নে চা তৈরি করলো ইন্দর সিং, গরম গেলাস হাতে ধরতে পারবো না বলে কাপের মধ্যে গেলাস ভরে রুশদেশের কায়দায় চা পরিবেশন করলো, দু'প্যাকেট গ্লুকোজ বিস্কুট দিল। প্রথমে তো দামই নেবে না একটার—"বেবিকো দিয়া"—, অতিকষ্টে সুরথ সিং তাকে রাজী করালো। এবার রওনা। ভাটওয়াড়ীতে লাঞ্চ খেয়ে উত্তরকাশী।

গাড়িতে তুলে দিয়ে ইন্দর সিং বললো, "বিবিজী, হম্ ক্যা বোলেগা, দিল্ ভর্ গয়া হম্‌কো, জিন্দেগী ভর্ ইয়াদ্ রহেগা ইস্ দিন—"

দিল্ ভরে গেছে আমাদেরও। আমাদেরও মনে থাকবে, ইন্দর সিং, জিন্দেগী ভর। তোমার আদর, তোমার খুশি, তোমার এই পাহাড়, গঙ্গা। জিন্দেগী ভর ভুলব না যমুনার প্রলয়প্রবাহ। ভাগীরথী, তোমাকেও মনে থাকবে, শিবখৃষ্টস্বামী, তোমাকেও, মেসোমশাই, কুন্দন সিং, দেওঘরের বাবাজী ভুলবো না কাউকেই! বাবাজী সেদিন "ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়ুন" না বললে গঙ্গোত্রীতে আসাই হত না আমার। গাছের তলায় কম্বল জড়ানো হে রামশরণাশ্রিত পথিক, তোমাকেও মনে থাকবে। আর দূর জলন্ধরের গ্রামের পথক্লান্ত ঠাকুমা, তোমার শেষ অশ্বারোহণে আমরা সঙ্গী রইলুম না।

গাড়ি ছুটেছে ভাটওয়াড়ী হয়ে উত্তরকাশী। কাল সকালেই রওনা হবো বদ্রী-নারায়ণের পথে, সেই সব আশ্চর্য প্রয়াগের সারি যে পথে অপেক্ষা করে রয়েছে আমার জন্যে। মন্দাকিনী, নন্দাকিনী, পিনডার, অলকানন্দা—একদিকে স্বপ্নচারিণী নদীরা সবাই, আর অন্যদিকে কল্পনার দেশঘর রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ—যেন স্বপ্নের মধ্যে সোনার ঘণ্টা বাজাচ্ছে—স্বপ্ন সফল হবার দিন তো সবে শুরু।

॥ প্রথম পর্ব শেষ ॥

দ্বিতীয় পর্ব

১

শ্বেত সন্ত কথা

স্নেহের পিকোলো,

তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়। গত বছরটা আমি গঙ্গোত্রীতেই কাটালুম। ভূর্জবাসায় চীরবাসায়, গোমুখে বাস করেছি। অপূর্ব! লালবাবার আশ্রমেও ছিলুম। কই, এই গ্রীষ্মে তোমরা তো আর এদিকে এলে না? যাত্রীদের মধ্যে ছোট ছোট মেয়ে দেখলেই আমি তোমাদের কথা ভাবছিলুম।

জানো পিকোলো, একটা খুব দুঃখের কথা, তোমার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণীই মিলে গেল। হৃষীকেশে যে চায়ের দোকানে আমি তিনশো ডলার জমা রেখেছিলুম, ওরা সে টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। আমি অনেক করে চেয়েছিলুম, অথচ সেই টাকাটা আমার প্রয়োজনের সময়ে আর পাইনি। প্রথমে তারা আমাকে চিনতেই পারছিল না। তারপর বলল, "সেই টাকাটা কি আপনি আমাদের দান করে দেননি? আমরা তো দান মনে করে খরচ করে ফেলেছি। আর হাতে টাকা নেই, ফেরত দিতে পারবো না।" আমার খুব মন খারাপ। এত সহজে যে মানুষ মানুষকে ঠকায় তোমাদের দেশে, তা বুঝতে পারিনি। এতে আমার খুব ক্ষতি হয়েছে। আমার মানুষে বিশ্বাস চলে গেছে। এখন সবাইকে সন্দেহ হয়। সবাইকে ধান্দাবাজ ও মিথ্যাবাদী মনে হয়। এতে আমার টাকাকড়ি কতো রক্ষা পাচ্ছে জানি না, তবে মনের শান্তি রক্ষা পাচ্ছে না। তোমরা কেমন আছো? পড়াশুনো কেমন হচ্ছে? স্নেহ শুভেচ্ছা নিও। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। ইতি শিবখৃষ্টস্বামী।

পুনশ্চ: তোমরা কি কেদারনাথে ও বদ্রীনাথে গিয়েছিলে? অপূর্ব নয়? তবে গোমুখ আরো অপূর্ব। তোমরা পরের বার অতি অবশ্যই গোমুখ দর্শন করে যাবে। ঠাণ্ডার জুতো, পোশাক নিয়ে এসো। আমি এখনও দরিদ্রদের আশ্রম তৈরির কথা ভাবছি। সরকার নানা বাধা দিচ্ছেন। মিলিটারি ইত্যাদিরও অসুবিধে আছে। গঙ্গোত্রীতে বা বদ্রীনাথে সম্ভব নয়। আমার সমতলে থাকতে ইচ্ছে নেই। হিমালয়ের কোলেই আমি আশ্রয় নিতে চাই। তোমাদের সঙ্গে আশ্রম তৈরি বিষয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। এখানে ভারতীয় সাধুদের অসুবিধে

নেই। আমার যেহেতু ব্রিটিশ পাসপোর্ট এবং অঞ্চলটি খুব সঙ্কটময় বলে সরকারী ভাবে চিহ্নিত, সেহেতু বিদেশী সাধুদের ভালো চোখে দেখা হয় না। সাধুদের তো এমনিতেই অসাধু মনে করা হয় (সবচেয়ে সহজ ছদ্মবেশ বলে), আর বিদেশী সাধু হলেই তাদের চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। চরদের পক্ষে যে সাধু সেজে বিচরণ করাই কাজের শ্রেষ্ঠ উপায় তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বিদেশী হবে কেন? বিদেশী শত্রুরা তো দেশী চরই নিয়োগ করবে। কিন্তু এতটা তলিয়ে ভেবে দেখা কোনো দেশেরই সরকারের চরিত্র নয় বা অভ্যাসও নয়। যাই হোক আমাকে তোমাদের সরকার মাঝে মাঝে ভিসা-টিসা নিয়ে বেগ দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, দূর ছাই, সব ছেড়েছুড়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাই। আমার কী? আবার হিমালয় ফিরে ডাকে। ভারতবর্ষের সীমাহীন দারিদ্র্য চুলের মুঠি ধরে যেন টানে। কি জানি, আমি হয়তো কোনোদিনই এদেশ ছেড়ে যেতে পারবো না। যীশুর যেমন ইচ্ছে, শিবের যেমন ইচ্ছে।

পূর্বদিকে জগন্নাথ দক্ষিণদিকে রামনাথ
পশ্চিমেতে রণছোড় উত্তরেতে বদ্রীনাথ
রাজকরণে জগন্নাথ যোগকরণে রামনাথ
ভোগকরণে রণছোড় তপকরণে বদ্রীনাথ
কোটিতীর্থফলভণে বদরীনাথের দরশনে

যমুনোত্রীর পরই ভেবেছিলুম আর নয়। আর যাবো না তীর্থযাত্রায়। নানান কারণে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল, শরীরে মনে প্রবল বিচলিত বোধ করেছিলুম। খচ্চরে চড়ে সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল আমার। যদিও পদব্রজেই নেমেছি প্রধানত, তবু ওঠার সময়ে হাঁপানী রুগী হয়ে অতটা চড়াই ভাঙার কথা ভাবতেও পারি নি। শরীরের সেই প্রচণ্ড অস্বস্তি ও যাতনা আমি দ্বিতীয়বার ডেকে আনতে রাজি ছিলুম না। এর পরে হেঁটে উঠলে উঠবো, নইলে নয়। এবং কেদারনাথে চোদ্দ মাইল হেঁটে ওঠা সাধ্যে কুলোবে না। স্বদেশ কোলকাতাতেই চোদ্দ মাইল প্লেন রাস্তায় হেঁটে আমি কোনোদিন গড়িয়াহাট থেকে দমদমে যেতে সাহস পাইনি, হিমালয়ের চুড়োয় উঠে সে সাহস পাবো কোত্থেকে? কেদারনাথ আউট। ভেবে-ছিলুম গঙ্গোত্রীও যাবো না। তারপর মাত্র ৩ মাইল হাঁটাপথ শুনে, রাজি হলুম যেতে। বদ্রীনারায়ণ তো এখন দিব্যি সিমলা-দার্জিলিংয়ের মতোই সিবিলাইজড টুরিস্ট স্পট হয়ে গেছে। সোজা মোটররাস্তা আছে দিল্লি থেকে। বাস যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। কচিকাচা, বুড়োবুড়ী সবাই যাচ্ছে। কেউ মরে না ওপথে। কেউ

কষ্ট পায় না। আশ্চর্য একটা বেড়ানো হচ্ছে বটে! পি. আর. ও. বন্ধুর গাড়ি-ড্রাইভার ফ্রী ধার পেয়েছি, আর রাজার হালে ঘুরে বেড়াচ্ছি চারধাম। আমার আর এক বন্ধু তার শ্বশুরশাশুড়ী বউছেলে নিয়ে এই রকম ভাবে ঘুরে গিয়েছিলো এক ব্যাংকের পাবলিক রিলেশনস্-এর সঙ্গে। শুনে তখন কী হিংসেই না হয়েছিলো সেই বন্ধুকে। আর এখন? আমি স্বয়ং সেই অবিশ্বাস্য ভ্রমণের যাত্রী। ঈশ্বর বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন আমার নীরব ঈর্ষার ভাষা। এটাই তাঁর ভৎর্সনার ধরন।

সুরথ সিং আমাদের সারথি, কন্যা পিকোলো আর ভাই রঞ্জন আমার সহযাত্রী। বার বার মন ভাঙার কারণ ঘটছে। যমুনোত্রীতে আমাদেরই সাক্ষাৎ সঙ্গিনী এক বৃদ্ধা পাঞ্জাবিনী বর্ষায় পা ফস্‌কে ঘোড়াসুদ্ধু, সহিসসুদ্ধু দু'হাজার ফুট খাদের অতলে পড়ে তলিয়ে গেলেন। এভাবেই, শুনলুম, আগের দিনই গেছে একটি পঞ্চদশী কন্যা। গঙ্গোত্রীর পথে বার বার অকৃতকার্য, ব্যর্থমনস্কাম বৃদ্ধ তীর্থ-যাত্রীদের মৃতদেহ শয়ান দেখেছি, যাঁদের তীর্থযাত্রাটি সম্পূর্ণ হয়নি কিন্তু পুণ্যের অংশটা হয়েছে একশোয় একশো। সিধেই স্বর্গলাভ এখানে মরলে। যমুনোত্রীর রাস্তাটা প্রচণ্ড চড়াই এবং সঙ্কীর্ণ এবং দুর্গম। ওপরে উঠেও, বৃষ্টিতে কাদায় প্যাচপেচে যমুনোত্রী ক্যানিংয়ের নোংরা কাদার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। হিমালয়ের চার-চারটে গ্লেসিয়ার ঘেরা শিখর যমুনোত্রী যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উদ্দাম, বন্য এবং তুলনাহীন। এবং খচ্চরের পিঠে চড়ে সেই পার্বত্য পথযাত্রাও যন্ত্রণাদায়ক বন্য এবং তুলনাহীন। যারপরনাই ব্যথা হয়েছিল সারা গায়ে—বরকোটে অম্রুতাঞ্জন কিনে মালিশ করতে হয়েছিল। সেই সময়েই ঠিক করেছিলুম, ঢের হয়েছে, আর কেদারনাথ নয়। ঠিক করেই ফেলেছিলুম গঙ্গোত্রী থেকে আমরা সোজা যাবো বদ্রীনাথে। সেখান থেকেই নেমে যাবো হৃষীকেশ। কিন্তু সব গোলমাল করে দিলেন এই সাহেব সন্নিসিটি—শিবখৃষ্টস্বামী। কোথা থেকে উদয় হলেন হঠাৎ গঙ্গোত্রীর সুরধুনীর তীরে। কবিতাদির মেয়ে ঘুচাই আর আমার মেয়ে পিকোর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন, আর নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ করে আমাকে রাজি করালেন কেদারনাথ দর্শনে। উনি বললেন, কেদারে না গেলে উত্তরাখণ্ড ঘোরা হলই না। এত সুন্দর আর কোনো তীর্থ নয়। এত খোলামেলা, অথচ এত নির্জন, এত তীব্র সঘনসুন্দর। খচ্চরেও চড়তে পারবো না, হেঁটেও চড়তে পারবো না, অতএব যাবোই না—এই আহ্লাদে কথাবার্তা শুনে বললেন, "কাণ্ডী চড়ে, ডাণ্ডী চড়েও যাওয়া উচিত। এত অহংকারের কী আছে, যুব বয়েসে ডাণ্ডী-কাণ্ডী নিতে লজ্জা করবে? যাবে তো ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে, যে-কোনো উপায়েই হোক গেলেই হলো। সেখানেও যৌবনের দম্ভ? একটু বিনয়

নেই ?" শিবখৃষ্টস্বামীর বকুনি খেয়ে স্থির করলুম, সত্যিই তো! যেতেই হবে। 'চারধাম' করতে এসে তিনধাম করে ফিরবো গায়ের ব্যথার ভয়ে? আমি কি উন্মাদ? মানুষে কত কষ্ট করেই আসতো এককালে। এখনও আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে পুণ্যার্জনের যে স্পৃহা ছিল আমার মধ্যে তো সেটা নেই। আছে বেড়ানোর লোভ আর সৌন্দর্যতৃষ্ণা। তার জন্য কষ্ট করা আর ভগবানের জন্য কষ্ট করা তো এক ব্যাপার নয়। ক্রিশ্চান সন্ন্যাসী শিবখৃষ্টস্বামীর তীর্থযাত্রা আর আমার হিমালয় ভ্রমণের স্বাদগন্ধ আলাদা হতে বাধ্য। প্রথমত আমার হিমালয় আর একজন ইংরেজের হিমালয় এক নয়। আজন্মই হিমালয় আমাদের মজ্জার মধ্যে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে, হিন্দুধর্মে হিমালয়ের ভূমিকাটি প্রবল। কি সংস্কৃত শাস্ত্রে, কি বাংলার লোকাচারে, লৌকিক গাথাগল্পে এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে, —সর্বত্রই হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর বন্ধন। অথচ আজ শিবখৃষ্টস্বামী আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন, হিমালয়কে ভালোবাসায়। সাগরপারের এই ম্লেচ্ছ, যবন সন্ন্যাসী ক্রিশ্চান হয়েও কেদারনাথকে ভালোবেসে ফেলেছেন মনেপ্রাণে। শিবখৃষ্টস্বামী বলেছিলেন সে বছরটা শীতে-গ্রীষ্মে উনি গঙ্গোত্রী অঞ্চলেই কাটাবেন। গোমুখে থাকবেন। পরের গ্রীষ্মে যদি যাই, আবার দেখা হবে। পরের গ্রীষ্ম এসে গেছে, আমি তো গেলুম ম্লেচ্ছ দেশে সভাসমিতির কাজে, সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে, ডানা মেলে। ফিরে এসে দেখি এক বছর পরে শিবখৃষ্টস্বামী ঠিক চিঠি লিখেছেন পিকোকে। —"কই, তোমরা তো আর এদিকে এলে না?"

২

জেনারেশন গ্যাপ

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মানুষে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে উত্তরাখণ্ডের তীর্থযাত্রায় বেরুত। পথ ছিল এত দুর্গম, ঘরে ফেরার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এখন লাক্সারি বাস সোজা চলে যায় বদ্রীনারায়ণের পদতলে। নেহাৎ বাসে বসে বসে কেদারনাথের শ্রীচরণে পৌঁছোনো যাচ্ছে না এখনও, তাই সেই পথে প্রকৃতির রূপ যৌবনের মোহ এখনও কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। বদ্রীনারায়ণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে স্বামীর কাছে আটপৌরে রূপসী গৃহিণীর মতো। রূপটা চোখ-ঝলসানো হলেও, সহজলভ্য বলে স্বগৃহে তার মূল্য নেই। এই যদি উঠতে হতো প্রাণ হাতে নিয়ে ইষ্টনাম জপতে জপতে, পায়ে হেঁটে কি খচ্চরে চড়ে, তাহলেই ব্যাপারটা পালটে যেত।—'কাহারে হেরিলাম! আহা! এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!' বলে আর্তনাদ করে উঠতাম। যেহেতু আরাম করে গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

মাইলের পর মাইল উঠছি, কষ্টেসৃষ্টে চক্ষু মেলে খানিক দয়া করেই বুঝে ফেলে ছড়িয়ে দেখছি, খানিক দেখছিও না। ভারী তুষারনদীর তলে তলে তরলা অলকানন্দার অসামান্য লীলা, তার তীব্র অবাধ্য স্রোত, সত্যিই তুলনাহীন। কিন্তু বিনাশ্রমে পাওয়া যায় বলে তার দাম মানুষের কাছে কমে গেছে। আস্তে আস্তে মারোয়াড়ীদের ভগবদ্‌ভক্তির এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধির কল্যাণে কোনো তীর্থই আর দুরধিগম্য থাকছে না। তার ওপর মিসেস গান্ধীর ভক্তিমতী হৃদয় যুক্ত হয়ে সর্বত্রই এখন হেলিপ্যাডের অস্তিত্ব রয়েছে। শুনেছি কেদারনাথ-বদ্রীনারায়ণ মন্দিরে পথ যেদিন বন্ধ হয়—আর যেদিন খোলে, দু'দিনই হেলিকপ্টারে চড়ে বিড়লা মুন্দ্রা মহোদয়েরা নাকি সশরীরে উপস্থিত হন, পুরোহিতের প্রথম ও শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করতে। আর্মির মোটর-পথ বছরভর তৈরি আছেই। বড় অফিসারেরা মোটরে যান, মন্ত্রীরা যান উড়ে, আর ছোট অফিসারেরা বাসে চড়ে। আর আমার মত দু'একটা ভাগ্যবতী ভক্তিমতীর জন্য গাড়ি যোগান ভগবান।

কিন্তু ভগবান পিকোলোকে (এবং রঞ্জনকেও) কেন যে গাড়ি যুগিয়েছেন, সেইটে অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। ওরা সমানেই যাত্রাপথে নানাজাতীয় বাধা বিঘ্ন তৈরি করছে। ভক্তির তো পরাকাষ্ঠা দুজনের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে এবং সৌন্দর্য-পিপাসা বলতে যা কিছু ঝরনার জলেই তা মিটে যাচ্ছে। আর কিছু পথ-শোভা দেখাতে চেয়ে ভাতঘুমে ডিস্টার্ব করলেই মামা-ভাগ্নীর যারপরনাই বিরক্তি। ভোরে উঠে রওনা হওয়াটা নেহাতই আমার খামখেয়ালী অত্যাচার। এই কি 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা?' এরাই তো আধমরা। এতৎসত্ত্বেও আমাদের যে কোনোরকমে আধখানা "যাত্রা" সুসম্পন্ন হয়েছে তাতেই আমি খুশি। গঙ্গোত্রী থেকে আমরা ফিরে এলুম উত্তরকাশীতে। এবারে আর সেই বাজার-মধ্যস্থ টুরিস্ট লজে না উঠে অন্য টুরিস্ট লজটিতে চলে গেলুম। সেখানে এখন আর তত ভিড় নেই। বলতে গেলে সীজন ওভার।

৩

চন্দন সিং

একটা বড় ঘর পেলুম ৪টে খাটওলা—পাশেই সার সার স্নানঘর। ডরমিটরিই আসলে এটা, কিন্তু লোকজন নেই। চন্দন সিং বলে একটি গাঢ়োয়ালী যুবক আমাদের সেবক এঘরে। জানলা দিয়ে সামনেই দেখা যাচ্ছে গঙ্গার উত্তাল গৈরিক তরঙ্গ, আর জানলা বন্ধ করলেও শোনা যাচ্ছে জলস্রোতের গর্জন। সামনেই সবুজ হিমালয়। এখান থেকে কোনো হিমশিখর দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে

অনেক ছোটো-বড়ো মন্দির দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টাও শোনা যাচ্ছে আরতির। ঘরটি ভারি পছন্দ হয়ে গেল। বাথরুমে গরম জল নেই। দু'টাকায় এক বালতি কিনতে পাওয়া যাবে।

চন্দন সিং হঠাৎ বললে, "আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন না মেমসাব? আমি রান্নাবান্না সব জানি। পাহারাও দিতে পারি। বর্তন মল্না, প্রেস কর্না, সব কুছ আতা হ্যায় মুঝকো। পিওনের কাজও পারি। ক্লাস টেন তক স্কুল মে পঢ়া। অংগ্রেজী ভি পঢ়্লেতা হুঁ। হিন্দি ভি।"

অবাক হয়ে আমি বলি, "সরকারী চাকরি ছেড়ে তুমি কেন যাবে?"

উত্তরে শুনলুম চন্দন সিংয়ের চাকরিটা সরকারী নয়। টেমপোরারি সার্ভিস।

এ অঞ্চলের সব সরকারি টুরিস্ট লজই এইভাবে চলে। গঙ্গোত্রীতেও দেখেছিলুম কেবলমাত্র কেরানীবাবুরই পাকা চাকরি, ছ'মাস উত্তরকাশীতে থাকেন, ছ'মাস গঙ্গোত্রী লজে। আর সব ক'টি ছোকরা টেমপোরারি লোকাল এমপ্লয়ি। ওখানেই তারা বসবাস করে, বছরে ছ'মাস চাকরি থাকে, ছ'মাস বেকার। কখনও নিচে গিয়ে কাজকর্ম করে, কখনও নিচে গেলেও কাজ পায় না। চন্দন সিংয়েরও তেমনি সীজনাল এমপ্লয়মেণ্ট। যাত্রীদের সঙ্গে দিল্লি বম্বাই কলকাত্তা ঘুমনে যানা মাংতা। কেউই ওকে নেয় না। অথচ এই বছরেই তো মারোয়াড়ী বাবুরা নিয়ে গেছেন ওর বন্ধু দান সিংকে। দান সিং চিঠি লিখেছে দিল্লি থেকে। খুব ভালো আছে। ওকেও যেতে বলেছে। কিন্তু কেমন করে যারে চন্দন সিং? উত্তরকাশীর বাইরে কোথাও যায়নি সে। কেউ নিয়ে গেলেই চলে যাবে।—"মেমসাব, লে চলোগে, সাথমে, মুঝকো?" খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে কেউ যেতে চাইছে, অথচ আমি নিয়ে যেতে পারছি না।—এই উপলব্ধিটা অক্ষমতার। এবং তার স্বাদ ভাল নয়।

চন্দন সিংয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আমি ধোপার বোঝার সমান কাপড় কাচলুম। এই ক'দিনে (সাতদিনে) তো কাপড় কাচার সময় হয়নি। এখানে জোরালো গঙ্গার হাওয়ায় রাতের মধ্যেই সব খট্‌খটে হয়ে শুকিয়ে গেল, এমন কি পিকোর লিভাইস পর্যন্ত! আজ খেতে বেরুতে ইচ্ছে করল না, রঞ্জন একাই বেরুল। পিকোটা বমি করেছে খুব। ওর শরীর ভালো নেই। গঙ্গার বাতাস খেয়ে ঘুমিয়ে রইল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে তারার মতন আলোর শোভা দেখতে লাগলুম অনেক রাত পর্যন্ত।

ভাই চন্দন সিং, তুমি ভুল লোককে মুরুব্বী ধরেছো। আমি তোমার বন্ধুর মারোয়াড়ী মনিবের পাদনখকণার তুল্য রোজগার করি না। গাড়িখানা দেখে

ভুল করেছো তো? ও-গাড়িটা আমার নয়। আমার বন্ধুর। ওই উর্দিপরা সোফারও আমার নয়। ধারে পাওয়া। তোমাকে দেবার মতো কাজ আমার হাতে নেই। তোমার জন্যে আমার মন-কেমন করছে। করবেও চন্দন সিং। ক'জন মানুষই বা পৃথিবীতে আমার সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছে!

৪
পিকোলো বিগড়োলো

উত্তরকাশীতে আবার দেখা হয়ে গেল হান্না আর অস্টেনের সঙ্গে। তারা এখনও বসে আছে, হান্নার জ্বর সারেনি। ওদের সঙ্গে দেখি—ঘুচাই এবং পুতুল! পুতুল দৌড়ে এসে বলল, "আমাদের অনেক একস্ট্রা জিওলিন আছে, সঙ্গে নিয়ে যান। ঝরনার জল আর যেন খাবেন না। এদের সবার পেট খারাপ হয়েছে। আমরা তো আজই হৃষীকেশে নেমে যাচ্ছি, আমাদের এত লাগবে না—"

পুতুল, ঘুচাই, সমরেন্দ্র সব কটা সোনার টুকরো। কবিতাদিরা ঐ ট্যুরিস্ট লজেই ছিলেন, অন্য একটা উইংয়ে। গঙ্গোত্রীটা খুব ভালো কেটেছে ওঁদের জন্যে। সমরেন্দ্র বললে, "আমাদের বিড়লা ধর্মশালাতে ঘর বুক করা আছে মা'র নামে, নবনীতাদি আপনি চিঠিটা নিয়ে যান, ২২-২৩ দু'দিন থাকতে পারবেন। কেদার নাথে ঐটেই শ্রেষ্ঠ বাসস্থান।"

পুতুল, ঘুচাই ছুটল কবিতাদিকে ধরতে চিঠি এনে দেবে বলে।

হঠাৎ দেখি পিকোলো এদিকে ভয়ানক বিগড়ে গেছে। সে আর পাহাড় পর্বতে উঠবে না। কালকের মতো যদি বমি হয়? তার গা ঘুলোচ্ছে। তার মাথা ঘুরছে। তার পেটের মধ্যে কেমন-কেমন করছে। তার একটুও ভাল লাগছে না। তার দিম্মার জন্যে মন-কেমন করছে। তাওয়াং-এর জন্যে দুর্ভাবনা হচ্ছে। সেও আজই নেমে যাবে, ঘুচাইদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।

কিন্তু ঘুচাইরা তো এখনও দু'দিন থাকবে হৃষীকেশে। তারপর মুসৌরি যাবে। হরিদ্বারেও থাকবে। তাছাড়া ওদের ট্রেনে বুকিং আছে। তোর বুকিং নেই। তাছাড়া তোকে নিয়ে ওরা ঘুরবে কেন? তোর তো বাসে ঘুরতে আরোই গা ঘুলোবে, পেট শূলোবে। বমি হবে। পর্দাটানা, নিঃশব্দ, ভি আই পি মোটর গাড়িতেই যখন এই কীর্তি তোমার! মা'র কোলে বালিশ পেতে শুয়ে শুয়ে এত মেজাজ গরম! ওখানে তো—?

বেশ, পিকোলো তাহলে হান্না আর অস্টেনের সঙ্গেই নেমে যাবে! ওরা যাচ্ছে এয়ার-কনডিশানড লাকসারি বাসে এখান থেকে দিল্লি পর্যন্ত। দিল্লি গিয়ে

সে মিস্টার মুখার্জীর কাছে চলে যাবে। তাঁর স্ত্রী বন্দনা ওকে ট্রেনে তুলে দেবে। আর পাহাড় নয়। এবার সমতলে ফিরে সে যাবেই।—"কেদার-বদ্রী যাবো না। না—না।"

কী ঝামেলা চেঁচামেচি, গুনগুন, আদর, ধমক, ভোলানি, বকুনি, সোনামণি, পাজিছুঁচো—চল্ তাহলে সবাই মিলে ফিরে যাই। এবম্‌বিধ মিশ্রণের ফলে শেষ পর্যন্ত পিকোলোকে পর পর দু'বোতল ঠাণ্ডা গোল্ড স্পট খাইয়ে বদ্রীনাথ দর্শনে রাজি করানো গেল। ইতিমধ্যে ঘুচাই যে গেছে কবিতাদির কাছ থেকে বিড়লার অনুমতিপত্র নিয়ে আসতে, যাতে আমরা গিয়ে কেদারনাথে আশ্রয় পাই—সেটা বেমালুম ভুল হয়ে গেল। তখন আমার একটাই উদ্দেশ্য, পিকোকে বগলে করে কোনোরকমে রওনা হয়ে পড়া। যাতে আবার কোনো সঙ্গী পেয়ে গিয়ে পিকো বিগড়ে না যায়। একেবারে চারদিন বাদে কেদারে পৌঁছে মনে পড়ল বিড়লার চিঠিটা নেওয়া হয়নি।

৫

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী

গঙ্গোত্রী যাবার সময় আমরা উত্তরকাশী থেকে রওনা হয়ে সোজা হিমালয়ে উঠে যাই। কিন্তু বদ্রীনাথে যাবার জন্যে আবার নেমে যেতে হবে। ধরাসু, টিহরি, শ্রীনগরের পথ দিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছতে হবে। মনে আছে বর্কোট থেকে ব্রহ্মখাল হয়ে ধরাসু আসার পথে পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে কেটে পাহাড়ীরা এমনই ক্ষেত তৈরি করেছে যে, হিমালয় পর্বতের ঢালু গা-টিকে যেন মনে হয় দূর থেকে দেখা বিপুল কারুকার্যখচিত উড়িষ্যার মন্দিরের গা। এমনিই আশ্চর্য গড়ন হয়েছে তার।

ধরাসুর কাছেই প্রথম দেখি নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর। গোব্‌দা ঘাড়ে এক বিঘৎ চওড়া লোহার পাতের বক্‌লস বাঁধা, তাতে কাঁটা লাগানো। বাপ্‌রে! এ আবার কেমন কুকুর? বোঝা গেল এরা পাহারাদার, শীপ-ডগ। ভেড়ার পাল সামলায়। সুরথ সিং জানায় এক-একটি কুকুরের দাম হাটে ৫০০ টাকা মিনিমাম। বেশিও হয় ট্রেনিং থাকলে। 'পুলিসের মতো চৌকি দেয়।' গলার কলারটি কেন লোহার এবং তাতে কাঁটা বসানো কেন? এবং অত চওড়া—পুরো ঘাড় জোড়া কেন? কুকুরটার ব্যথা লাগছে না?—"না না, ওর তলায় পুরু নরম কম্বলের লাইনিং দেওয়া আছে। এ কুকুর বাঘে ভয় পায় না। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু বাঘ যদি একবার ঘাড়টি কষে কামড়ে ধরতে পারে, তাহলেই কুকুর নট নড়ন-

চড়ন, সিধে মরণ। তাই ঘাড়ে ওটা কলার নয়, বর্মই বলা যেতে পারে। বাঘেরই দাঁত ভেঙে যাবে ওটা কামড়াতে গেলে, যায়ও প্রায়ই। চওড়া লোহার বর্ম ওটা, যাতে বাঘ ঘাড় কামড়ে ধরতে না পারে।"

আমার আদরের তাওয়াং তো তিব্বতী, হাউন্ড, সেই তাওয়াং থেকে কোলে করে তাকে এনেছি, অবিকল এই জাতেরই কুকুর। একেবারে এরকম দেখতে। সুরথ সিং জানালো এই কুকুরগুলিও গাঁঢ়োয়ালী নয়, তিব্বতী, মানসসরোবরের ওদিক থেকে তিব্বতীরা নিয়ে আসে বেচতে। খুব সাহসী, খুব ইমানদার কুত্তা। ৫০০ টাকা দাম বটে, কিন্তু লক্ষ টাকার সম্পত্তি আগলায়। মানুষের চেয়ে ঢের ভালো। মেষপালকের ভগবান। এই রকমই একজন নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিল হিমালয়ে।

৬

রুদ্রপ্রয়াগের চটি

শ্রীনগর জায়গাটিও খুব সুন্দর, যদিও সেটা কোনো প্রয়াগ নয় এবং নিচের দিকে বলে অন্যান্য জায়গার তুলনায় একটু গরমও। (তবে টিহরির মতো নয়। টিহরি —গরমে দিল সে সবে শিহরি।) রুদ্রপ্রয়াগে এসে আমরা থামলুম। বেশ ক্লান্ত লাগছে শরীর।

গাড়ি কিছুটা ভুল রাস্তায় চলে গিয়েছিল, তাই রাত্রি হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ চিঠি। কালীকম্বলীওয়ালার ধরমশালার জন্য এক গুচ্ছ আর সরকারী অতিথিশালার জন্য আর এক গুচ্ছ। কালীকম্বলীওয়ালা বহু গাড়ি ও তিনটি টুরিস্ট বাসের যাত্রীতে পরিপূর্ণ। স্থান নেই। রঞ্জন ফিরে এল।

সরকারী অতিথিশালাতেও কোনো ঘর বাকি নেই। তবে ডরমিটরিতে তিনটে সীট মিলতে পারে। মহা উল্লাসে তক্ষুনি তাই-ই বাগিয়ে ফেলি—এরপরে এটাও ফসকে যাবে, তখন কী করব? রুদ্রপ্রয়াগের টুরিস্ট লজটি ঠিক নদীর ধারে। প্রচণ্ড বেগে নদী ধাইছে ঘুরতে ঘুরতে—এটি অলকনন্দা। আর মন্দাকিনী এসে মিশেছে এরই সঙ্গে খানিক দূরে।

আহা, কী সব নাম! অলকনন্দা—মন্দাকিনী! যে-কোনো একটি নামের সঙ্গে দেখা হলেই মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমন একটি নদী চর্মচক্ষে দেখলেই মনে হবে, যাক, এতদিন ধরে বেঁচে থাকা সার্থক। রুদ্রপ্রয়াগে এমন দুটি নদীর সঙ্গম।

যে-ঘরে আমাদের পাশাপাশি তিনটে খাটবিছানা দেওয়া হয়েছে সেই ঘরে

আরো সতেরোটি শয্যা আছে। একটিই আজ শূন্য। বাকি ষোলটিতে বোম্বাই-এর এক বাসভর্তি তীর্থযাত্রী আশ্রয় নিয়েছেন। আমাদের পাশেই একটি পিকোর বয়সী মেয়ে আছে, তার বাবার সঙ্গে সে তীর্থে এসেছে। বাবাকে খুব যত্ন করছে দেখলুম। মেয়েটির নাম কল্পনা দালাল, বি. এ. পড়ছে বম্বেতে।—"বাবাকে তুমি খুব যত্ন করো, দেখে বড় ভালো লাগছে কল্পনা।"

বলতে মেয়েটি চোখ নিচু করে চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, "আমার মা এক মাস হলো হঠাৎ মারা গেছেন। বাবা খুব ভেঙে পড়েছেন।" একটু থেমে বলল, "এই ট্রিপটা বাবার পক্ষে খুব ভালো হলো। আমরা বদ্রীনাথে যাচ্ছি, ব্রহ্ম-শিলার ওপরে মায়ের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করে আসতে চান বাবা।"

বদ্রীনাথ শেষ ধাম। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ হয়ে গেছে কল্পনাদের। বম্বে থেকে কিছু গুজরাটী কিছু মারাঠী ভক্ত এসেছেন তীর্থ করতে। সাধারণত কিন্তু প্রত্যেকটা বাসই বঙ্গসন্তানে ঠাসা। হরিদ্বার থেকেই আসুক আর হৃষীকেশ থেকেই আসুক, দিল্লি থেকেই রওনা হয়ে থাক আর কলকাতা থেকেই—বাসের অর্ধাংশ ভর্তি থাকবেই বাঙালী যাত্রীতে। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীতে তবু প্রচুর উত্তর-প্রদেশী, গাড়োয়ালী, পাঞ্জাবী দেহাতী তীর্থযাত্রী আসে—কিন্তু কেদার-বদ্রী প্রধানত বাঙালীর তীর্থ।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো, দেখি খুব ব্যস্ততা বম্বের যাত্রীদের মধ্যে। ঘরের মধ্যি-খানে একটা টেবিলে দুটো পাত্রে চা আর কফি—যে যা চাইছে তার গেলাসে তাই ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার গেলাসটি নিয়ে গিয়ে বললুম—কফি! শুনে লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর আমাকে অগ্রাহ্য করে অন্যদের পরিবেশনে মন দিল। আমি আরেকবার বললাম কফি! এবার লোকটি নাক কুঁচকে বলল, "বম্বাই বালোকো কফি হ্যায় ইয়ে, পাবলিক কফি থোড়াই হ্যায়!"

ছি ছি! লজ্জা পেয়ে পালাতে পথ পাই না। গ্রুপ ট্র্যাভেলের এই সুবিধা, ভোরবেলা কী সুন্দর চা কফি বিস্কুট দেয়। অগত্যা আমি একজন বেয়ারাকে ডেকে এনে টাকা দিলুম, "দয়া করে বাইরে থেকে তিন পেয়ালা চা এনে দেবেন আমাদের?"

রুদ্রপ্রয়াগের চিতার গল্পেই রুদ্রপ্রয়াগ নামটি আবাল্য পরিচিত। চা খেয়েই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে পড়ি। পথে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি—অনেক অচেনা, স্বপ্নে চেনা নাম। কর্ণপ্রয়াগ (পিণ্ডারগঙ্গা আর অলকনন্দা নদীর মিলন সেখানে), নন্দপ্রয়াগ (অলকনন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম; কোথাও যে 'নন্দাকিনী' নদী আছে, তাই জানি না), চামেলি, পীপলকোটি, যোশীমঠ। এখানে জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্

শংকরাচার্যের মন্দিরটি রাস্তা থেকেই দেখা যায়, কিন্তু অনেকখানি নামতে হয়, আবার তো উঠতে হবে? প্রথমে পীপলকোটিতে এবং তারপর যোশীমঠে অনেক-ক্ষণ গাড়ি থামাতেই হোলো। একমুখো রাস্তা, খোলা আছে কিনা, 'গেট' পাবো কিনা। চা খেলুম। দু'জন সাহেব হিপি প্রায় নেংটি পরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সুখে গঞ্জিকা-সেবন করছেন। এরা স্পষ্টতই পর্বতারোহী নন, ধর্মপাগল বলেও মনে হল না। এঁদের এখানে একটুও মানাচ্ছে না। চায়ের দোকানে দিব্যি থালায় করে ভাত-ডালও দিচ্ছে। আমরা একেবারে বদ্রীনাথ গিয়ে খাবো। পিকোলোটা পথে খেতে চায় না, ওর গা-বমিবমি করে। সর্বত্র তো টিহরির ওয়েটিং রুম নেই।

৭

জড়ায়ে আছে বাধা

এই যে আমি সপরিবারে, স-সংসারে বেড়াচ্ছি, বালতি-মগ-ইকমিক কুকারটাই যা সঙ্গে আনা হয়নি, এর স্বাদ কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না আমার। একা না হলে হিমালয়ের দিকে আসা উচিত নয়। এসেছি বটে, কিন্তু এ-ভাবে আসাটা কেমন যেন এলেবেলে হয়ে যাচ্ছে। মনটা কেবলই বাঁধা থাকছে ঘরে-সংসারে। রঞ্জন কী খেল, পিকো কেন দুধ খেল না, কার কী ওষুধ চাই, কাকে শান্ত করতে হবে, কাকে বকতে হবে—বাপ্‌রে বাপ। এর জন্যে এতদূরে কষ্ট করে না এসে তো হিন্দুস্থান পার্কে থাকলেই হতো। তীর্থে আসা উচিত বোধ হয় হয় একেবারে একা নয়তো সমবয়সীদের সঙ্গে—যেখানে প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব নিজের। তাছাড়া হৃদয়মনও একতারে বাঁধা থাকা উচিত। এমনিতে পিকোর সঙ্গে, রঞ্জনের সঙ্গে আমার খুবই ভাব-ভালোবাসা। ওয়েভ লেংথের ফারাক নেই। অথচ হিমালয়ে এসে দেখছি সব গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। হিমালয় মানুষকে এক করে দেয় যেমন তেমনি একাও করে দেয় তার মাঝে। আমি এখানে এসেও নবনীতা হইনি। মা থেকে গেছি, আর দিদি থেকে গেছি। এই মা আর এই দিদির চাপে নবনীতা মাথা তুলতে পারছে না।

পিকো বেচারারও দোষ নেই। তার সমস্যাটা শারীরিক। পাহাড়ী ঘুরপথে আমারও ছোটবেলায় ভয়ানক কষ্ট হতো। বিয়ের পরেও অনেকদিন এই কষ্ট ছিল। সমানেই 'অ্যাভোমিন' 'ড্রামামিন' খেয়ে গাড়িতে ঘুরেছি। নিজে গাড়িটা চালালে কিন্তু আমার কার-সিকনেস হয় না। অন্যে চালালেই যতো গণ্ডগোল। ১৯৭৫-এ শিলং যেতে গিয়ে আমার, পিকোর, টুম্পার তিনজনেরই এত কষ্ট হয়েছিল যে আর কখনও পাহাড়ে যাবো না ঠিক করেছিলুম। এই বমি-ভাবের যন্ত্রণা যার

হয় না তাকে বোঝানো যাবে না। তাই পিকোর ওপর চটেও উঠতে পারছি না। কি ভাগ্যি এ যাত্রায় আমার কার-সিক্‌নেস হচ্ছে না। সেবার তাওয়াং যেতেও হয়নি। বোধ হয় অন্যান্য রোগের প্রকোপে এ রোগটা সেরেই গেল! সমুদ্রযাত্রাও আমি উপভোগ করতে পারি না এই কারণে। সী-সিক্ হবোই হবো। সেটা 'কুইন এলিজাবেথ টু'-ই হোক আর 'স্ট্র্যাথনেভার'-ই হোক, কি চ্যানেল পারাপারের একটা ইস্টিমারই হোক। আগে বিলেত থেকে প্যারিস যাবার সময়ে আমি তো প্রত্যেকবার স্টিমারে উঠেই ছুটতুম কেবিনের খোঁজে। যাতে শয্যাশ্রয়ী হয়ে পড়তে পারি। মাত্র ১০/১২টা বিছানা কম পয়সায় পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দখল না নিলেই হাতছাড়া!

ইদানীং সে-ঝামেলা মিটেছে হভারক্রাফ্‌ট হয়ে। আন্দামান আমার জাহাজে যেতে ইচ্ছে, অথচ প্রাণে বমির ভয়। তাই পিকোর হঠাৎ সমতলে নেমে যাবার গোঁ-টা আমি বুঝতে পারি।

৮

ত্রিশঙ্কু বাস

যোশীমঠ থেকেই নানারকম হিমালয়ান পর্বত অভিযানগুলি শুরু হয়। এটাকেই প্রথম বেস ক্যাম্প করে। আর ৭/৮ মাইল পরেই গোবিন্দঘাট—চমৎকার গুরদোয়ারা আছে, লগ্-ক্যাবিন আছে সেখানে। সেখান থেকেই হাঁটাপথে যেতে হয় ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স আর হেমকুণ্ড। সুরথ সিং বললে, সে গোবিন্দঘাটে গেছে। গুরদোয়ারায় চমৎকার বিছানা দেয়। শুধু দাড়ি কামানো আর ধূমপান বারণ আছে। আর স্ত্রীলোকের রাত্রিবাস করার জায়গা নেই। অতএব গোবিন্দঘাট গিয়ে সুবিধে হবে না। ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের দিশি নাম নন্দন-কানন—এ বছর সেটি ভ্রমণকারীদের জন্য খোলা নেই। সরকারী কোনো লালফিতের কারণে বন্ধ রয়েছে। হেমকুণ্ডে যেতে হয় বেশ খানিক সময় নিয়ে। ওসব আমাদের এ যাত্রায় হবে না। আমরা অবশ্য আপাতত যোশীমঠ ছেড়েই উপরে উঠতে পারছি না, 'গেট' আর মিলছেই না! কী ব্যাপার? বাসের ড্রাইভারদের সঙ্গে কাদের যেন ঝগড়া হয়েছে। বাস-ড্রাইভাররা হঠাৎ স্ট্রাইক করেছে। পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। তারা বদ্রী থেকেও নামছে না। এখান থেকেও উঠছে না। মিলিটারী পুলিস নানাভাবে গোলমাল মেটাতে চেষ্টা করছে। অবশেষে 'গেট' খুলে দিল প্রাইভেট গাড়িদের ছেড়ে দেবে বলে। জমতে জমতে সকাল থেকে দিব্যি এক প্রমাণ সাইজের গাড়ির মিছিল খাড়া হয়ে গেছে যোশীমঠের গেটের সামনে।

ফাঁড়িতে একটি অল্পবয়সী মিলিটারি পুলিস এসে আমাদের গাড়িতে লিফ্‌ট চাইল। বদ্রীনাথে কিছু পুলিস যাওয়া দরকার। সব গাড়িতে-গাড়িতেই কিছু কিছু যাচ্ছে। পুলিসের এখন কোনো গাড়ি নেই এখানে। সুরথ সিং, রঞ্জনের সঙ্গে পুলিসটি বসল। স্কুল-ফাইনাল পাস করে পুলিসে ঢুকেছে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে। আমাদের সঙ্গে খুব জমে গেল তার। সারা পথই হইহই করতে করতে গেলুম। খানিক বাদে দেখি লাইনের পর লাইন বাস নেমে আসতে শুরু করেছে। স্ট্রাইক ভঙ্গ হয়ে গেছে।

৯

যাত্রীদের মুক্তি

যোশীমঠ থেকে রওনা হয়েই একটি বাস দেখলুম পথের ধারে ত্রিশঙ্কু হয়ে বিপজ্জনক ভাবে শূন্যে খাদের ওপর ঝুলে আছে। বাসে কেউ নেই। পুলিস বললে, ১১ তারিখ থেকেই ওটি ওভাবে আছে। কেউ মরেনি। ওই ঘটনা অ্যাকসিডেণ্ট নয়। ওখানটাতে এক আত্মা আছেন, তিনি এই টানাটানিটা করেন। আগেও অনেকবার ঘটেছে। তবে কাউকে প্রাণে মারেন না। কোনো সাধু-মহাপুরুষের আত্মা হবে। আজ বিশ তারিখ না একুশ তারিখ, এখনও বাসটি কেউ টেনে তোলেনি, এটাই অবাক কাণ্ড। গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাস। সুরথ সিং, সাবধানে চালিও ভাই, কে জানে কোথায় কোন্ আত্মাকে খচিয়ে দেবো। শেষে ঠেলা মেরে দেবে! সব আত্মা তো সাধু-মহাপুরুষের নাও হতে পারে!

১০

অলখ্ নিরঞ্জন

বেশ ক'দিন ধরেই একেবারে হৃষীকেশ থেকেই দেখছিলাম সারাপথ কিছু শিখ তীর্থযাত্রী হেঁটে হেঁটে ছুটে ছুটে চলেছেন। নিরঙ্কারী সর্দারও আছেন একটি একটি গ্রুপের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদার মালা পরা। নীল পাগড়ি বাঁধা, সাদা কামিজ পরনে, কোমরে গেরুয়া, কোমরবন্ধে কৃপাণ ঝুলছে, হাতে পতাকা। যোশীমঠে এসে তাঁরা গোবিন্দঘাটের পথে চলে যাচ্ছেন।

এঁরা পুরনো দিনের নিয়মে তীর্থে বেরিয়েছেন। যাচ্ছেন গোবিন্দঘাটে শিখদের মহাতীর্থে, পুরোটা রাস্তা পদব্রজে। পথে থামতে থামতে, বিশ্রাম নিতে নিতে, দলে দলে চলেছেন। কখনো বা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে গাইতে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আজ তো সমানে একটির পরে একটি দল পেরিয়ে এলাম। বিশ বছরের তরুণ

থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত হাঁটছেন, নিষ্ঠার নির্মল শ্রদ্ধেয় মূর্তি, মন্ত্রপাঠ করতে করতে হাঁটছেন, দ্রুতপায়ে পার হয়ে যাচ্ছেন বাঁকের পর বাঁক। সন্ন্যাসীরা হাঁটছেন। সমস্তটা উত্তরখণ্ড সন্ন্যাসীদেরই দেশ, তাঁদেরই মাতৃভূমি, তাঁরা তো হাঁটবেনই। কিন্তু পদচারী এই শিখ তীর্থযাত্রীরা বোধ হয় গৃহী। অন্তত সন্ন্যাসী কিনা বুঝতে পারিনি, কেননা লক্ষণ জানা নেই আমার। কী দিয়ে চিনব? যোশীমঠের পর থেকে আর শিখ যাত্রীদের দেখা গেল না। ওদের বর্ণময় উপস্থিতির অভাবে হিমালয়ের পথ একটু যে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। জুন মাসে টোরেণ্টয় বসে যখন টিভিতে দেখছি, ভারতে এবং ভারতের বাইরেও শিখদের উন্মত্ত রোষবহ্নি—আমার ওই তীর্থযাত্রীদের মনে পড়ে যাচ্ছিল। মানুষ চায় এক, হয় আর। স্বর্ণ-মন্দিরের ব্যাপারে কেউ জেতেনি। পরাজয় হয়েছে প্রত্যেকের। শহীদ হয়েও ভিন্দ্রানওয়ালে জেতেনি, সার্থককামা হয়েও ইন্দিরা যেতেননি। হিংস্রতা প্রত্যেকটি জয়কে পরাজয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

১১

অন্তঃসলিলা

বদ্রীনাথের পথ খুব চট করেই সুন্দর হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বরফের চাঙড়, বরফের দেওয়াল, বরফের গুহার আবির্ভাব ঘটতে লাগলো পথের ধারে। থামো থামো করতে করতেই গাড়ি পার হয়ে গেল সেই অপূর্ব তুষারগুহা, তার ভেতরে ঠাণ্ডা নীল অন্ধকারে ঝরঝর শব্দে ঝরনা ঝরছে—যেন কোনো ইংরেজি সিনেমার সেট থেকে তুলে আনা। হায় হায় করতে থাকি। নামা হোলো না। ক্যামেরাটা রয়েছে কী করতে? ফটোও তোলা হোলো না। হা-হুতাশের মধ্যে দেখি, আরে! ঠিক আরেকটা অমনি গুহা এখানে, আরো তুষার, আরো মোটা ধারার ঝরনা, আরো জটিল গুহাভ্যন্তরের বরফের জাফ্‌রি-কাটা জালির কাজ।

লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লুম সব্বাই মিলে। ছবি তুললুম, রাঙামুখো সেপাই সুদ্ধু বরফের মধ্যে হুড়যুদ্ধ শুরু করে দিলে। পিকো আবার বরফের চাদর বেয়ে বেয়ে বাঁদরের মতো (কিংবা হিলারী-তেনজিংয়ের মতো) উপরদিকে উঠতে লাগলো। তখনও বাচেন্দ্রি পাল এভারেস্টে চড়েননি, পিকোকে এই এক বছর ট্রেনিং দিলে, সে-ই পেরে যেত বোধহয় কাজটা। পাহাড়ে পায়ে হেঁটে তো চড়তে ওর আপত্তি নেই, পেট্রল চালিত শকটেই যত গণ্ডগোল। অতি কষ্টে ডেকে-ডুকে সুরথ সিং ও সেপাইজী পিকোকে নামালে—সত্যিই এটা একটা গ্লেসিয়ার। এবং পিছল। হঠাৎ পা ফস্‌কে পা পিছলে পড়লে কোথায় পড়বে তার ঠিক নেই। ডানদিকে

পাহাড় আর বাঁদিকে অলকনন্দার খেলাধুলো। গ্লেসিয়ারের বরফের চাদরের তলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে তার ঘননীল উপল উচ্ছল জলরাশি। বরফ ওপরটাতে জমে আছে। তলায় স্বচ্ছ উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ হৃদয়। অর্থাৎ অন্তরসলিলা হিমবাহ। দৃশ্যটি সত্যি অদ্ভুত সুন্দর। পাঁচটি পথের বাঁকে একই জায়গায় একই ভাবে এল এই বিশাল গ্লেসিয়ারটি। যা বোঝা গেল এটাকে কেটে কেটেই বাঁকে বাঁকে পথ তৈরি করা হয়েছে। মিলিটারির তৈরি রাস্তা, সর্বদা সযত্নে প্রস্তুত থাকে ট্যাংক ইত্যাদি বহনের জন্যে। বদ্রীনাথের পরেই ভারতের শেষ গ্রাম মানাগ্রাম। তারপর তিব্বত। সীমান্তসৈন্যের সদা জাগ্রত নজর থাকে এই পথের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে প্রত্যেকবারই আমরা বরফের ঝরনায় খেলাধুলো করলুম। একসময়ে হঠাৎ বদ্রীনাথ এসে পড়ল।

১২
বদরিকাশ্রমে

খোলামেলা উপত্যকা। মস্ত বড়। অনেকখানি খোলা। দূর থেকেই একবার দেখা গেল মন্দির। বিরাট দরজা মন্দিরের। বহুবর্ণ তোরণ। কাছাকাছি আসতেই মাইকে ভজন শোনা গেল। রামভজন। খুব সুন্দর সুর। ভারি চমৎকার একটা ভক্তির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। এই প্রথম দেখছি মাইকের কারণে ভগবদ্‌ভক্তি উবে না গিয়ে মনে আকুলতা আসছে। স্থানমাহাত্ম্য? পুলিস নেমে গেল ফাঁড়িতে। আমরা খোঁজ করতে লাগলুম বাসস্থানের। রুদ্রপ্রয়াগের টুরিস্ট লজে বলেছিল এখানকার টুরিস্ট লজে খোঁজ নিতে। নয়তো দেবলোক হোটেলে। দুটোই ভর্তি। তখন আমি দেবলোকের পার্শ্ববর্তী ঝকঝকে ধর্মশালাটিতে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে খোঁজ নিই। হ্যাঁ, ঘর আছে। না, খরচ লাগে না। বিছানা ভাড়া পাওয়া যায়। খাবারের ব্যবস্থা নেই। সামনেই বাঙালীর হোটেল আছে, সুপ্রিয়া হোটেল, পাঁচ টাকাতে ভাত ডাল চচ্চড়ি দই পাবেন। আর কোনো কথা নয়, এইখানেই থাকবো। জায়গাটি খুব ভালো। এবং সঙ্গে লাগোয়া কলঘর। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম মানে যে মোহনানন্দ মহারাজেরই গুরুদেবের আশ্রম সেটা এতক্ষণে খেয়াল হোলো। এখানেই তার মানে সেই 'যদি হও সুজন' ন'জন বঙ্গসন্তানও উঠবেন। তাঁরাও বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য। আর সেই চারজন ভদ্রলোক আর এক তরুণ সন্ন্যাসী দেওঘরবাসী, তাঁরাও তাই। যমুনোত্রীতে, গঙ্গোত্রীতে, উত্তরকাশীতে তাঁদের দেখা পেয়েছি। বার বার একসঙ্গে নানাভাবে ছুঁড়ে দিয়েছেন ঈশ্বর আমাদের।

ভৈরবঘাঁটিতে উঠে আবিষ্কার করেছিলুম ওঁদের মধ্যে একজনের বয়স সত্তর, পায়ের আথ্রাইটিসে পঙ্গু ছিলেন, আরেক জনের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল উরুর হাড় ভেঙে গেছে, তার জায়গায় লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করানো আছে, তিনিও সত্তরের ঘরে—তাঁরা সবাই খচ্চরে চড়ে যমুনোত্রী, পদব্রজে গঙ্গোত্রী যাত্রা সম্পূর্ণ করেছেন বিনাবিঘ্নে। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে অল্পবয়সীরাও তো? তাই ভৈরবঘাঁটিতে আমরা আগে পৌঁছোলেও, ওঁরাই জীপটা পুরো ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন, আমাদের নিলেন না। আমরা বাসে গেলুম গঙ্গোত্রী। প্রচণ্ড ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফেরার সময়ে আগে আমরাই জিপ ভাড়া করেছিলুম, ৭ জন হয়ে গেছি ততক্ষণে, কবিতাদিদের ৪ জনকে সঙ্গে পেয়ে। ওঁরা অস্থির। জিপ পাচ্ছেন না, কেননা ২০শে গঙ্গাদশেরা, সেদিন ১৯শে লক্ষ লক্ষ মানুষ উঠে আসছে গঙ্গোত্রীতে, প্রচণ্ড ভিড়। ব্যস্ততা। আমরা কষ্ট করেও কিন্তু ওঁদের নিয়েছিলুম আমাদের জীপে। এই প্রথমবার এক জায়গায় এসেও ওঁদের সঙ্গে দেখা হলো না।

সুপ্রিয়া হোটেলের মালিকানি সুপ্রিয়া বলে এক বাঙালী মহিলা স্বয়ং। তাঁর কাজের লোকেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সুপ্রিয়াদির মা তাদের ডেকে তুললেন। দুটি অল্পবয়সী বাঙালী ছেলে। আমাদের গরম ভাত পরিবেশন করলো তারা। সেখানে একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখে চেনা-চেনা লাগলো। খুকু, তোমার নাম কী? নীতা। নীপা-নীতার নীতা কি? তুমি কি নমিতার মেয়ে? বলতেই সে যেমন অবাক, ঠিক তেমনি খুশি। হ্যাঁ। সে নীপার বোন নীতাই। বাবার বন্ধু কানাই (গাঙ্গুলি) কাকাবাবুর নাতনী। গীতা (ঘটক) দিদির বোনঝি। সুপ্রিয়া তার জেঠিমা। যা বুঝলুম এই বাঙালী মহিলা ছেলেকে নিয়ে কলকাতা থেকে সুপ্রিয়া ট্রাভেলস্ এবং এখানে সুপ্রিয়া হোটেলটি চালান। দুটোই ব্যক্তিগত পরিদর্শনে খুবই ভালো চলছে। নীতা পরীক্ষার পর বেড়াতে এসেছে জেঠিমার কাছে। সুপ্রিয়ার মাও এসেছেন। ভালো ভাবেই সার্থক ব্যবসা চালাচ্ছেন। ট্র্যাভেলে ওঁর পুত্রটিও ওঁর সহায়। এ বছর সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া (Pb. D.) খতম করেছে। বাঙালী মহিলাটি এই শীতেও প্রত্যহ স্বয়ং বাজার করে আনেন মানাগ্রাম থেকে। চাল, ডিম, সবজী, ফল কিছুই বাকি থাকে না। খুবই ভালো লাগলো বঙ্গ-মহিলার এই বাণিজ্যপ্রয়াস।

সুপ্রিয়ার হোটেলে ভাত খেয়ে আমরা বেরুই মন্দিরের রাস্তায়। মন্দিরে যাবো পরে। শীত করছে। আমার শালটা তো রঞ্জন যমুনোত্রীর পথে হনুমান-চটিতে হারিয়ে ফেলেছে। একটা শাল কিনে নিতে হবে। শুধু তো বদ্রীই নয়, কেদারেও যাওয়া আছে। সেটা তো চোদ্দ হাজার ফিট। আরও শীত করবে।

বেশ সুন্দর একটা নরম গরম লেডিজ লুধিয়ানা শাল পঞ্চাশ টাকায় কিনে ফেলা হল। চারিদিকে বাজার বসেছে। কত রকমের কুঙ্কুম, সিঁদুর। বদ্রীর লক্ষ্মীর সিঁদুরকৌটো, পুঁতির মালা, তামা-পেতলের আংটির ছড়াছড়ি। আর আছে চারধামের ছবির বই, বদ্রীনাথের পট। এ ছাড়া পবিত্র অলকনন্দার জল বয়ে নিয়ে যাবার ছোট-বড়ো হাজার রকম ঘটি। গঙ্গোত্রীতেও ছিলো। এক যমুনোত্রীটাই যা জংলী ঠাঁই। তবে বদ্রীনাথ প্রায় বদ্যিনাথের মতোই মফঃস্বল শহরের চেহারা নিয়েছে। সরকারী মস্ত ডাকঘর। বেশির ভাগ বাড়িই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির অতিথিনিবাস, ধর্মশালা। একটা সংস্কৃত স্কুলও যতদূর মনে হয় চোখে পড়েছিল। সিনেমা হল ছিল কিনা জানি না। খোঁজ করিনি। পথের লোকেদের হাতে কিন্তু ট্রানজিস্টার ছিল না। সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে মন্দিরের ভজন। দোকানদারও গুনগুন করে গেয়ে উঠছে রামায়ণেরই দু'কলি।

মন্দিরেরই রাস্তায় এইসব বাজার। এবং প্রচুর চায়ের দোকান। দোসা, ইডলি, কফির দোকান আছে, অমলেটও পাওয়া যায় শুনলুম, যদিও সারা উত্তর-খণ্ডেই মাছ-মাংস-ডিম রান্না হত না এককালে। আর উঃ, কী ভিখিরির অত্যাচার! বদ্রীনাথে ভিখিরিদের আর পাণ্ডাদের রাজত্ব। অলকনন্দা পার হয়ে মন্দিরে যেতে হয়। সেতুর দু'ধারে ভিখিরিরা মিছিল করে বসে আছে। পুণ্যার্থী পয়সা ফেলতে ফেলতে যাচ্ছেন। সেতুতে ওঠার খানিক আগে থেকে শুরু হয়ে যায় এই ভিখিরির কিউ। এক একজন ভিখিরি আবার যে-সে ভিখিরি নয়। তাদের ছোটখাটো ব্যবসা আছে। বাটা নিয়ে খুচরো যোগান দেয় তারা যাত্রীদের, এক টাকার খুচরো নিলে ১৫ পয়সা বাটা লাগে। সেইসব খুচরো আবার ভিখিরিদের থালায় ফেরত যায়।

১৩

মুনস্টোন ব্ল্যাকস্টোন

রাস্তায় হাঁটছি, পথের দু'পাশে কত রকমের যে সাধুবাবাদের আস্তানা। কেউ আসল, কেউ নকল। আমি দেখে অত বুঝি না। যাকে ইচ্ছে হয় পয়সা দিই। সবাই পয়সা চায়ও না। কেউ ধুনি জ্বালিয়ে ব্যোম হয়ে, কেউ সামনে মালা, পাথর, আংটি নিয়ে, কেউ শেকড়বাকড় জড়িবুটি নিয়ে বসে আছে। একজন সাধু-বাবা, মাথায় মস্ত রাজপুত পাগড়ী গেরুয়া রঙের, পরনের ধুতিও গেরুয়া, হঠাৎ পিকোকে ডেকে বললে—'ও খুকি, এত রাগ ভালো নয়, রাগ একটু কমাও, একটা মুনস্টোন পরিধান কর। তোমার মনটা খুবই নরম, কিন্তু একটুতেই ভয়ানক চটে

ওঠো।' পিকো তো অবাক! এবং আমি তো ভাবলুম বুঝি এক্ষুনি চটেও উঠবে: 'কে তোমাকে এসব বলতে বলেছে?' কিন্তু চটল না। বদ্রীনাথের পথে সারাক্ষণ থেমে থেমে বরফের গুহায় ঝর্ণায় এত খেলা করে তার মেজাজ বেশ প্রফুল্ল। আর বদ্রীনাথে পৌঁছে চতুর্দিকের সবুজ উপত্যকা, বাতাসে ভজনের সুর, আকাশে নরনারায়ণ, নীলকণ্ঠ শিখরের হিমেল শোভা তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। মজা পেয়ে পিকো দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও। সাধুটি পিকোকে বলল, তোমার মন বড় ছট্‌ফট করে। পড়াশুনোয় মন বসে না। তুমি একটা মুনস্টোন পরে নাও। আর তোমার মা-বেচারীর বড় ঝামেলা, একা-একাই সংসারটা সব দেখতে হয়। তোমার বাবা তো কোনো কাজের নন, সংসার দেখেন না। তোমার মাকে সাহায্য করবে। তোমার মা চাকরি ছাড়াও অন্য যে-কাজটা করেন, সে ব্যবসায় ওঁর খুব উন্নতি হবে। আর তোমার দিদিমার জন্যে একটা ব্ল্যাকস্টোন নিয়ে যাও— শনির দশা চলছে। রঞ্জনকে বললে, তোমার কেবলই নতুন নতুন ব্যবসার ফন্দি, কোনোটাই হবে না। ব্যবসা কোর না, চাকরিই তোমার ভালো।

চিরদিন শুনেই আসছি তীর্থে-তীর্থে এরকম সব সাধুবাবা থাকেন। চোখে না দেখলে যেন মজাটা সম্পূর্ণ হতো না!

সাধুবাবার কেরামতি দেখে আমরা থ'। তিনি স্টোন বেচতে এসব বলছেন কিনা বোঝা গেল না। কেননা পিকোকে তিনি মুনস্টোন ধারণ করতে বললেন, কিন্তু তাঁর নিজের ঝুলিতেই চন্দ্রকান্ত মণি নেই। অন্য কোথাও কিনে নাও, বললেন। এখানে অনেক পাবে। ব্ল্যাকস্টোন কাকে বলে জানি না, একটা কিনলুম মা'র জন্যে। সেটা কলকাতা অবধি এসেছিল কিন্তু মায়ের আঙুলে ওঠেনি। হারিয়ে গেছে। মা বললেন, উনি পাথর ধারণ করেননি কখনও, করবেনও না শেষ বয়েসে। যে যাই বলুক। আমিও ওসব পরিনি। কিন্তু এ কথাও মিথ্যে নয় যে পিকোর স্বভাবে হঠাৎ মনোনিবেশ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সাধুটি বুঝল কী করে? পিকোকে দিল্লি থেকে একটা মুনস্টোনের আংটি এনে দিলুম। সে 'থ্যাংকিউ মা' বলে মিষ্টি হেসে নিলে। তারপর থেকে দেখছি সমানেই আমার ছোট মেয়ে টুম্পা সেটি পরে বেড়াচ্ছে। রঞ্জন এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু চাকরিতে সন্তুষ্ট না থেকে সত্যি সত্যি নানা রকমের ব্যবসার চেষ্টা করতো। উপরির ধান্দায় ঘুরতো দিনরাত। কোনোটাই সফল হতো না সেও ঠিক। রঞ্জন সেই বছরেই ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিল্লিতে ঠিক ডবল মাইনের একটা চাকরি করছে। ওর হাতে বদ্রীর একটা তামা পেতলের আংটি আছে। এখনও ও তো বলে, ওটার জন্যেই সব উন্নতি! পঁচিশ পয়সা দাম ছিল আংটিটার।

পিকোর বাবা কোনো কাজের নয়—একথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না। তিনি প্রচণ্ড কর্মীব্যক্তি, বিশ্রামহীনভাবে দিবারাত্র পড়াশুনা করেন। তবে হ্যাঁ, ঘর সংসার দেখবার মত অতটা সময় তাঁর নেই। সাধুটা কেমন করে কী বলল কে জানে। সাধুর দেশ কোথায়? বললে, জয়পুর। ললাটলিপি পড়তে পারি। কলকাতাতেও যাই মাঝে মাঝে। ডালহাউসিতে (না ব্রেবর্ণ রোড, কোথায় যেন?) ইউ. বি. আই. আছে, তার কাছেই ফুটপাথে বসি। রঞ্জন বলেছিল, খুঁজে বের করবে। আর আমি 'চাকরি ছাড়াও' যেটা করি, সেটা যদি এই কলম ঠেলা হয়, তবে সেটাকে 'ব্যবসা' বলায় পিকোরা খুব মজা পেয়ে গেল।—"কি গো, ব্যবসা কেমন চলছে?" বলে খ্যাপাতে লাগলো। ভুল-ঠিক যাই হোক, সাধুবাবার অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা মন্দিরের আশেপাশে ঘুরে অলকনন্দার উন্মত্ত ঘূর্ণিস্রোতের সৌন্দর্য সন্দর্শন করে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে ফিরলুম।

১৪

দুরাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গারোহণ

মানাগ্রামে যেতে হবে এইবার। বিশ্রাম হয়ে গেছে সুরথ সিংয়ের। একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি ডানলপে চাকরি করেন। আমাদের সঙ্গে তাঁকেও মানাগ্রামে ধরে নিয়ে গেলুম। মানাগ্রামে যেতে হলে অলকনন্দার ওপারে যেতে হয়। চমৎকার দৃশ্য। অনেকখানি গ্লেসিয়ার পার হয়ে যেতে হবে। গাড়ির রাস্তা শেষ। বরফের মধ্যে পায়ে-চলা-পথ রয়েছে। পাথুরে রাস্তা থেকে নেমে সেখান দিয়ে ওপারে গিয়ে নদীর ধার দিয়ে গিয়ে সেতু পার হয়ে যেতে হবে। এদিকে ছোট্ট মিলিটারি ফাঁড়ি মতন আছে একটা। সেখানে গাড়ি রেখে গেলেই হবে। মানগ্রামটি ছবির মতো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তারও পিছনে দেখা যাচ্ছে বসুধারা জলপ্রপাতের দীর্ঘ জলধারা। আমার ওখানেই যাবার ইচ্ছে। মানাগ্রামের পথেই ব্যাসগুহা। যেখানে ব্যাসদেব তপস্যা করেছিলেন।

বসুধারা জলপ্রপাতের কাছে অষ্টবসুরা আট ভাই তপস্যা করেছিলেন। বদ্রীনাথ থেকে 'সত্যপথ যাত্রা' বলে আগেকার দিনে একটি তীর্থযাত্রা ছিল, এখনও যাত্রীরা যায়। সারাদিন লাগে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ছাড়া এ পথে যাত্রা হয় না। বরফ ঢালা রাস্তা দিয়ে, বসুধারা পেরিয়ে, মুকুন্দ গুহা চক্রতীর্থ পেরিয়ে সত্যপথ সরোবর, সেখান থেকে চন্দ্রকুণ্ডে ও সূর্যকুণ্ডে যাওয়া যায়। এ অঞ্চলে পুরোনো মুনি-ঋষিদের বহু গুহা পড়ে আছে। চমৎকার দৃশ্য। একেই নাকি আগে বলতো 'স্বর্গারোহণ'।

এটাই সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার পথ।

মানাগ্রামে গেলে ভীম-পুলটাও দেখা হয়। ভীম নাকি বড় বড় কালো কালো পাথরের চাঁই ফেলে এই প্রাকৃতিক পুল তৈরি করেছিলেন। অলকনন্দার জল এখানে উদ্দাম হয়ে ফুঁসছে।

মানাগ্রামের বাসিন্দারা সবাই উপজাতীয়, তারা তিব্বতের সঙ্গে উলের ব্যবসা করত। চীনযুদ্ধের পর সেসব বন্ধ।

এখন ওদের বোনা কম্বল আর শাল 'খাদি গ্রামোদ্যোগ' কিনে নেয়। ভেড়া পোষা, উল তৈরি, তাঁতে বোনা সবই গ্রামের লোকেরা করে। গ্রাম ছাড়িয়ে আর কয়েক কিলোমিটার গেলে মানা-পাস, মানা-গিরিপথ। সেখানে যেতে দেয় না, মিলিটারি পাস চাই।

যেতে দিলে মানা-গিরিপথ দিয়ে সশরীরে যেখানে যাওয়া যেতো সেটা স্বর্গ নয়, তিব্বত। এবং প্রায়ই তিব্বত থেকে রিফিউজি মানুষ চলে আসে এপারে পালিয়ে চাকরির আশায়, উন্নতির আশায়। আমাদের সঙ্গেই তো দেখা হয়ে গেল একটা ছেলের। বছর ষোলো-সতেরোর ছেলে হবে—আমাদের সঙ্গে জুটে গেল হঠাৎ। "মেমসাব কাম দো! হমকো সাথমে লে চলো! কেবল মোট বইবার কাজটা আমি পারবো না, আর যে কোনো কাজ করতে পারি।"

"কেন? মোট বইতে পারবে না কেন?"

"মোট বইতে বইতে মুখে রক্ত উঠে আমার পিতাজী মরে গেলেন যে—আমার মা বারণ করে দিয়েছে—মোট বইবার কাজ ছাড়া অন্য যে কোনো কাজ—পেট চলে না মেমসাব—" ছেলেটির ফুলের মতো মুখখানি দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। আমার কী ক্ষমতা যে আমি তার পেট চালানোর ব্যবস্থা করবো! যিনি সকলের পেট চালান তিনিই তোমার পেটও চালাবেন বাছা। বদ্রীনাথকে বলো। আমাকে বলে কী হবে? আমার দেশ অনেক দূরে, সেখানে চলে গেলে তোমার মায়ের কাছে ফেরা খুব কঠিন হয়ে যাবে। বরং এখানে চায়ের দোকান-টোকানে কাজ খোঁজ।

১৫
ও চাঁদ

সন্ধ্যে হয়ে গেল ধর্মশালায় ফিরতে। টর্চ যদিও আছে, ঘরে মোমবাতি চাই। এঁরা আলো দেন না। বাজারে যেতে হবে বাতি কিনতে। আলোচনা করছি, হঠাৎ একটি ছেলে উঠে এল। ধর্মশালার সামনে অনেকে বসে আছেন, গল্পসল্প

করছেন, প্রত্যেকেই বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। ছেলেটি এসে বলল—'কী দিদি, মোমবাতি চাই? দাঁড়ান এক মিনিট—বলে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ফিরে এলো একটা মোটা মোমবাতি নিয়ে। ছেলেটার নাম অলোকনাথ। একলাই এসেছে কেদারবদ্রী ঘুরতে। আমাদের দলের সঙ্গে ওকে জুড়ে নিলাম বিনা বাক্য-ব্যয়ে। বাক্য অবিশ্যি বিশেষ ব্যয় করে না ছেলেটি। নদীর ধারে একটা মাদ্রাজী দোকানে দোসা কফি দিয়ে ডিনার সেরে নিলুম। জানলা দিয়ে অলকনন্দার মত্ততা দেখা যাচ্ছে, তার ওধারে মন্দির। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। আজ সব ঘুরে দেখে এসেছি। কাল যাবো বদ্রীনারায়ণ দর্শনে। গলির পর গলি, তাতে ভোগ আর প্রসাদ বিক্রি হচ্ছে। বদ্রীনাথের প্রসাদটি ভারি ভালো। মেওয়া, শুকনো ফল, ডাল, মুড়কির প্রসাদ। নানা রকমের ডালা পাওয়া যায় এখানেও।

পাঁচসিকে থেকে শুরু করে হাজার টাকার পর্যন্ত পুজো আছে। মন্দিরের পাশে একটা নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে বিভিন্ন দামের পুজোর। এটা আমি খেয়াল করিনি—আলোক বললে।—'দূর শালা, ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে ঘোর ব্যবসা ফেঁদেছে ব্যাটারা! পঞ্চাশ টাকার পুজো, পাঁচশো টাকার পুজো, ছি ছি, কী লজ্জা!—'

আমরা আগামীকাল মন্দিরে যাবো, ঐ ৫ টাকার পুজোই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে। ৫ টাকাতে যদি পছন্দসই প্রসাদ না থাকে, তবে অবিশ্যি ১১ টাকাতে উঠতে রাজি আছি।

চমৎকার একটা সর্বগ্রাসী চাঁদ ইতিমধ্যে উঠে পড়লো আকাশে। চাঁদের আলোয় মুহূর্তের মধ্যে একেবারে পালটে গেল বদ্রীনাথ উপত্যকা। ভজনের সুর এখনও বন্ধ হয় নি। সব ঘরদোর যেন এক মিনিটেই তরল হয়ে গেল, যেন কোথাও কোনো ইট কাঠ পাথর নেই—এই যে উত্তুঙ্গ হিমালয়—সেও যেন জমাট কিছু আলো আঁধার মাত্র। একুশ হাজার ফুট উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রজতনিভ নীলকণ্ঠ পর্বত—নর আর নারায়ণ দুই শিখরকে দুই পাশে নিয়ে। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। এদিকে ঘুম পাচ্ছে, শীত করছে। ঘরে এসে ঢালা সতরঞ্চি পাতা। তক্তাপোশে ভাড়া করা নরম পরিচ্ছন্ন লেপ তোশক পেতে, নিজেদের সঙ্গে তো বালিশ আছেই—শুয়ে পড়া গেল। জানলা ঘরের মধ্যে মাত্র একটি। জানলা বন্ধ না করলে শীত,—এদিকে সব বন্ধছন্দ করে আমি ঘুমোতে ভালবাসি না। অতএব একপাল্লা খুলে রাখার ব্যবস্থা। ঘরের মধ্যে ধুমপান করতে রঞ্জনকে আমার কড়া নিষেধ। যেহেতু আমি আর পিকো শুয়ে পড়েছি, রঞ্জনের খাটটাও ওদিকেই—ও ভাবলো চুপিচুপি জানলায় গিয়ে লুকিয়ে একটা

সিগারেট খেয়ে নেবে। ঘরটা বড়। এদিকে শুয়েছি আমরা, অত টের পাবো না, ধোঁয়া যদি ঘরে না ঢোকে। কিন্তু জানলায় দাঁড়িয়েই রঞ্জন সব ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।—'দিদি! দিদি! পিকো! পিকো! ওঠ্! ওঠ্! এদিকে আয়!' হাতের সিগারেট হাতেই রইলো জলজ্যান্ত সাক্ষী হয়ে। আমরা 'কেন? কেন? কী বল, কী হল?' বলে পড়িমরি করে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি জানলায় চাঁদসমেত নীলকণ্ঠ! যে দৃশ্য ছেড়ে কিছুতেই ঘরে আসতে চাইছিলুম না, সেই দৃশ্যই বরং আরো অপরূপ হয়ে দোতলার জানলার ফ্রেমে এসে ধরা দিয়েছে। মাথায় গলায় বেশ করে কম্ফর্টার জড়িয়ে, হি হি করে কেঁপে, ঘরটর সব ঠাণ্ডা করে ফেলে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত জানলা খুলে চন্দ্রমৌলি নীলকণ্ঠকে দর্শন করলুম —যতক্ষণ না চাঁদ ম্রিয়মান হয়ে নীলকণ্ঠর গলা ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল।

১৬

পর্দা-বেপর্দা হ্যায়

সকালবেলায় করিডরে চা-ওলা চলে এল—'চা! চা! চা! গরম চা চাই'—পরিষ্কার বাংলায়। সুপ্রিয়া হোটেলের সেই ছেলেরা। দু'জনেরই কবির নামে নাম। একজন জয়দেব আর একজন কালিদাস। অনেকদিন আছে সুপ্রিয়া ট্র্যাভেলসের সঙ্গে। চা খেয়ে মুখ ধুয়ে জামাকাপড় বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অলোকনাথ এসে গেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদী পেরিয়ে চললুম তপ্তকুণ্ডে। তপ্তকুণ্ডে স্নান করে, ব্রহ্মশিলায় পিতৃতর্পণ করে, বদ্রীনারায়ণ দর্শন করে ব্রেকফাস্ট খাবো।

তপ্তকুণ্ড দু'চারটে আছে। প্রধান যেটা, তার পাশেই একটা কুণ্ড আছে 'মহিলাদের জন্য'। অলোক আর রঞ্জন গেল খোলা তপ্তকুণ্ডে, আমি আর পিকো গেলুম একটু আব্রুর খোঁজে। সেখানে সত্যি ঢাকা জায়গা, পরিচ্ছন্ন, জলও পরিষ্কার। তবে প্রচণ্ড গরম। জলে নামা প্রায় অসম্ভব। এক মোটা পাঞ্জাবিনী ঘাটে বসে বালতি ঘটি নিয়ে স্নান করছেন। উল্টোদিকে ৩।৪টি বালিকা জলে নেমে খেলা করছে। নামল কী করে? আমি একটু একটু তবু জলে নামছি—পিকো তো একটুও না। শেষে ঐ মহিলার ঘটিটা চেয়ে নিয়ে স্নান সারতে হোলো। কিন্তু ভিজে কাপড় বদলাতে গিয়ে দেখি এক মজা। এদিকে ঢাকাঢুকি, কিন্তু একতলা উঁচু দেওয়ালের ওপাশে তিন-চারতলা উঁচু ধর্মশালা। তার প্রতি তলায় বারান্দায় বারান্দায় দর্শকের ভিড়। আমরা হলাম দ্রষ্টব্য। বড়ই লজ্জার ব্যাপার।

কী আর করা যায়। ওদিকে পাঁচিলের ওপর থেকেও উঁকি দিচ্ছে পুণ্যলোভী পুরুষ-মানুষের হাত, কপাল, চক্ষুতারকা। ভক্তের জন্যে ভগবানের কী আশ্চর্য ব্যবস্থা। মন্দিরের ঠিক সামনেই স্বাভাবিক উষ্ণনির্ঝর—একেবারে হিমশীতল অলকনন্দার গা দিয়েই উঠে এসেছে তপ্তকুণ্ড। যমুনোত্রীতেও এই জিনিস দেখেছি। গঙ্গোত্রীতেই কেবল কোনো উষ্ণকুণ্ডের খবর পাই নি। কেদারনাথের পথে শুনেছি গৌরী-কুণ্ডেও এমনি উষ্ণপ্রস্রবণের কুণ্ড। যাত্রীদের ক্লান্তি অপনোদনের কী চমৎকার সুব্যবস্থা!

১৭

প্রবঞ্চক, সাবধান!

স্নান সেরে আমি অলোক আর রঞ্জন চললুম ব্রহ্মকপালী শিলার খোঁজে, পিতৃতর্পণ করবো। পিকো লাফাতে লাফাতে ক্যামেরা নিয়ে মন্দিরে গেল। পিণ্ডদানের নানা বিচিত্র ব্যবস্থা। হরেক রকম দামের পিণ্ড দিতে পারেন। কেবল আপনার পিতৃকুলের কার কত টাকা পর্যন্ত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হতে পারে, হিসেব করে নিন। চাল, কলা, পৈতে, হত্তুকি—কী সব যেন আছে একটা পাতায় মোড়া। গঙ্গাতুলসীও আছে দেখলুম। গঙ্গার ধারে সারি সারি পাণ্ডারা বসে শ্রাদ্ধতর্পণ করাচ্ছেন যাত্রীদের। প্রচুর দেহাতি মানুষ দেখলুম এখানে।

সকালবেলায় আমাদের ঘরে একজন দীর্ঘ গৌরবর্ণ সুদর্শন পুরুতঠাকুর এসে আমাকে একটা কার্ড দিয়ে গেছেন। শ্রীযুত ভট্ট, তিনি বাঙালীদের পাণ্ডা। অবশ্য পাণ্ডা শব্দটা তাঁর পছন্দ নয়, কার্ডে লেখা আছে তীর্থগুরু (ব্র্যাকেটে পাণ্ডা)। তিন পুরুষের নাম আছে কার্ডে। এবং ব্রদ্রীনাথের, দেবপ্রয়াগের, হরিদ্বারের ও কলকাতার চারটি ঠিকানা আছে। এছাড়া ছাপা আছে, তাঁরা নিম্নলিখিত আশ্রমের ও ব্যক্তির তীর্থগুরু। ভারত সেবাশ্রম, দেবসংঘ, গৌড়ীয় মঠ, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম, শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ। এতগুলি নাম? প্রায় সব ক'টি বাঙালী ধর্মগুরুর ও আশ্রমেরই ভার নিয়ে বসে আছেন যে এই ভট্ট পরিবার! বেশ, আমাদেরও তবে তর্পণ করিয়ে দেবেন। কার্ডের নিচে বড় হরফে ছাপানো আছে, 'বিঃ দ্রঃ—প্রবঞ্চক হইতে সাবধান থাকিবেন।'

স্নান সেরে উঠে যেখানে ভট্টবাবুর দেখা পাবার কথা ছিল সেখানে তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি কোনো শাঁসালো মক্কেল পেয়ে গেছেন নিশ্চয়। মনে বেশ হালকা বোধ করলুম। নিজের মনে ব্রহ্মশিলায় গিয়ে এবার জলে পিণ্ড অর্পণ করি। পিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে আমিও পড়ে যাচ্ছিলুম জলে। 'যা চেয়েছো

তার কিছু বেশি দিব' বলে পিণ্ডের সঙ্গে পিণ্ডদাতাও সশরীরে গিয়ে স্বর্গে উপস্থিত হলে কি জানি পিতা আর শ্বশুরমশাইয়ের কেমন লাগতো !

রঞ্জন খপাৎ করে ধরে ফেলে সেটা হতে দিলে না। অলোকও একজন পাণ্ডা পাকড়ে বাবার শ্রাদ্ধশান্তি করে নিলে। মাত্র বছরখানেক হলো সে পিতৃহীন হয়েছে, এখনও গুরুদশা চলছে। হঠাৎ মনে পড়ল সেই কল্পনা দালালের কথা। তার মায়ের শ্রাদ্ধ এই ব্রহ্মশিলায় করবার ইচ্ছে ছিল তার বাবার।

১৮

পথের শেষ কোথায়

কী আশ্চর্যই লাগে আমাদের এই পিণ্ডদানের রীতিটাকে আমার। সব সুন্দর জায়গাতেই আগে আমরা ঈশ্বরের পীঠস্থানে রচনা করি, আর ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াতে গেলে আমরা একবার শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে নিই আমাদের জন্মের কারণকে। জন্মদানের জন্য। এই যে এতদূরে আজ এসে পৌঁছেছি, এই যাত্রা শুরু করে দেওয়ার জন্য পিতৃপুরুষকে ধন্যবাদ দিয়ে তবে আমাদের পুণ্য অর্জন হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যে চট্ করে নেমকহারামির সুযোগ নেই। পিণ্ডদান, পূর্বপুরুষকে তৃষ্ণায় জলদান এই যে অচ্ছেদ্য যুগযুগান্তের মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ, এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা আত্মিক সৌন্দর্য আছে। নম্রতার, কৃতজ্ঞতার একটা শোভা আছে। মস্তকমুণ্ডনে যে বিনয়, আত্মসুখ-বিসর্জনের যে বিমল প্রভা আছে, অশৌচ পালনের মধ্যে যে হাহাকার আর অভাববোধের প্রকট অনুভব—সেগুলি আধুনিকতার নাম করে চিন্তাহীন কুলোর বাতাসে অযথা উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। পরে আর ডেকেও আনতে পারব না ফিরিয়ে। রিচুয়ালভক্ত আমি এমনিতে নই। কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কিত রিচুয়ালগুলি আমাকে আন্তরিক স্পর্শ করে। পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা ভগবান খুবই চালু ব্যক্তি, দ্রুততম ইলেকট্রনিক ডিভাইসের চেয়েও দ্রুত তিনি মনের কথা পড়ে নেন। পুজোপাঠের কোনো দরকার হয় না। প্রাণে ভক্তি থাকলেই হলো। সেটা ওঁর কম্পিউটারে নোট করা হয়ে যায়, এড়ায় না কখনো।

একদিক থেকে দেখলে সত্যি এইসব পিণ্ডদান-টানের মানে নেই। কেননা যে মানুষ মরে যায়, সে মানুষ ভাত খায় না, জলপানও করে না। তবে কেন ভালো লাগা ? যে মানুষটি বেঁচে আছে, যে মরে যায় নি, কিন্তু একদিন মরে যাবে, যার সব কর্মকাণ্ডের শেষেই স্থির দাঁড়িয়ে আছে সেই অসীম ধৈর্যশীল পাওনাদার—মৃত্যু, এইসব তুচ্ছ অনুষ্ঠান তারই জন্যে। যে পিণ্ড দান করে, তারই তো

তর্পণ, তারই তৃপ্তিসাধন। মৃতব্যক্তি নিমিত্ত মাত্র। যাকে পিণ্ড দেওয়া হয়, সে এসবের পরোয়াই করে না।

পিতাকে পিণ্ডদান করে অলোকই তার পিতৃদায় উদ্ধার করলো। তার পিতার এতে কোনোই দায় ছিলো না। অলোকই মনে মনে বাঁচিয়ে তুললো তার মৃত বাবাকে, যিনি কোনোদিনই সশরীরে এই অপরূপ অলকনন্দার রূপরাশি দেখতে আসবেন না। পিণ্ডদানের ব্যবস্থাটা মানুষকে কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেয়, নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার শিক্ষা দেয়। বদলে কিছুই পাওয়া যাবে না জেনেও কিছু দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পিণ্ডদান করবে না। তারা যুক্তিবির্বর্ণ একচক্ষু জীবন-যাপন করবে। আমার সমবয়স্ক বন্ধুরাই তো আর তর্পণ করে না। পিতৃদায়ে মস্তকমুণ্ডন কর না। অশৌচ পালে না। একটা পুরো মানুষ জন্মের মতো চলে যায়, অথচ জীবন বাইরে থেকে এমনভাবে চলতে থাকে, যেন কিছুই ঘটেনি। সবই যেমন ছিল তেমনি আছে। যেন জন্মদাতা, কি জন্মদাত্রীকে আর দেখতে-না-পাওয়ার মত চিরজীবনের ঘটনাটা কোনো ঘটনাই নয়।

১৯

জয় বাবা বদরী বিশালজীউকি !

বদ্রীনারায়ণের মন্দিরেও অনেকগুলো তোরণ পেরিয়ে ঢুকতে হয়। অনেক কষ্টে নানা লাফালাফি করেও খুব ভালোভাবে মনের মতো করে হয়নি বদ্রীনারায়ণের দর্শন পাওয়া। বাইরে যেসব বদ্রীনারায়ণের পট দেখেছি, ভিতরের দৃশ্য তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি নি। ফুলে, জরিতে, মালায়, চাদরে এতই জবরজঙ্গ ব্যাপার, কিছুই প্রায় দেখতে-বুঝতে পারি নি। এর ভেতরেও স্পেশাল দর্শন-টর্শন আছে, স্পেশাল আরতির টিকিট আছে, যে যত টাকার পুজো দেবে সে ততক্ষণ বেশি ভেতরে থাকতে পারবে এরকমও একটা ব্যবস্থা থাকতেও পারে বলে মনে হোলো। কেবলই পাণ্ডারা মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন দর্শকদের, মোটে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না। ভালো করে দেখবো কী ? মন ভরে নি। শুনেছিলুম বংশানুক্রমে কেদার-বদ্রীর পুরোহিতরা সুদূর কেরালার নাম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণ। দেখে বুঝলাম সব পুরুত বামুনেরই এক স্বভাব।

যেমন কালীঘাটের, যেমন বিশ্বনাথের, তেমন জগন্নাথের। সব্বাই সমান।

ভিখিরিদের এই প্রবল প্রতাপ সত্যি দেখবার মত। সবাই থালাবাটি পেতে বসে আছেন, যাত্রীরা সেধে ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছেন। নির্বিকার ভিখিরি মহারাজেরা

সদয় হয়ে তা গ্রহণ করে, জয়ধ্বনি দিচ্ছেন বদরী বিশালজীউয়ের। হঠাৎ লক্ষ্য করি ভিখিরিদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে! ব্যাপার কী? অলকনন্দার ওপরে সেতুর একধারে ভিখিরির লাইন। দূর থেকে দেখি এক পৃথুলা মারবাড়বাসিনী আসছেন, তাঁর সামনে পিছনে দুই ভৃত্য দুইটি ঝুড়ি বয়ে আনছে। একটা ঝুড়িতে বিপুলকায় লাড্ডু, আরেক ঝুড়িতে বিশাল অমৃতী জিলেইবি। মহিলা কষ্ট করে কোমর নিচু করে ভিখিরিদের পাত্রে ঠকাঠক্ লাড্ডু-জিলেইবি ছুঁড়তে ছুঁড়তে, পুণ্য লুফতে লুফতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অলোক, রঞ্জন, পিকোলো, কেউই এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নেই। অতএব আমি চট্ করে ভিখিরিদের পাশে বসে পড়ি। সঙ্গে পাত্র নেই কিন্তু স্নান করে আসছি, তোয়ালে আছে। পথে সেটি বিছিয়ে বসে থাকি। আসবে, আমার টার্ন আসবে। ঠক্ করে লাড্ডু, ঠাস করে জিলেইবি, পড়বে! উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকি।

'মা! মা! কী হচ্ছেটা কী?' লৌহনিগড়ের মতো মুঠোয় আমার প্রার্থী হাত চেপে ধরেছে, ও কে? মেয়ে পুলিস! আবার কে?—'ওঠো বলছি, শিগগির ওঠো—পাগল করে ছাড়বে আমাকে—'

—'তুই বসে পড়ে যা পিকো, গামছাটা পেতে নে—'

—'অনেস্টলি, মা! তুমি একটা আস্ত উন্মাদ! যদি কেউ চিনে ফেলে? ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো—'

—'আহা, চেয়ে ছাখ্ই না কী সাইজ—'

—'কত লাড্ডু খাবে, মা? আমি তোমাকে কিনে দিচ্ছি চলো—'

—'কিনে কোথায় পাবি ও জিনিস? দেখছিস না অর্ডারি মাল? আসলি ঘিউ-কা? কী সুগন্ধ!'

—'মা, প্লীজ কথা শোন, আমার খুব লজ্জা করছে—এই, এই ভিখিরিদের সঙ্গে—ছি ছি—'

—'আমরা তো সবাই ভিখিরি রে, ভগবানের কাছে তীর্থস্থানে কেভিখিরি নয়? ঐ যে মোটা মহিলা লাড্ডু দান করছেন, উনিও পুণ্যের ভিখিরি—'

—'লম্বা লম্বা কথা রাখো, লোভী কোথাকার। তুমি একজন গরিব ভিখিরির শেয়ারটা খেয়ে নিতে চাইছো—বুঝেছো সেটা?' পিকোর এই কথাটা আমার মাথায় ঠং করে বুদ্ধির হাঁড়িতে একটা ঘা দিলে!

—'তুমি তো কিনেই খেতে পারো মা? তুমি কেন আরেকটা ভিখিরির খাবার কেড়ে খাবে?' এ কথাটা খুবই সত্যি। আমি তো মজা করবার জন্যে খেতে বসেছিলুম, অন্যের ভাগ কেড়ে খাচ্ছি সেটা খেয়াল হয়নি। কত জ্ঞানী

গুণী লক্ষ্মী মেয়ে আমার, সেটা ভাগ্যিস খেয়াল করিয়ে দিলে! নইলে তো!— হাঁটু-টাটু ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি অন্য প্রান্তে আমার দেখাদেখি রঞ্জনও বসে গেছে। পিকো চোখ রাঙাতেই উঠে পড়ল।

—'উঃ, পারি না বাবা এদের নিয়ে! যেমন দিদি, তেমনি ভাই!' বলে গজ গজ করতে করতে পিকো শক্ত করে আমার কব্জী পাকড়ে নিয়ে চলল।

সেতু পেরিয়েই দেখি কল্যাণী দালাল। ছুটে এল কাছে—হ্যাঁ, হয়ে গেছে তার মাতৃতর্পণ। তার বাবা তৃপ্ত। তৃপ্যন্তু সর্বদেবতাঃ।

২০

নন্দাকিনী, মন্দাকিনী

বেলা দেড়টার 'গেট' ধরে রওনা হলুম। বদ্রীনাথ থেকে আবার সেই আশ্চর্য সুন্দর ঝরনা, গুহা, হিমবাহ, আর অন্তঃসলিলা অলকনন্দার খেলা দেখতে দেখতে নেমে এলুম। সঙ্গে অলোকনাথ যোগ হয়েছে, সেও কেদারে যাবে আমাদের সঙ্গে। এটা উল্টোযাত্রা হয়ে গেছে। সবাই আগে কেদারে যান, পরে বদ্রীনাথে। অলোক আগেই বদ্রী চলে এসেছে আমাদের মত। এখন আর সঙ্গী পাচ্ছে না। বদ্রী থেকে সবাই হরিদ্বারের যাত্রী। আমরা আজ সন্ধ্যার মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছোতে চাই যাতে কালই গৌরীকুণ্ডে যাওয়া যায়। পারলে কালই কেদারনাথ পর্যন্তও পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছে। রঞ্জনের হয়তো সাধ্য হবে না। এদিকে পঞ্চপ্রয়াগের পথেই যাবো। কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ দেখেও থামবো না?

মনে মনে গজগজ করতে করতে যাই। রঞ্জন আপিস কামাই করে এসেছে, কোনো ছুটি নাকি পাওনা নেই ওর (তবে এলি কেন?), আবার পিকোলোর তো কলেজ। খুলেই পার্ট ওয়ান পরীক্ষা (তুই-ই বা এলি কেন?)। অতএব যখন যেখানে খুশি থামতে থামতে যাওয়া যাবে না। এই ২০/২১ তারিখেই আমাদের কলকাতায় ফেরবার কথা ছিল। মা ওদিকে ভাবতে শুরু করে দেবেন। আজ ২২শে, আমরা এসে অবধি মা'র কোনো চিঠি পাইনি, টেলিফোনও করা যায়নি। আজ রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে ফোনের চেষ্টাও করতে হবে। কে কেমন আছে কে জানে? পিকোলো আর আমি দুজনেই বাইরে বলে মা'র জন্যে ভাবনা। অতএব—'পশ্চাতে রেখেছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে!'

রঞ্জন আর অলোক সামনে। পিকো যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছে আমার কোলে। আমি জানলা দিয়ে চেয়ে আছি। তিনধাম হয়ে গেল। বদ্রীনাথ ছেড়ে নেমে যাচ্ছি। আবার যোশীমঠে চা। তারপর বিকেলের ম্লান মায়াবী আলোয়

অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল রঙিন আকাশের পটভূমিতে একের পর এক প্রয়াগ আবিভূত হতে থাকে। চোখে, চোখ থেকে হৃদয়ে। নন্দপ্রয়াগটা এমন কিছু নয়। সরকারী গাইডের মতে সঙ্গমটি হচ্ছে নন্দাকিনী আর অলকনন্দার। তাই নাম নন্দপ্রয়াগ। এদিকে আমার একটা বহু পুরোনো 'গাইড বহি' আছে। সেখানে "খাওয়ার খরচ জনপিছু প্রতিদিন ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ পড়িয়া যায়। কুলীদের মজুরী ছাড়া প্রতিদিন দুই পয়সা করিয়া ছোলা খাওয়ার জন্য দিতে হয় এবং সমস্ত তীর্থে কুলীদের খিচুড়ী খাইতে দিতে হয়। পাহাড়ী ঘোড়ার ভাড়া ৷৷০ হিসাবে প্রতি মাইল··· যাত্রীকে নিজেই ডাণ্ডী কিনিয়া লইতে হয়···" ইত্যাদি লেখা আছে। সেই অপূর্ব গাইড বইতে বলছে নন্দপ্রয়াগের সঙ্গমটি মন্দাকিনী আর অলকনন্দারই এবং নন্দ নামে এক রাজা এই প্রয়াগে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই থেকে ওটার নাম নন্দপ্রয়াগ। আমার এটাই বেশি পছন্দ, যেহেতু নন্দাকিনী নামে কোনো নদীর উল্লেখ আগে দেখিনি। নন্দপ্রয়াগ থেকে কর্ণপ্রয়াগ যাবার রাস্তাটা খুব সুন্দর, বড্ড সুন্দর, কি রকম একলা করে দিতে পারে।

ঐ গোধূলিবেলার মন-খারাপ-করা আলো পাহাড়ের গায়ে লেগে রইলো বহুক্ষণ, গলে গলে নদীর ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এখানে নদী বেশ চওড়া, মাঝে মাঝেই চড়া পড়েছে, নুড়ি পাথরের ঘাস ঝোপের চর জেগেছে। নদীর ওপারে পাহাড়, এপারে পাহাড়। ওপারে মানুষজনের চিহ্ন নেই, কোনো পথরেখা দেখা যায় না, মন্দির না, গ্রাম না, ক্ষেত না। এপারে রাজপথ, গ্রাম, দোকানপাট। ওপারে কি তবে সন্ন্যাসীদের রাজ্যপাট? ওপারে কি বাঘ-ভাল্লুক? জিম করবেট? এই তো জিম করবেটের পাড়া। রুদ্রপ্রয়াগে বিরাট বিজ্ঞপ্তি আছে করবেট ন্যাশনাল পার্কের। এপার দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সুরথ সিংয়ের গাড়ি।

২১

মুকুলগুলি ঝরে

গাড়িতে যেন আমি ছাড়া কেউ নেই, সুরথ সিংও না।

এত ভালো লাগার মতো জায়গা, অথচ কেন যেন সম্পূর্ণভাবে আমার করে নিতে পারছি না। কী যেন নেই। কী থাকা উচিত ছিল? কে থাকলে ভালো হতো?

কেমব্রিজের ছাত্রজীবনে আমার পশ্চিম পাকিস্তানী বান্ধবী শিরিন কাদেরকে কিছু অফার করার উপায় ছিল না। হরিণ-নয়না সুন্দরী শিরিন সব কথার উত্তরে সবিনয়ে মাথা নেড়ে বলবে—"মেরে পাস সব কুছ হ্যায়"। আমার শুনে মনে হত,

কী অসভ্য রে বাবা? কী দম্ভ? পরে টের পেলুম লক্ষ্ণৌ, লাহোরের ভদ্রতার ধরনই ওইটে, কিছু চাই না, আমার কাছে আছে। সব আছে। যাহা কিছু সব, আছে আছে আছে।

এই রাস্তা যেন তেমনি ভাষায় কথা বলছে। বলছে, ওর কাছে সবকিছু আছে। ওর কিছু চাই না। এমন কি দর্শকও না। কিন্তু আমার কেন তাতে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না? অস্পষ্ট অভাববোধে মন-কেমন করছে কেন আমার? নিজেকে অপূর্ণ মনে হচ্ছে। কিন্তু কার জন্যে অপূর্ণতা?

কে সঙ্গে থাকলে এই আকাশ বাতাস নদী পাহাড় ঝম্‌ঝম্ করে বেজে উঠতো পূর্ণতায়? তাছাড়া সত্যিই তো আমি নিঃসঙ্গ নই। আমরা এখনও পাঁচজন গাড়িতে। সঙ্গে আছে আমার প্রথম সন্তান যাকে জন্ম দেওয়ার কর্মটি আজ পর্যন্ত আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা। সঙ্গে আছে অনুজোপম রঞ্জন, সেও অপত্য স্নেহেরই পাত্র। প্রীতির অভাব নেই। সঙ্গে বন্ধনের অভাব তো নেই-ই বরং একটু যেন বেশিই। তবে কেন এত অস্থির এত চঞ্চল লাগছে আমার? এই অরণ্য-পর্বত, এই নদী-প্রপাত, এই মেঘ-আকাশ, এদের মধ্যে এমন চিৎকার করে উঠছে কেন আমার একাকিত্ব? একে একে বুকের মধ্যে মিছিল করে গেল খুব ঘনিষ্ঠ চেনা মুখের সারি—না, কেউ না, কেউ না, কেউ না। কাউকে চাই না।

উত্তরকাশীতে মার্কিন মেয়ে অস্টেন বলেছিল, I want to be first in someone's life. আমিও বোধ হয় তাই চাইছি। কারুর জীবনের প্রথম নামটি হয়ে উঠতে চাই। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম নামটি কার? একদিন উত্তর খুব সহজ ছিল,—মা। তারপর উত্তর বদলে গেল কিন্তু সহজেই রইল, স্বামী।

তারপর আরেকবার বদল হলো, কিন্তু এবারও কোনো বয়সের প্রশ্ন ছিল না, কঠিন কোনো সমস্যা হলো না, জীবনের প্রথমতম শব্দটি সন্তান।

কিন্তু এখন, যার যার জীবন তার তার নিজস্ব অঙ্গনে। জমানা বদল গয়া। আমার সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার জীবনে প্রথম মানুষটির নাম হয়তো 'আমি'। তাই একাকিত্ব। তাই অপূর্ণতা। কাকে দেব এই সন্ধ্যার আকাশে বিলোল অলক-নন্দা? কার হাতে দেব?

যার জীবনে মানুষ নয়, ঈশ্বরই প্রথম তার কোনো অপূর্ণতা নেই। সেই সুখী। কারুর জীবন প্রথমতম হয়ে ওঠার তৃষ্ণা তাকে কুরে কুরে খায় না।

যত ঝামেলা এই পালকবিহীন দু'পেয়ে প্রাণীটির বেলায়। কে নেবে আমার এই মুগ্ধতার ভাগ? কাকে দেব এই নন্দপ্রয়াগের স্তব্ধ সৌন্দর্য? তোমার একার সম্পত্তি বলে মেনে নিতেই বা অসুবিধা কিসে? তাঁর অনেক আছে, তিনি তো

তোমাকে এটুকু দিতেই পারেন। সবকিছু ভাগাভাগি করে নিতে হবে কেন মানুষেরই সঙ্গে? নবনীতা, বুকের পাত্রটি বাড়াও, বড়াও। বুকের ভেতর এই অলৌকিক আকাশ-বাতাস, অরণ্য-পর্বত, নদী-নির্ঝর, সব ভরে নাও, সব সঙ্গে নিয়ে নাও। ভাগ দেবার সময় অনেক পড়ে আছে।

২২
চিরসখা হে

নন্দপ্রয়াগের কাছে সোমলা ডাকবাংলো আছে—কিন্তু থামা গেল না। কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডারনদ আর অলকনন্দার মিলনক্ষেত্র। পিণ্ডার হিমবাহের যত নাম, নদীটি তত কিছু নয়। এই প্রয়াগে কর্ণ যজ্ঞ করেছিলেন। কর্ণপ্রয়াগ থেকে পথ নেমে চলল রুদ্রপ্রয়াগের দিকে। কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গম ছাড়িয়েই অলকনন্দার ওপারে দেখতে পেলুম বিশাল চতুষ্কোণ এক গুহামুখ—তার সামনেই দু'থাক সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর জলে। অথচ কোথাও কোনো রাস্তা চোখে পড়ল না। কোনো গরু ভেড়াও চরছে না। আশ্চর্য হয়ে গুহাটির কথা ভাবছি—নিশ্চয় ওখানে বহু যুগ আগে মানুষের বাস ছিল, সন্ন্যাসীর আস্তানা ছিল, নইলে ঐ সিঁড়ি দু'থাক কে তৈরী করলে? কেনই বা? ওই রকম একটি গুহায় অমন অলকনন্দার তীরে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের তপস্যায় সিদ্ধি কেন হবে না? কিন্তু এখন ও গুহা মানুষের কাজে লাগে না, কোনো পথ থাকতো তাহলে। ভাবতে ভাবতেই আরেকটি মস্তবড় গুহা দেখা গেল ওপারে। তার সামনে আবার একটি বিশাল মহীরুহের তলাটা বেদী করে বাঁধানো। এখানে সিঁড়ি নেই কিন্তু নদীর খুব কাছে গুহা থেকেই উপলবিস্তীর্ণ এক সৈকত গড়িয়ে নেমে এসেছে অলকনন্দার স্রোতের মধ্যে। যেন 'প্রাইভেট বীচ' একটি। এখানেও কোনো রাস্তা নেই। একটু দূরে একটা পায়ে চলার পথের রেখা উঁকি দিল, কিন্তু ধরা দিল না।

এই গুহা দুটি আমার মনের মধ্যে একটা গভীর নাড়া দিয়ে গেল। মুনিঋষি-দের নিষ্ঠাবান সহজ জীবনের স্মৃতি বহন করে পড়ে আছে গুহা দুটো। দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে উঠলো। মনে হল ওগুলো আমাকে ডাকছে। আমি কী চাই? সত্যি সত্যি? কেন বাঁচি? কেন আমি চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি না? কিসের জন্য লিখি? কেন সংসারে থাকি? কেন আমার কোনো কাজই শেষ হয় না? মনের মতো হয় না কোনো ক্লাসটাই, মন ভরে না কোনো লেখা লিখেই—কেন আমি কিছুই ধরে রাখতে পারি না—হাতে পেয়েও মুঠো বন্ধ করি না, ছেড়ে দিই, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে যেতে দিই, ধরে রাখতে

পারি না কিছুই—না বন্ধুত্ব, না প্রণয়, না সন্তান, না সংসার, না শিল্প, না কর্ম, না প্রতিষ্ঠা, না ধর্ম, না বোধ, না বোধি—কী চাই তাই-ই বুঝি না। সবই আছে, অথচ কিছুই আমার নয়, কোনো কিছুতেই আমি 'আমার' বলে অধিকার করতে শিখি নি—বুকের মধ্যে সর্বক্ষণ ঘণ্টা বাজছে নেই নেই নেই—কী নেই? কী পেলে এই সর্বগ্রাসী 'নেই' 'আছে' হবে? কী এনে দিলে মিটবে তোমার বায়না? ওই শূন্য বিশাল দুটি গুহার মধ্যে যেন আছে সব উত্তর। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলেই হলো।

নইলে কিসের চার-ধাম ভ্রমণ? হলো না, হলো না। কিছুই দেখা হলো না। এমন সময়ে আকাশ আরো লাল করে সূর্যদেব ডুবে গেলেন হিমালয় পর্বতের আড়ালে। এক বছরের জন্যে কি সন্ন্যাস নেওয়া যায় না? দেখে যেতেই হবে এই বিশ্বসংসারটা কেমন। এসে অবধি তো শুধু ঘরসংসারটাই দেখা হলো।

সূর্য ডুবে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকেই এক আবিল বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আবার আমার মনে সেই একাধিকত্বের গুঞ্জন উঠছে—তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ যেও না মন কারো দ্বারে। বলি, ব্যাপারটা কী? নবনীতা? কী চাও?

নির্ভর চাই। আমি চাই আমায় কেউ আশ্রয় দিক। আজ কোথায় থাকবো, কী খাবো সেটা অন্য কেউ স্থির করে দিক। আমি একটু আড়াল চাই। একজন কেউ আমার কথা ভাবুক। কে আছে? এমনজন কে আছে? কেউ না। কেউ নেই। কেউ ভাবে না।

কেউ ভাবে না? কেউ নেই? এতবড় বেইমান? ছি ছি, নবনীতা!

কে তোমার জীবনের বোঝাটা বইছে? তুমি নিজে? তুমি কি এতই শক্তিমান? তোমার কি এমনভাবে রাজার হালে চারধাম পরিব্রাজন করার কথা? অর্থবল, লোকবল, স্বাস্থ্য—কোন্‌টা আছে তোমার? তবুও তো ঘটছে? কোনো চোরা-পথে নয়, চেয়ে-চিন্তে নয়। তবু বলবে তোমার ভার কেউ নেয় না? তুমি নিরাশ্রয়? নির্বান্ধব? নিঃসঙ্গ? তুমি আসলে একটি বেইমান। যার হাত না বাড়াতেই বন্ধু, সেই বলছে, আমার কেউ নেই। আমি জগতে একা। তুমি একটি মিথ্যাবাদী।

নিজেই মনে মনে খুব লজ্জা পেয়ে গেলুম। আকাশ অন্ধকার, একটি দুটি তারা ফুটছে। গাড়ি ছুটেছে রুদ্রপ্রয়াগের পথে! চিরসখা হে—মার্জনা করো।

২৩

দু'দলে দেখা হলো মধুযামিনী রে !

আমাদের রাত্রি হয়ে গেল রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছোতে। আবার সেই টুরিস্ট লজে গাঢ়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের আতিথ্য নিলুম। এবারে অন্য একটি ডরমিটরিতে ঠাঁই মিলেছে। সেবারেরটা তুলনায় বেশি দামী ও আরামপ্রদ ছিল। এটা আরো সস্তা, আর কম আয়েসের।

এই ঘরে চারটিই খাট খালি, তাতে ঠিকঠাক আমরা চারজনে এঁটে গেলাম। আমাদের ঘরসঙ্গী কারা ? সেই জীপের সঙ্গীরা।—বাঃ ! এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে—মেসোমশাইদের দলটি এসে গেছেন কেদারনাথ দর্শন করে। কাল আমরা যাবো কেদারে, ওঁরা রওনা হবেন বদ্রীনাথে।

আমাদের মধ্যে আর বন্ধুত্ব হয় নি জীপের সেই ব্যাপারের পরে। একই ঘরে থাকায় একটু মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন, কেদার ঘুরে এসে ক্লান্ত। কেবল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই অক্লান্ত ব্রহ্মচারী (লীডার) আর গম্ভীর কলেজ ছাত্রী (সেক্রেটারি) টাকাকড়ির হিসেব কষতে লাগলেন। আমি একটু একটু চিঠি লিখলুম মাকে। আর পিকো আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো কলকাতাতে ফোন করতে। দিম্মার জন্যে তার ভয়ানক উৎকণ্ঠা হচ্ছে। কিন্তু লজ থেকে তো পাওয়া গেলই না, কাছাকাছি রুদ্রপ্রয়াগ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়েও রাত ১১টা পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারলে না। অলোক, রঞ্জন, সুরথ সিং সমেত ফিরে এলো মনখারাপ করে।

শুয়ে পড়েছি। ব্রহ্মচারীদের হিসেব তখনও শেষ হয় নি। দেখি আমাদের মেসোমশাই, আরো দুজনে মিলে কী সব পরামর্শ করছেন বিছানা থেকে উঠে। অনেক ফিসফিস হোলো। তার পর টর্চ হাতে মেসোমশাই আমার খাটিয়ার ধারে (ওপরের ডরমিটরিতে পালিশের খাট ছিল। এখানে খাটিয়া) গুটিগুটি এসে ডাকলেন—'মালক্ষ্মী কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?'

—'না মেসোমশাই।'

—'একটা কথা ছিল। একটু গোপনে।'

—'বলুন, বলুন।' উঠে বসি। তবুও মেসোমশাই ইতস্তত করছেন।

—'মাকে আমি যা বলবো তোমার তাতে আপত্তি থাকলে কিন্তু করতে হবে না।'

—'বলুন তো আগে ?'

খুব গলা নামিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে মেসোমশাই বললেন,—হাতের প্যাকেটটি দেখিয়ে—'এই যে, কিছু গাঁজা, কিছু ভাং। আমি ভুলে গৌরীকুণ্ডে ফেলে গিয়েছিলুম। তুমি মালক্ষ্মী একটু সঙ্গে নিয়ে যাবে? কেদারনাথকে দোবো বলে আমার মানত করা ছিলো। তোমরা যখন পুজো দেবে তার সঙ্গে এগুলোও যদি ধরে দাও—পৈতে, হত্তুকি ধূপ ধুনো এই সব আর কি। আর বেলপাতা। আকন্দ ফুলের মালা, ধুতরো ফুলের মালাও ছিলো। কিন্তু প্লাস্টিকের মধ্যে ভেজা নেকড়া মুড়ে আনার জন্যে সে সবই পচে গেছে। তুমি যদি মা আমার মানতটি বাবার কাছে পৌঁছে দাও। এমন ঘমতাড়া লাগালে যে গৌরীকুণ্ডেই সব পুজোর জিনিস পড়ে রইল, আমি ধড়ফড় করে শূন্যহাতে বাবার কাছে চলে গেলুম। মনটি বড় খারাপ, মা।'

'—কোনো ভাবনা করবেন না মেসোমশাই, দিয়ে দিন আমাকে প্যাকেট, কেদারনাথের পায়ে নিজের হাতে পৌঁছে দেবো আপনার মানত। আমি যদি পৌঁছই, আপনার গাঁজা ভাংও পৌঁছোবে, কিছু উদ্বেগ করবেন না।' মেসোমশাই কোকলা মুখে মিলিয়ন ডলার একটি হাসি উপহার দিয়ে প্যাকেটটি আমাকে দিলেন। কেদারনাথের জন্য পুজোর ব্যবস্থা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেল। আমার নিজের তো পুজো দেবার কোনো প্ল্যানই ছিল না। মিসেস মুখার্জীর পুজোই দিয়ে বেড়াচ্ছি প্রধানত। না হয় মেসোমশায়ের মানতটাও দেব! এ যাত্রাটা তো অন্যের পুজো পৌঁছে দেবারই যাত্রা দেখছি।

২৪

গুল্ কা খেল্

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে প্রথমে চললুম প্রয়াগটা দেখতে। প্রয়াগ দেখতে হলে একটা গলি দিয়ে যেতে হয়। তার মুখেই হেলথ ডিপার্টমেণ্ট-এর আপিস। চৌকিদার এসে সুরথ সিংকে ধরলে—'সুঁই লগায়া? পড়ছি দিখাও!'

আগেও দু'এক জায়গায় এরকম বলেছিল। সুরথ সিং গম্ভীর গলায় প্রত্যেকবার "লোকাল আদমী" বলে পার পেয়ে গেছে। এবারও বললে। কিন্তু ভবী ভোলে না। চৌকিদার ওকে লোক্যাল বলে মানলেও আমাদের লোক্যাল বলে মানছে না। শেষে পিকোলো গেল আপিসে। অফিসারকে গুলতাবিজ মারতে। রঞ্জন একদম চুপচাপ। অলোকের পড়ছি আছে।

পিকোলো গিয়ে ঝড়ের বেগে ভুল হিন্দিতে একটা কথার মধ্যে পঞ্চাশবার

খিলখিল করে হেসে কী যে গুল সব মারতে লাগলো, আপিসের কেরানী, দিদিমণি দুজন কেবলই হেসে গড়াতে লাগলো সিরিঞ্জ হাতে করে। পিকোর তো সিরিঞ্জ দেখেই হাত টনটন করতে শুরু করেছে এবং জিহ্বায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করে মিথ্যে কথার যোগান দিচ্ছেন। 'কে বলেছে আমরা কেদারে যাব? দূর দূর, আমরা তো লোক্যাল লোক, হৃষীকেশে থাকি। হ্যাঁ ওখানেই পড়ি। দেখুন না গাড়ির নম্বর, হৃষীকেশের গাড়ি। আমরা বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসেছি, বিকেল-বেলাই ফিরে যাব দেবপ্রয়াগে। এখন তো আমরা কাশীতে শঙ্কর ভগবানের মন্দিরে যাচ্ছি। কেদারে আমরা অনেক গেছি। না না, আমরা মোটেই তীর্থযাত্রী নই। টুরিস্টও নই। এই দু'তিন দিনের জন্য ঘুরতে এসেছি। প্রায়ই আসি তো।' এই সব কথা বলে পিকো যখন তাদের বাগ মানিয়ে ফেলেছে, রঞ্জনের মনে হলো "মেয়েটা একা একা কতক্ষণ লড়বে? যাই একটু সাহায্য করে আসি।" মনে হতেই সে আপিসে ঢুকলো এবং পিকোর চেয়ে তিনগুণ খারাপ হিন্দিতে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাতে লাগলো—'কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছেন দিদিরা? এই যে আমরা তিনধাম ঘুরে এলাম, আমাদের কলেরা হোলো না, কেবল কেদার গেলেই হবে? আশ্চর্য কথা সত্যি! আমাদের মাত্র তিনদিন হাতে আছে আর, তার মধ্যে ফিরতেই হবে—এখন ইঞ্জেকশন নিয়ে যদি জ্বর হয়ে যায় তাহলে কেদার যাত্রা হবে না। এতদূর এসে ফিরে যাব? ভেবে দেখুন। সেই কলকাতা থেকে আসছি! প্রমিস করছি, আমরা কেদারে কিচ্ছু খাব না—চা বিস্কুট ছাড়া কি-চ্ছু খাব না, প্রমিস। কেমন? প্লীইজ ইঞ্জেকশন দেবেন না!'

অলোক শান্ত ছেলে। সে পিকোর কথাও শুনেছে, আবার রঞ্জনেরটাও শুনলো। কেলেংকারিটা ম্যানেজ করতে বললো—'আসলে ওঁরা সক্কলেই কলেরার ইঞ্জেকশন নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে। বাড়ির ডাক্তারের কাছে। নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য। সার্টিফিকেট নিতে হয় তা জানত না বলে পড়ছি নেই। এই আমিই শুধু হরিদ্বারে এসে ইঞ্জেকশন নিয়েছি। আমার তাই পড়ছি আছে।' রঞ্জনের কথাবার্তার ফলে শিকোর গুলশন গুল ধরতে পেরে হেলথ ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা অত্যাশ্চার্য। ওরা এতদিন ভাবতো, জগতের শ্রেষ্ঠ গুল বুঝি কেন্দ্রীয় সরকারই দিয়ে থাকেন। যাই হোক তাঁরা শেষ অবধি আমাদের ছেড়েই দিলেন। পিকোলো তাদের সেধেই জানালো, জলে জিওলিন দিয়ে জল খাবে, কাটা ফলটল কিছু খাবে না। কলেরা কিছুতেই হতে দেবে না।

২৫

সেণ্ট অগাস্ট, এবং বাবার বিয়ে

ইঞ্জেকশনের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গম দেখতে গেলুম। ছোট্ট শাদা একটি মন্দির, ঠিক নদীতীরে অবস্থিত। তারই দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে মন্দাকিনী আর অলকনন্দার সঙ্গমটা দারুণ দেখায়। দুই রঙের জল, নীল আর গেরুয়া, অনেকক্ষণ পাশাপাশি বয়ে যায়—একটি উদ্দাম, অন্যটি শান্ত। নীলটি শান্ত, মন্দাকিনী, গেরুয়া উদ্দাম অলকনন্দা। বদ্রীনাথের সঙ্গিনী অলকনন্দা।

কেদারনাথের মন্দাকিনী। যে-পথে কেদারে উঠবো, মন্দাকিনীর যাত্রাপথ বেয়ে সেই রাস্তা তৈরি।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে তিলবাড়া হয়ে অগস্ত্যমুনি বলে একটি জায়গা। অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে সেখানে। সরকারী গাইডে লেখা—Temple of Saint August! এমন পোড়া দেশের মরণই ভালো। সেইণ্ট অগাস্টের দেশ অগস্ত্য-মুনির পরে গুপ্তকাশী। সেখানে অনেকক্ষণ বাস থামে। গেট পাবার ব্যাপার আছে বোধ হয়। গুপ্তকাশীর পরে শোনপ্রয়াগ। শোনগঙ্গা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম সেখানে। সব বাসও শেষ। বাকিটুকু হেঁটে গৌরীকুণ্ডে যেতে হয়। গাড়ি অবিশ্যি আরো খানিকটা গেল। গৌরীকুণ্ডে যেতে হয় একটা বাজার পার হয়ে খানিকটা পাহাড়ের ওপরে উঠে। বেজায় নোংরা এক গলি দিয়ে যাত্রা। শোন-প্রয়াগ থেকেই ত্রিযুগী নারায়ণে যেতে হয়। ৬ কিলোমিটার পথ। পায়ে হেঁটে। কপাল ভালো থাকলে খচ্চর মেলে। "ত্রিযুগী নারায়ণে" যজ্ঞাগ্নির শিখা অলিম্পিকের শিখার মতো অনন্তকাল জ্বলমান। ওটি প্রজ্বলিত হয়েছিল শিব-পার্বতীর বিবাহ-যজ্ঞে। সেই থেকে সমানে জ্বলছে। তিন যুগ কেটে এখন ঘোর কলি যুগ। পবিত্র হোমানল তিন যুগ ধরেই জ্বলছে, তাই ত্রিযুগী নারায়ণ নাম। পুণ্যার্থীরা হেঁটে দেখে আসেন বাবার বিয়ের যজ্ঞাগ্নি।

২৬

সুনীল লজ

শোনপ্রয়াগের পর গৌরীকুণ্ড। এই উষ্ণনির্ঝর একটি বিরাট কুণ্ডের চেহারা অবস্থিত। তারই চারপাশে ধর্মশালা, হোটেল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। আমরা এখন গৌরীকুণ্ডের দিকে না গিয়ে সোজা উঠে যাই টুরিস্ট লজের দিকে। একে-

বারে তার ডাইনিং হলে গিয়ে থামি। হ্যাঁ, কিছু খাবার জিনিস তারা বানিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এক্ষুনিই পারবে, কিন্তু ঘর নেই। ঘর খালি নেই। পাশেই 'সুনীল লজ' আছে, ওখানে দেখুন। ততক্ষণে খাবার তৈরি হচ্ছে। ভাত রুটি ডাল আলুর তরকারি, পাঁপর ভাজা, আচার, দই এবং ডিমভাজা। খুব ক্লান্ত হলেও গৌরীকুণ্ডে গিয়ে স্নান সেরে আসার মতো এনার্জি পাচ্ছি না কেউ। এদিকে অল্প অল্প বৃষ্টি হতে শুরু করেছে। 'সুনীল লজ' ব্যাপারটি বেশ ইন্টারেস্টিং। পাহাড়ের গায়েই মার্কিন মেটেলের স্টাইলে পর পর ৬টি ঘর, দুটি করে খাটওলা, ১২ জনের জন্য তৈরি। একপাশে অফিস ঘর, অন্যপাশে কমন স্নানঘর ও ল্যাভটরিগুলি। সামনে একফালি খুব সরু টানা বারান্দা আছে, রেলিং দেওয়া। সেটাকে রাস্তাও বলা যায়, প্যাসেজ বলতে আলাদা কিছু নেই। এই টানা বারান্দাই একমাত্র যোগসূত্র। ঘরের সঙ্গে ঘরের, অফিসের, বাথরুমের। একেবারে যেন পাহাড় কেটে বসানো ঘরগুলি। সামনেই খাদ। নীচে রাস্তা। ওদিকে জঙ্গলে ভরা হিমালয়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে মন্দাকিনীর উত্তাল স্রোত। তার ঝরঝর শব্দে সর্বক্ষণ মনপ্রাণ ভরে থাকছে।

দূরে দেখা যাচ্ছে গৌরীকুণ্ড এবং কালীকম্বলিবালার ধরমশালা। 'সুনীল লজ'-এর মতো করেই প্রায় 'টুরিস্ট লজ'টি তৈরি—ঠিক 'সুনীল লজ'-এর এক ধাপ ওপরে। ওদের কয়েকটা ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম আছে। এবং 'সুনীল লজ'-এর ডাইনিং রুম নেই। 'আমরা সুনীল লজ'-এ দুটি ঘর চাইলুম, মাথা নেড়ে তরুণ প্রোপাইটার বললেন—'একটিমাত্র ঘর আছে, চল্লিশ টাকা ভাড়া। ওর মধ্যেই যতজন খুশি থাকতে পারেন। এক্সট্রা খরচ নেই।' ঘর খুলে দেখি দুটি সিঙ্গল খাট। জোড়া দিয়েও চারজন কেন, তিনজনেও শোয়া যাবে না। তবে মেঝেতে স্লিপিং ব্যাগ পাতা যাবে। অলোকের সঙ্গেও আছে, রঞ্জনের সঙ্গেও। ওরা দুজনেই মাটিতে শুতে রাজি। কিন্তু বিছে-টিছে নেই তো? বিছের হিন্দি জানি না। অনেক কষ্টে বোঝাতে চেষ্টা করি। গম্ভীর মুখে সব শুনে ছোকরা বলে—'ছিপ্‌লি? হ্যায়।' তারপর সোজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জানলার কোণে একটি ক্ষুদ্রকায় টিকটিকি।

—'না না, ছিপ্‌লি নয়, বিছে, বিছে—'

—'নেই হ্যায়।' বলে ছোকরা চলে যায়।

'এ্যাই, এ্যাই, চা দিয়ে যাও—' বলে রঞ্জন, অলোক চেঁচায়।

খেয়ে উঠতেই আড়াইটে বেজে গেল। নেমে আসছি, দেখি টুরিস্ট লজ-এর একটি কামরায় দু'জন যাত্রী ফিরলেন। ছোট মেয়েটি ঘোড়া থেকে নামলো, তার

মা ডাণ্ডী থেকে। পুরুষমানুষ সঙ্গে নেই।

—'আপনারা কেদারে গিয়েছিলেন? আজই?'

—'না না, গতকাল। আজ সকালে ফেরৎ রওনা হয়ে, এই পৌছোলাম। কী বৃষ্টিই নেমে গেছে! রাস্তা খুব পিছল হয়ে যায়। বহুৎ ডর লাগতা। বাবুজী তো পায়দল আ রহা, অবতক পৌছা নেহি।'

—'ভয় নেই, এসে যাবেন এক্ষুনি। কত খরচ লাগল ঘোড়ায়?'

—'যাতায়াত ১১০৲ নিচ্ছে। আর ডাণ্ডী সাড়ে চারশো।'

পাহাড়ী বৃষ্টি, ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে সুনীল লজে নিজেদের ঘর অবধি পৌছোতে পৌছোতেই এক ঝাপটায় ভিজে গেলুম।

২৭

বাবার পেসাদ

বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে দুপুরটা দারুণ কাটলো। রঞ্জন তো অলোককে পেয়ে বেঁচে উঠেছে। দুজনে দূরে গিয়ে ধূমপান করছে। পিকোলো মুগ্ধ হয়ে পাহাড়ের বৃষ্টি, আর বর্ষণে ফেঁপেফুলে গর্জে নেচে ধেয়ে চলা মন্দাকিনীর দিকে চেয়ে চৌকাঠে বসে আছে। ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়েছি। মাঝে মাঝে খাচ্ছি। ভারি রিল্যাক্স্ড সময়। হাতে কোনো কাজ নেই। ঘরে আলো নেই। লেখা-পড়ার প্রশ্ন নেই। মেঘছায়াঘন বরিষণ-মুখরিত ইত্যাদি বিশেষণ অলংকৃত দিন। রঞ্জন এবং অলোকের মুখে এমনিতেই কথা কম, এখন একেবারেই কথা নেই। আমার কেমন যেন সন্দেহ হোলো। গুটিগুটি কাছে গিয়েই গন্ধ পেলুম। এ-ধুম তো সে-ধুম নয়? সিগারেটে গাঁজার গন্ধ আছে মনে হচ্ছে? হেসে ফেলল ছেলেগুলো।

—'ঠিক ধরেছো তো দিদি? ভেবেছিলুম বুঝতে পারবে না! খুব শস্তা যে গাঁজা এখানে! এখানে চার আনায় যা দেয়, কলকাতায় দু'টাকাতেও পাবে না! বাবার পেসাদ!'

—'আর চার টাকাতে হাশিশ!' অলোক বলে।

—'তোমরা সেও খাবে? হাশিশ খেতে খেতে কেদারনাথে উঠবে? তোমরা কি হিপি?'

—'এই সেরেছে। আমরা খাবো কেন? আমরা ব্যবসা করবো। যাবার সময় অনেক হাশিশ কিনে নিয়ে যাবো কলকাতায়, চার টাকার হাশিশ পঁচিশ-টাকায় বিক্রি হবে। আর এর কোয়ালিটি'—

—'মোটেই ওসব কিচ্ছু করবে না। ওসব নিয়ে আমাদের গাড়িতে চড়বে না। নিজে নিজে রেলগাড়ি করে যাও।'

—'কেন যে তুমি হাশিশের ব্যাপারটা থামকা দিদিকে বলে দিলে অলোক। কোনো দরকার ছিলো না। দিলে নেশাটার বারোটা বাজিয়ে।'

বৃষ্টি চলতেই থাকলো। আমাদের কবিত্ব অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে এলো। ঘরে মোমবাতি জেলে বসে বসে ভূতের গল্প করবার যথাযথ স্থান এবং কাল এটা। কিন্তু পাত্ররা অরাজি। এই জলের মধ্যে 'টুরিস্ট লজে' খেতে ওঠাও সম্ভব নয়। আমাদের 'সুনীল লজ'-এর পেরাপ্রাইটার এসে বললেন—'খানা হামলোগ বনা দেংগে। উসলোগকো কিতনা দিয়া? পাঁচ পাঁচ রূপাইয়া? হম্‌কো ভি পাঁচ দো। কামরামে খানা মিল যায়েগা। আব্‌ বতাও কেয়া খাওগে?'

—'খিচুড়ি-ডিমভাজা মিলেগা?'

—'জরুর।'

—'আউর পাঁপড়ভাজা? আলুভাজা?'

—'জরুর।'

যতই স্লিপিং ব্যাগ থাকুক, হিমালয়ের এই বর্ষায় পাথরের মেঝেতে শোওয়া সোজা নয়। লেপতোশক ভাড়া করে আনানো হলো নীচের বাজার থেকে, মেঝেয় বিছিয়ে তার ওপরে স্লিপিং ব্যাগ পাতা হবে।

বিছানায় কাগজ পেতে বসে মোমের কাঁপা কাঁপা আলোয় আর মন্দাকিনীর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে দারুণ জমলো বর্ষা রাতের খিচুড়ি খাওয়া।

—'ব্র্যাণ্ডি হবে নাকি, দু'চামচ করে?'

—'এক চামচ হতে পারে! এখনও কেদারনাথ বাকি! সবচেয়ে ঠাণ্ডা, সবচেয়ে উঁচু।'

—'বোতল তো ভর্তিই রয়েছে দিদি, কী করবে অতটা বাঁচিয়ে?'

—'যাই করি। তোমাদের তাতে কী? এক চামচ করে, চায়ের মধ্যে দিতে পারি।'

—'তাই সই! বাবার পেসাদ!'

২৮

ঘোড়েল কাহিনী

আমাদের 'সুনীল লজ'-এর মালিকের নাম সুরয সিং। তার ছেলের নাম সুনীল, বয়স তিন বছর। সুরয সিং নিজে তার চেয়ে বছর কুড়ির বড়ো হতে পারে।

আমাদের সঙ্গে খুব জমেছে। সুরয সিং বললে—'আমি নিজেই চলে যাবো তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে। আমাদের অনেক ঘোড়া আছে। কুছ মুশকিল নেহি হ্যায়।'

কেদারনাথের দয়ার প্রমাণ প্রথম থেকেই পাচ্ছি। অশ্বতর নয়, ঘোড়াই। দিব্যি Pony যাকে বলে, দেখতে শুনতে ভদ্র। আর পথ তো রীতিমত প্রশস্ত। চওড়া রাস্তায় ৬টা ঘোড়া পাশাপাশি যেতে পারে। যমুনোত্রীর মতো সরু ভয়ংকর গিরিপথ নয়। বাঁদিকে পাহাড়, ডাইনে মন্দাকিনীর খাদ। পদযাত্রীদের—'অন্দরসে বচাইয়ে'—সুরয সিংও সেই সুজন সিংয়ের বুলিই বলছে শুনতে পাই—'জান্‌বরকো বিসোয়াস নেহি'—!

সত্যি কি তাই? জানোয়ারদের বিশ্বাস করতেই বেশি ভয় কি?

পিকোলোর ঘোড়া ধরেছে লছমন সিং বলে একটা বাচ্চা ছেলে। আমি বদল করে নিলুম। সেবারে যমুনোত্রীতেও আমার বেলায় সুজন সিং আর পিকোর বেলায় বাচ্চা রবীন্দর সিং ছিলো। আর আমার উদ্বেগে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। লছমন সিংকে আমি নিয়ে সুরয সিংকে পিকোর ঘোড়া ধরতে বলি। এ ব্যবস্থায় সবাই খুশি। লছমনের সঙ্গে আমার খুবই ভাব হয়ে গেল, সুরযের সঙ্গেও পিকোর দিব্য বনিবনা! রঞ্জন পদব্রজে, অলোকের সঙ্গে। এ যাত্রায় ওর কষ্ট নেই, সঙ্গী আছে। প্রত্যেক চটিতে থামবে, চা-জিলিপি ওড়াবে। জিলিপি খাওয়া আমার কড়া বারণ, যেহেতু কলেরার ইনজেকশন নেওয়া হয়নি, পকোড়া-জিলিপি-লাড্ডু খাওয়া চলবে না। কিন্তু ওই বয়েসের ছেলে, আড়াল পেলে কি আর কথা শোনে? (কোনো বয়েসের ছেলেই অবিশ্যি আড়াল পেলে কথা শোনে না।) তার ওপর চটিতে চটিতে গঞ্জিকার ঘোর আড্ডা আছে সাধুদের দয়ায়। কে জানে হাশিশ্-মাশিশ্‌ও খায় কিনা সাধুরা? ওদের কথা না ভাবাই ভালো।

পিকোলো আর আমি কেদারযাত্রাটি খুবই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছি। চওড়া রাস্তায় পড়ে যাবার ভয় নেই, দিব্যি রোদভরা শুকনো দিন, অথচ চড়া-রোদ্দুর নয়, চমৎকার ঘোড়া, লাফাচ্ছে না, গায়ে ব্যথা হচ্ছে না, দুলকি চালে চলছে, পথে পদযাত্রীদেরও ঠেলা মারছে না। হাঁটবার জন্যেও প্রচুর জায়গা রয়েছে পথে, যাত্রায় কোনো টেনশন নেই। সুন্দর অবশ্য যমুনোত্রীর পথও, বরং ভয়ংকর বলেই আরো সুন্দর। কেদারনাথ দুর্গম নন মোটেই, কেন যে লোকে দুর্গম বলে! আমাদের পোঁটলাপুঁটলি সব রেখে এসেছি 'সুনীল লজ'-এর অফিসে, জমা। পয়সা দিতে হবে মালপিছু দিনে এক টাকা, এই লেফ্‌ট লাগেজ সার্ভিসের জন্য। রাত্রে কেদারনাথে থাকবো, সকালে কেদারনাথ দর্শন করে ফেরৎ রওনা হবো। এটাই

সাধারণ নিয়ম।

লছমন সিং ইস্কুলে পড়ে। ভেড়াও চরায়। এই ঘোড়া ওদের নয়, সুরথ সিংয়ের বাবার। লছমনের বাবার ঘোড়া নেই। সেও অন্যের ঘোড়া চরায়। মাহিনামে ৭৫ তন্‌খা পায়। খাওয়া নিজের। এই ১১০ থেকে সে কিছুই পাবে না। দিনে অন্তত দুটো ট্রিপ তো করতেই হয়। একবার ওঠা, একবার নামা। দুবার ওঠানামা একদিনে সম্ভব হয় না সাধারণত। সীজন তো বছরে ছ'মাহিনা, যতদিন খোলা থাকে কেদারনাথের মন্দির। অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দীপাবলী পর্যন্ত। বাকি ছ'মাস? মুশকিলসে খানা মিলতা। কাম নেহি!

বহুগুণা সত্যি গাড়োয়ালের প্রভূত উন্নতি করেছেন। গ্রামে গ্রামে ইলেকট্রিক, স্কুল, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, মেডিক্যাল ইউনিট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ভেড়ামহিষ কেনো, তাঁত কেনো, উল কেনো, জমি লাঙল, বীজ-টিজ কেনো, এবং পাম্প কেনো। 'বন-বাঁচাও'-অভিযানে মদত দিয়েছেন, 'একটি বৃক্ষ দশটি পুত্রের সমান' 'তুমি গাছকে রক্ষা করো, গাছ তোমার পরিবারকে রক্ষা করবে' ইত্যাদি ধ্বনি চতুর্দিকে এঁটেছেন —এত করা সত্ত্বেও দেখছি গাড়োয়াল খুব গরিব দেশ। সবাই ভো আণ্ডার-এমপ্লয়েড! অন্তত পার্বত্য অঞ্চলে। এদের তো আগে শুনতুম খুব যক্ষ্মা হয়, দার্জিলিঙের নেপালীদের মতো, পাহাড়ে মাল নিয়ে ওঠে-নামে, খাওয়া-দাওয়া পায় না, শরীর অল্প বয়সেই ভেঙে যায়। অবশ্য এদের বয়েস সকলেরই খুবই অল্প বলে মনে হয়, নইলে খুব বুড়ো। এদের দাড়ি-গোঁফ নেই, মধ্যবয়সেও হয় না।

২৯

ফুল খিলে হ্যায় গুল্‌শন্ গুল্‌শন্

রাস্তার ধারে প্রচুর গুচ্ছ গুচ্ছ শুভ্র লতাপুষ্প ছেয়ে আছে। কী ফুল?—গোলাপ? মনে তো হয় না গোলাপ ফুল বলে। পাৎলা পাঁচ পাপড়ির ফুল। লছমন সিং ছুটে গিয়ে এনে দেয়।—'দেখিয়ে মেমসাব। গুলাব হ্যায়।' গন্ধ শুঁকে দেখি ওমা ঠিকই তো! গন্ধ গোলাপেরই। পাতাগুলি বড় বড় হলেও গোলাপ পাতাই, কাঁটাও আছে। শাদা বনগোলাপে, সবুজ লতাগুল্মে ঢাকা পথের পাশের পাথুরে দেওয়াল। আরো অনেক ফুল ফুটেছে—বেগুনী হলুদ। গোলাপি, কুচিকুচি কত রকমের ফুল—যমুনোত্রীর মতো অত না হলেও খুব কমও নয়। টুকটুকে লাল একরকম ফুল ফুটে আছে অনেক ওপরে ওপরে, পাড়া গেল না। বাকি সব ফুল পাতা তুলতে তুলতে পিকোলো আর আমি ফুলবালা হয়ে পড়লুম ক্রমশ।

সবচেয়ে অবাক করলো মাটির খুব কাছাকাছি ফোটা একরকমের ফুল। ঠিক

যেন গোখরো সাপের ফণা! ফুলটি একটা সবুজ ডাঁটায় জন্মায়। প্রথমে সবুজ ডাঁটাটা চ্যাপ্টা হয়ে যায় ঠিক ফণার আকৃতিতে। তারপর তাতে ডুরে ডুরে দাগ হয়। তারপর ডুরেগুলো কালো হয়। তারপর সেই চ্যাটালো, ডোরাকাটা ফণার ওপরে স্পষ্ট গোখরো সাপের মাথায় যেমন আল্পনা থাকে, তেমনি একটা চিহ্ন আঁকেন প্রকৃতি। প্রকৃতির এত কেরামতি কেন? না দুর্দান্ত পাহাড়ী ছাগলদের মুখ থেকে এই নিরীহ উদ্ভিদটিকে রক্ষা করা দরকার।

যাত্রীরা সকলেই এই 'নাগফণ' পুষ্পের অলৌকিক রূপলালিত্যে বিমোহিত হয়ে পড়ছেন। তবে দু'এক জন বাচ্চাছেলে, এবং এই পিকোলো আর তার মা জননী ছাড়া কাউকে নাগফণ ফুল তুলতে দেখলুম না। ফুলটি সুন্দর নয়, অদ্ভুত। কোনো গন্ধ নেই। কাঁটাও না। আঠাও না। লছমন সিং, সুরয সিং দুজনেই উৎসাহ-ভরে অনেক তুলেছে। বনফুলের গুচ্ছ বাহারী পাতার বোঝায়, এবং 'নাগফণ' ফুলের গোছা, এত সামলে, ঘোড়া, ব্যাগ, জল, ক্যামেরা, শাড়ি, শাল, এসব সামলানোর জন্য আর হাত বাকি থাকে না। আমি তো দশভুজা নই। পথে একটা গ্লেসিয়ার পড়ল। ঘোড়ারা মনের আনন্দে পথহীন বরফের মধ্যে চলতে শুরু করল। কিন্তু আমার খুব ভয় করছিল। 'নেমে, হেঁটে যাই'—যত বলি, লছমন বলে, 'ঠিক হ্যায়, বৈঠ রহিয়ে।' এক জায়গায় দেখি মিলিটারির লোকেরা তুষার কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে সিঁড়ি তৈরি করছে। পায়ে যাঁরা হাঁটছেন, এই বরফের ঢালু পথে ওঠা তাঁদের পক্ষে কঠিন।

দূর থেকে যেই 'রামবাড়া' চটি দেখা গেল, লছমন সিং বললে—'আধা রাস্তা খতম্!' রামবাড়া ঠিক মধ্যপথে। প্রথমে পড়েছিল জঙ্গলচটি। সেটা ছোট কয়েকটা চায়ের দোকান। রামবাড়া কিন্তু বেশ বড় চটি। কালীকম্বলিবালার ধর্মশালা আছে, বিড়লার গেস্ট হাউস আছে, এবং জায়গাটিও বড় চমৎকার। উপত্যকার ধার দিয়ে মন্দাকিনী প্রবাহিত হচ্ছেন, দূরে চারিপাশেই তুষারমৌলি হিমালয়ের শিখর যেন ঘিরে আছে। অপরূপ স্নো-ভিউ। মনে হল কেন যে লোকে দার্জিলিং-সিমলা যায়? এমন সুন্দর জায়গায় হলিডে-রিসর্ট করে না? সাহেবগুলো এতদিন ধরে এদেশে তবে করছিল কী? সুইজারল্যাণ্ডে এর চেয়ে সুন্দর স্পট ক'টাই বা আছে? প্রকৃতি তো ছপ্পড় ফোড়কে দিয়া—মানুষ তাতে বিশেষ কিছুই যোগ করে নি।

৩০

মাধোদাসজী

অনেকক্ষণ ধরেই পথে প্রায় আমার পাশাপাশি আসছেন একজন দণ্ডধারী সাধু। এপথে অনেক রকমের সাধু দেখা যায়। দণ্ডধারী অনেককে দেখেছি। এঁরা দণ্ডী-স্বামীর শিষ্য। গঙ্গোত্রীতে দণ্ডীবাবার আশ্রম আছে, ধর্মশালা আছে, কবিতাদিরা একদিন ছিলেন শুনেছি। খুব শান্তিপূর্ণ আশ্রম, তবে মন্দিরের থেকে অনেকটা দূরে। আমি এই দণ্ডীবাবাকে জিগ্যেস করি,—'আপনার নাম কী, বাবা?' সাধু-বাবা বেশ তরুণ, ত্রিশের নিচেই বয়স হবে। ঝকঝকে এক মুখ হেসে উত্তর দিলেন—'মাধোদাসজী।'

—'আপনি কোথা থেকে আসছেন মাধোদাসজী?' তিনি হেসে বললেন, তাঁর তো কোনো বাঁধা ঘর নেই। এই মুহূর্তে আসছেন গঙ্গোত্রী থেকে। তিনি সারা বছরে ছ'জায়গায় থাকেন: অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী, হরিদ্বার। এবং প্রতি বছরই চারধাম ভ্রমণ করেন! এটা সাধুদের কর্তব্য! চারধাম ভ্রমণ, সাধুদের জন্য, বলতে গেলে ফ্রী। কালীকম্বলিওয়ালার প্রতিষ্ঠান থেকে মোট বিয়াল্লিশটা পড়ছি (কুপন) দেয়।—'ডেইলি র‍্যাশন উঠানেকে লিয়ে। উস্‌সে জ্যাদা খায়গা তো আপনা পয়সা লাগেগা।' কিন্তু ওই বিয়াল্লিশটা কুপনেই সাধারণত চারধাম হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা দিনে একবার খান, বিয়াল্লিশ দিনের রসদই যথেষ্ট। চারধাম ঘুরতে তার চেয়ে বেশি বড় জোর তিন চার দিন লাগে। নিজে রেঁধে নিতে হয়। আটা, আলু, উনুন, কাঠ, সব দেয়। কালীকম্বলিবালা। শুতেও দেয়। হ্যাঁ সন্ন্যাসীদের সব রকম যত্ন করে কালীকম্বলিবালার প্রতিষ্ঠান!

আমার শুনে ভয়ানক লোভ হতে লাগলো ওই বিয়াল্লিশটা পড়ছি হাতে করে পায়ে-হেঁটে ঘুরতে। কিন্তু প্রপারলি রেজিস্টার্ড সন্ন্যাসী হতে হবে তো। আর বাথরুমের একটা সমস্যা হয়তো আমার হবে, সন্ন্যাসিনী প্রপার হলে যেটা হয় না। এতদিন যে ঘুরছি, সত্যি বলতে কি সন্ন্যাসিনী কিন্তু চোখে পড়ল না একজনও। তাঁরা কি ঘোরেন না? তাঁদের সন্ন্যাস কি আশ্রমবাসিনী থাকার? তাঁদের চার-ধাম ভ্রমণের বাধ্যবাধকতা নেই?

—'মাধোদাসজী, আপনি কতদিন সাধু হয়েছেন?'

—'বচ্‌পনসেই সাধু হুঁ ম্যাঁয়। যিস্‌কো ভগবান বুলালেতা আপনে কামমে, উয়ো সাধু বন্ যাতা।'

'হঠাৎ কেন সাধু হতে ইচ্ছা করল আপনার?'

—'ক্যা জানে? কোই চোর-ডাকু বন্‌তা, কোই সাধু-সন্ত্‌ বন্‌তা। ভগবান বনা লেতা।'

—'এত অল্পবয়সে এই কঠোর জীবন আপনার ভালো লাগে? আপনার বয়েস এখন কত?'

লাজুক হেসে মাধোদাসজী বললেন—'উন্নিস সালকা হুঁ।'

এতক্ষণ লছমন সিং চুপচাপ আমাদের বাক্যালাপ মন দিয়ে শুনছিলো আর হাতে ছপ্‌টি দিয়ে পথের ধারের গাছপালাকে ছপাং ছপাং করে শায়েস্তা করছিলো। ঘোড়াটি যেহেতু অতি ভদ্রলোক, তাকে কিছুই বলতে হয় না। দেখতেও অভিজাত ধবধবে শাদা, স্বভাবটিও "নোব্‌ল অ্যানিমেল" অভিহিত হবার যোগ্য। লছমন সিং এবার মাধোদাসজীকে একটা কথা বলে বসলো—'কভী হো নেহী সকতা।'

—'ক্যা হো নেহী সকতা?'

—'তুমহারা উমর চৌভিস / পচ্চিস সাল হোগা। উন্নিস হো নেহী সকতা। হম্‌কো পতা হ্যায়।'

—'ক্যায়সে পতা চলা?'

—'দেখনেসে মালুম পড়তা।'

মাধোদাসজী দেখলুম একেবারে ক্ষেপে গেলেন। কী? তাঁর বয়স বাড়িয়ে দেওয়া? চ্যালেঞ্জ করা? তাঁকে হয় মিথ্যেবাদী অথবা অজ্ঞান বলা? মাত্র তেরো চোদ্দ বছরের চেয়ে বেশি নয় লছমনের নিজের বয়েস। তার নিশ্চিত কথা বলার ধরনে আমার তো খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু মাধোদাসজীর হাসি পায় নি।

—'আরে, তুমি পাহাড়ী লোগ, খানাপিনা করতা নেই, তাগদ ভি নেহী হোতা, বাড়তা নেহী ঠিক সে, জিন্দগী ভর ইতনা ছোট-ছোটাহী রহ্‌ যাতা, ঠিকসে মোচ-দাড়ি ভি নিকলাতা নেহী। একদম জংলা আদমি হোতে হো তুমলোগ, হিলস্‌ পিপলকো খানা ভি নেহী মিলতা তুমকো—হমলোগ প্লেনস্‌বায়লা, প্লেনস্‌বায়লা সবকো তাগদ্‌ হোতা হ্যায়, যিতনা পয়সা কামাতা, সব খানা খা-কে খতম করতা, ইসলিয়ে ইতনা তাগদ, উমর জেয়াদা লাগতা—আরে তুম্‌ লোগোঁকে তো ঘরমে খানা ভি মিলতা নেহী, সালভর—'

—'কিউ নেহী মিলতা? জরুর মিলতা। বহুৎ মিলতা খানা পাহাড়মে—এইসা মত বোলনা'—লছমন সিং হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে উঠেছে! সঙ্গে সঙ্গে কথার সুর পালটে ফেলেন মাধোদাসজী—'আরে খালি খানা খানেসে কেয়া হোগা? আসনতো নেহী করতা তুমলোগ? হমলোগ সাধু বাবা, সাধুলোগকো উমর

বাড়তা নেহী যেইসা আদমী লোগকো উমর বাড় যাতা না, সাধুলোগকো ওইসা নেহী হোতা—ইস্‌লিয়ে কি হমলোগকো কড়া রুটিন হ্যায়। জপতপ, ধ্যান-পূজা, সাধন-ভজন, আউর যোগাসন—এই করনেসে দিল শান্ত হো যাতা, তবিয়ৎ শরীফ রহতা, আউর উমর বি নেহী বাড়তা। শুনা? যমুনাতীর মে এক সাধুবাবা হ্যায় দণ্ডীবাবাই হ্যায় এক, হম উনকো দেখকে আতা হুঁ, উন্‌কা উমর আর দো'শ সাল হোগা, দেখনেসে মালুম পড়ে গা, পচাঁশ! সাধুলোগকো উমর কোঈ কভী বোল নেহী পাতা—তুম ক্যায়সে সকোগে?'

লছমন সিং একথার উত্তর দিল না। দুশো বছরের সাধুকে পঞ্চাশ বছরের মত দেখালে, ওর তাতে কিছুই বলার নেই। উনিশ বছরের সাধুকে পঁচিশ বছরের মত দেখালে ওর আপত্তি। সংসার ত্যাগী দণ্ডী সাধুর নিজের বয়েস বিষয়ে এই দুর্বলতা দেখে অবাক হয়ে যাই! "হিলস পিপল" আর "প্লেনস বায়লা"-দের বিষয়েও তাঁর বেশ সাম্প্রদায়িক মতামত হয়েছে। পাহাড়ীরা গরিব দুঃখী, খেতে পায় না, সমতলের লোকেরা খেয়েদেয়ে রসেবসে থাকে। কে যে কী জন্যে সন্ন্যাস নেয়!

৩১

প্যার-কি-কহানী

গাড়োয়ালের গরিব লোকেরা কি খায়, কী পরে, কী করে আমি আর লছমন সিং যখন এই সব কথা বলছি, ওদিকে পিকো আর সুরষ সিংয়ের আরেক ধরনের গল্প হচ্ছে। সিংয়ের দাদা জিওগ্রাফির প্রফেসর কোনো এক কলেজে। সুরয সিংয়ের ছোট ভাই বি. কম. পড়ছে। উত্তরকাশীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আরেক ভাই। ও নিজে 'লজ' চালায়। ঘোড়া ওদের নৌকর লোগ চালায়। আজ খুদ্ হি চলা আয়া,—আপনা শখসে। পিকো সুযোগ পেলেই চেঁচিয়ে আমাকে খবরগুলো পাস অন্ করে দিচ্ছে,—'মা, মা জানো ওর দাদাও প্রফেসার; কলেজে জিওগ্রাফি পড়ায়।' ইত্যাদি।

এক সময় শুনি গান হচ্ছে—'তৈরি প্যারী প্যারী সুরতকো, কিসিকে নজর ন লাগে, চশমে বদ্‌দূর—' পিকো এটা রিলে করল না। তারপর শুনি, 'ইয়াদ কিয়া দিলমে কাঁহা হো তুম্—প্যার-সে পুকার লো যাঁহা হো তুম—'। খানিক পরে শোনা গেল খুব মিষ্টি সুরে কী একটা গান—লছমন সিং উতলা হয়ে বলে—"ইয়ে পাহাড়ী গানা হ্যায়, গাড়োয়াল কি গানা—বহুৎ আচ্ছা লাগতা হম্‌কো—'

—'কিসের এত গান শুনছিস রে পিকো ?'

—'সূরয সিং শোনাচ্ছে ওদের গান—আমাকে বলছে আনাদের গান গাইতে—'

—'কেবলই তো প্রেমের গান শোনাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে—'

—'তাই শোনাচ্ছে গো—কী করবো ?'

—'করবি আবার কী ? শুনে যা ! ইগনোর কর। তুই যেন আবার ওকে গান শোনাতে বসিস নি।'

—'পা-গল ?'

পিকো গান না গাইলেও ক্ষতি হয় নি। সূরয সিং ছুটে ছুটে ফুল তুলে, দৌড়ে দৌড়ে গান গেয়ে, দেবানন্দের স্টাইলে ঘোড়ার লেজ মলে দিয়ে, মনের সুখে নিরাপদেই পথ কাবার করলে। কেবল একবারই, সে যখন ফুল তুলছিল, পিকোর লাল ঘোড়া হঠাৎ ছুট লাগালো—অন্য একটা শাদা ঘোড়াকে তার লীডার মনে করে। সে সর্বক্ষণই আমার শাদা ঘোড়াকে অনুসরণ করে পথ চলে। 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলে দিয়েছিল বোধ হয় তাকে আমার ঘোড়া। আমার শাদা ঘোড়ানী বয়স্কা মহিলা, আর সে অল্পবয়সী খোকা ; সর্বদা বড়কে মান্য করে চলে। আমি একটু এগিয়ে গিয়েছি, ফুলে ফুলে এবং গানে গানে পিকো পিছিয়ে পড়েছে। তার ঘোড়া হঠাৎ আমার ঘোড়াকে দেখতে না পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে দৌড় লাগালো অন্য একটি শাদা ঘোড়ার পেছনে। পিকো তো প্রাণ দিয়ে লাগাম ধরে আছে—আর সূরয সিং চেঁচাচ্ছে—'লাগাম পাকড়ো, ছোড় মত দেনা—' তার হাত ভর্তি ফুল। লছমন সিং শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ধরলো ত্রস্ত ঘোড়াকে—পিকোর তো ধড়ে প্রাণ এলো, এবং পিকোর মায়েরও।

—'আর একটাও ফুল তুলবে না !' ফুলের ওপর মায়ের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল। এমন কি 'নাগফণ' ফুল দেখলেও তোলা বারণ। রামবাড়া চটির পরে গরুড়চটি। সেখানে সবাই চা খাচ্ছে। সারা পথে, এক বাঙালী দম্পতি আমাদের প্রায় পাশে পাশেই ছিলেন। এক ঘোড়ায় স্ত্রী খুবই ক্লান্ত, কাতর, আরেক ঘোড়ায় তার কর্তা, বেশ শক্তই আছেন। ফেরৎ যাত্রীদের সারা পথই জিজ্ঞেস করছেন—'আর কত দূর ভাই ?' সবাই বলছে—'এই তো এসে গেছেন ! জয় বাবা কেদারনাথ কী !' শুনে কর্তা স্ত্রীকে সাহস দিচ্ছেন—'ঐ তো, এসে গেছে ! শুনলে তো ?' গরুড়চটিতে তাঁরাও চা খেতে থামলেন। আমরা এগিয়ে চললুম, কেদার-

নাথ আর ২/১ কিলোমিটারের মধ্যেই। 'দেওদেখানি' বলে এক জায়গায় এসে ঘোড়াওলারা ঘোড়া থামিয়ে দূরে আঙুল তুলে দেখালো—'ওই যে, কেদারনাথ!'

দেখলুম দূরে ধবধবে ঝকঝকে তুষারশৈলের বলয়ের মাঝখানে ফোটোতে দেখা কেদারনাথের মন্দির ঝল্‌মল্ করছে।

দেবতার মন্দির দেখা যায় বলেই বোধ হয় জায়গাটার নাম 'দেওদেখানি'।

রামবাড়াতে চা খেতে থেমে, রঞ্জন এবং অলোকের জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। ওরা মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়ল। সুরয সিং তার চেনা একটি পরিচ্ছন্ন দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাদের চা খাইয়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

রঞ্জন আর অলোককে চা-টা খাইয়ে আমরা আবার রওনা হলুম একসঙ্গে। অতএব আশা করছি কেদারেও ওরা এসে পড়বে মিনিট পনেরোর মধ্যে।—লছমন সিং পুলের কাছে অপেক্ষা করতে লাগলো ঘোড়া নিয়ে। সুরয সিং আমাদের সঙ্গে এলো। সে মাস্তান আদমি, কেদারনাথের পাণ্ডাদের চেনে-টেনে। ধরমশালা ঠিক করে দেবে আমাদের জন্যে।

৩২

ছোটাসা ঘর হোগা বাদলোঁ কি ছাঁও মে—

প্রথমে কালীকম্বলীবালা। অন্ধকার মাটির ঘর। ঠিক পছন্দ হোলো না।

আরেকটা ধরমশালা। দোতলার ওপর মস্ত ঘর—ঘরের তিন দিকে মাটির মোটা দেয়াল, মাথায় টালির ছাদ। এক দিকটা খোলা। কোনো দরজা নেই—সেখানে বারান্দার সিঁড়ি এসে থেমেছে। ফ্রী। ঘরটা খুব সুন্দর—মেঝেয় খড়ের ওপর শতরঞ্চি পাতা। ছ' টাকাতে লেপ তোষক ভাড়া পাওয়া যাবে। ঘরে অনেক লোক থাকার ব্যবস্থা। একা আমরা নই, অন্তত বিশ-পঁচিশজনের ঘর। পিকোর খুবই পছন্দ দরজাবিহীন ঘর বলে—কিন্তু আমার মনে হল রাত্রে যখন বরফের দেশ থেকে হাওয়া দেবে, তখন নিশ্চয়ই ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হয়ে যাবে।—নাঃ।

—'চলো বাবা, আরেকটা ঘর দেখি। বেশ অ্যাটাচড বাথরুমওলা পাকা ঘরদোর কি নেই কোনো? পয়সা দিতে আপত্তি নেই।'

এবারে দেখালো জে. কে. কোম্পানীর ধরমশালা। সুন্দর একতলা ডাক-বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। হ্যাঁ, বাথরুম অ্যাটাচড বটে কিন্তু তা এমন কায়দায় তৈরি যে একসঙ্গে ৪টে ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড। সব চেয়ে পেছনের ঘরটা দিতে পারে, অন্য সব যাত্রী ভরা। এও ফ্রী। এও মেঝেয় শতরঞ্চি পাতা। ছ'টাকা দিলে বিছানা। গাঁইগুঁই করছি দেখে ছেলেটি বললে—'খুব দামি একটা ঘর আছে

দোতলায়। পঁচিশ টাকা ভাড়া। নেবেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, যদি ভালো হয়।'

জে. কে. ধরমশালার উঠোনের ভেতরেই ছোট এই দোতলা। পাণ্ডার বাড়ি। নীচেও ঘর আছে। সেটা দশ টাকা। দোতলা পঁচিশ, বারান্দাঘেরা। জানলা দরজা আছে। নীচে, চাবি-দেওয়া এক্সক্লুসিভ টয়লেট। উপরের ঘর যার, চাবি তার। একতলারও বাথরুম আছে, অন্যদিকে। এই ঘরেও শতরঞ্চি পাতা, হ্যারিকেনও রয়েছে। ঘরে লোকজনও রয়েছে।—'আমরা এখুনি নেমে যাবো। ভাড়া মেটানো হয়ে গেছে।' বললেন বাঙালি গিন্নিটি।

—'আপনারা ক'জন ছিলেন এ ঘরে?'

—'ছ'জন।' ছ'জন কেন দশজনও থাকতে পারতো। ঘর বেশ বড়ো। এটাই নেওয়া স্থির করলুম। ছেলেটিকে দুটি টাকা দিতে সে খুশি হয়ে পাণ্ডাকে খুঁজতে গেল। সুরয সিং বললে—'বিড়লা ধরমশালাই সবসে বেস্ট—আপলোক ট্রাই তো কীজিয়ে? মালী কা সাথ বাত তো করনা?'

মালীর সঙ্গে বাত করে আর কী হবে? জে-কে-র একেবারে পাশেই বিড়লা ধর্মশালা। ২২/২৩ কবিতাদিদের চারজনের বুকিং ছিল। চিঠিটা নিয়ে আসতে ছুট দিয়েছিল ঘুচাইসোনা। আমরাই তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি। তাছাড়া আজ ২৪শে। বুকিং-এর দিন ফুরিয়েছে। মালীর খোঁজে একবার গেলুম। চমৎকার বাড়িটা, সত্যি। একটু ঘুরে দেখে চলে এলুম, মালীর পাত্তা নেই। একজন উটকো লোক ছিল। সে আগ বাড়িয়ে বললে—'বুকিং হ্যায়? পড়ছি হ্যায়? বিনা চিট্ঠিসে ঘর নেহী মিলতা।'

—'তুমি কে?'

—'আমি কুলি।'

—'ঘর আছে?'

—'হম্ কুছ নেহী জানতা। মালীকো পুছো।'

আমি জে. কে.-তে ফিরে এলুম। পিকো আর সুরয সিং গেল মালীর খোঁজে।

৩৩

নাম রেখেছি কবিতামাসি

খানিক বাদে লাফাতে লাফাতে অলিম্পিকে ৪টে সোনা-পাওয়ার একখানা মুখ করে পিকো ফিরলো। যেন জেস্ আওয়েনের স্ত্রী-সংস্করণ।—'হয়ে গেছে। বিড়লায় চলো। তোলো পুঁটলি।'

—'সে কি রে ? কী করে হলো ?'

—'কবিতামাসির বুকিংয়ের দৌলতে। আমি বললুম—আমাদের ২২/২৩ বুকিং ছিল, খাতায় ছাখো, কলকাতা থেকে বুকিং শ্রীমতী কবিতা সিনহার পার্টি—অল ইনডিয়া রেডিওর অফিসার, তাঁর দুই ছেলে, আর মেয়ে। আমাদের আসতে দেরি হয়েছে। আমরা আজ এসেছি। মাত্র এক রাত্রিই থাকবো। একটু ব্যবস্থা করে দেবে না ?' মালী খাতা খুলে বললো, 'সিন্‌হা ? হাঁ, হাঁ, বুকিং থা। কিন্তু কালই ছেড়ে দিতে হবে। আজ ঘর খালি আছে। কাল থেকে আবার বুকিং হয়ে আছে।' বলে ঘর খুলে দিয়েছে।

আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।—'পড়ছি ? পড়ছির কী হবে ?'

—'পড়ছি তো চায় নি রে বাবা ? চাইলে তখন দেখা যাবে। এত ভয় পাচ্ছো কেন ?'

আমি আবার ধর্মভীরু লোক। তীর্থে এসে এত গুলতাপ্পি ?—'পিকো, এটা কি ভালো করলি ? যদি ধরা পড়ে যাই ? আমি কিন্তু বলতে পারবো না আমি কবিতা সিন্‌হা। তারপর যদি পুলিশে দেয় ?'

—'পুলিশে দেবে না, মা, বড় জোর তাড়িয়ে দেবে। তখন তুমি এখানে এসে থেকো।'

—'তখন যদি এটা না পাই ?'

—'তাহলে আর-কোথাও পাবে। অত ভয়ের কী আছে ?'

—'ঠকিয়ে থাকবি ? আমি বাবা কবিতাদি সাজতে পারবো না। তুমিই সাজোগে কবিতাদি। আমি বরং তোমার মেয়ে হই !'

—'তুমি কেবল কথাটা বেশি বোলো না মা, চুপচাপ থেকো। আমরাই ম্যানেজ করে নেবো।'

ভয়ে বুক ধুকপুক করতে লাগলো, অথচ ইচ্ছেও আছে, পিকোর সঙ্গে আমি অগত্যা বিড়লায় চললুম। সূরয সিং ফিরে গেল ঘোড়ার কাছে, রঞ্জনদের বিড়লায় নিয়ে আসবে বলে। আধ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে, ওরা আসে নি।

পিকো গিয়ে নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। পাছে রঞ্জন এসে মালীকে ভুল-ভাল কিছু বলে ফ্যালে। ঘরটি ভারি মনের মতো। দোতলার ওপরে। সঙ্গে বিলিতি কলঘর, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। ঘরে ডবল বেড, সোফাসেট, ড্রেসিং টেবিল, পোশাকের আলমারি। চমৎকার দামি হোটেলের মতো ব্যবস্থা। ফর্সা চাদর, ফর্সা বালিশের ওয়াড়, অবশ্য চেয়ে নিতে হোলো। না-চাইলে ঐ ময়লাতেই শুতে দিত সর্বশক্তিমান মালী। খানিক বাদে পিকো আর রঞ্জন, (অলোক সমেত)

ঝগড়া করতে করতে এসে হাজির। রঞ্জন বলছে, ভুরু কপালে তুলে।

—'ব্যাপার কী? তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? আমাদের দেখবামাত্র মালীর কানের কাছে অমন, "এই যে, হামকো দাদালোগ আ গিয়া" বলে চেঁচাতে লাগলি? আমি তোর দাদালোগ হলুম কবে?'

—'আজকেই। তুমি কবিতা সিন্‌হার ছেলে। আমি তার মেয়ে। বুঝলি? তুমি পুতুলদা, আমি ঘুচাই, অলোক সমরেন্দ্রদা। মা কবিতামাসি।'

—'অর্থাৎ, আজ যদি এ-বাড়িতে আগুন লাগে, জতুগৃহটি পাকাপোক্ত! আমার বাবা এসব ব্যবস্থা একেবারেই ভালো লাগছে না। শিগগিরি চা আনতে বল!'

চা আসে। এবং তারপরেও আমি কাষ্ঠপুত্তলির মত বসেই থাকি। যতবার মালী আসে আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। স্নানের কি গরম জল লাগবে? সেটা পিকো বলে। দুপুরে কী খাবো? সেটা রঞ্জন বলে। ভয়ানক ঠাণ্ডা, একটা আগুন জ্বালানো যাবে নাকি ঘরের মধ্যে?—অলোক বলে। আগুন আসে। গরম জল আসে। খানাও আসে। আমার বুক কাঁপে। আমি রিল্যাক্স করতে পারছি না। আমি মালীকে সমানে এড়িয়ে যাই। ভুলেও চোখাচোখি করি না। কী দরকার?

চা-টা বেশ ভালো। দাম কেবলই বাড়ছে। গৌরীকুণ্ডে ষাট, আশি পয়সা দাম ছিল রামবাড়ায়। এখানে ১৲ হয়ে গেল। খানা কিন্তু সেই ৫৲। ডাল-পাঁপড়-পুরি সবজি দেয়। ঘরের মধ্যে, এই বালতির আগুনটা খুব কাজে দিচ্ছে। প্রবল ঠাণ্ডা এখনই। রাত্রে কী হবে? জানলার বাইরের প্রহরী স্বয়ং তুষারধবল হিমালয়, আর সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। জানলা খোলা দুঃসাধ্য—যা শীত বাইরে। শুনেছিলাম অবিশ্যি কেদারে মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ে বলে যাত্রীরা রাত্রে রামবাড়াতে নেমে গিয়ে থাকেন।

৩৪

রাজার চিঠি

পরিষ্কার চাদর বালিশের ওয়াড় আনিয়ে সুন্দর করে বিছানা পেতে খেয়ে-দেয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছি, রঞ্জনরা বাইরের লবিতে সিগারেট খাচ্ছে, এসে বলল—'কারা যেন সব এসেছে দিল্লি থেকে, একটা ফিল্মের ইউনিট। তাদের ঘর নেই। তারা নাকি জি. ডি. বিড়লার চিঠি নিয়ে এসেছে।'

—'আমরাও তো বিড়লার চিঠি নিয়ে এসেছি। চিঠিটা অবশ্য উত্তরকাশীতেই রয়ে গেছে!' বলে পিকোলো।

—'কিন্তু কে লিখেছে সেই চিঠিটা? কে. কে. না জি. ডি. না বি. কে—কিছুই তো জানিস না। চিঠি-পত্রের কথা না তোলাই ভালো। বরং ফোনের কথা আমরা বানিয়ে বলতে পারি। ওরা ব্যস্ত মানুষ, ফোনেই সব ঠিকঠাক করতেই পারে।' রঞ্জন বুদ্ধি দেয়।

—'ওরে বাবারে—একদম ওসবের মধ্যে যাবি না,—খবদ্দার বানিয়ে বানিয়ে বলিস নি পিকো, সর্বনাশ হবে, শেষ রক্ষা করতে পারবি না, সোজাসুজি সত্যি কথা বলে দে বরং—'

—'সত্যি মিথ্যে কিছুই বলবার দরকার নেই দিদি, স্রেফ চেপে যান'—বলে অলোক।

চেপে আর কী করে যাই? মালী এলো মাথা চুলকোতে চুলকোতে। মালী জানালো, জি. ডি. বিড়লা সাহেব লিখেছেন, ওদের দোতলার ঘর ছেড়ে দিতে। অন্যান্য সব ঘর আগে থেকেই বুক্‌ড, লোক আছে। আমাদেরই বুকিং খতম হবার পরে এসেছি, তাই আমরা যদি এ ঘরটা ছেড়ে দিয়ে ঠিক এর নীচের ঘরটায় যাই তাহলে খুব ভাল হয়। সরেজমিনে তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে, যুদ্ধং দেহী হয়ে পিকো বাইরে গেল। আমিও। তাকে সামাল দিতে। দেখি ভয়ানক ট্যাশ-মার্কা উদ্ধত কয়েকজন পুরুষ, একটি দাম্ভিক মহিলা, আমারই বয়সী হবেন, খুব রংচং করা মুখ, সোয়েটার স্ল্যাক্স পরা,—'ইলেকট্রিক হীটার কেন নেই', বলে খুব হম্বিতম্বি করছেন লবিতে। তাঁদের চা দেওয়া হয়েছে—খেতে খেতে তাঁরা নাক তুলছেন, মুখ বাঁকাচ্ছেন, এবং বলছেন রানিং হটওয়াটারটা চালিয়ে দিতে। তাঁদের কথাবার্তা মালী কিছুই বুঝতে পারছে না। পিকোলোই তাঁদের সবিনয়ে জানালো,—'কেদারনাথে আপাতত ছ'মাস হোলো বিজলী নেই। তুষারঝড় হয়েছিল, ধস্ নেমেছিল, বিদ্যুতের স্তম্ভ উপ্‌ড়ে লাইন ছিঁড়ে দিয়েছে। এখনও সে সব লাইন সারানো হয় নি। পিসার-লীনিং-টাওয়ারের মতো পড়ো-পড়ো দেখতে বিজলী স্তম্ভটা পথে দেখেন নি? আমরা তো দেখলাম!' তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে শুনলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। শুনলেন কিনা টের পাওয়া গেল না। আমাদের যে তাঁরা খুবই নিম্নস্তরের প্রাণীজ্ঞান করছেন সেটি ভিন্ন আর কিছুই বুঝতে দিতে তাঁদের উৎসাহ ছিল না। কিন্তু জি. ডি. বিড়লার চিঠি নিয়ে এসেছেন এটা তাঁরা সেধেই বললেন এবং তৎক্ষণাৎ পিকো বলে ফেলল, 'সে তো আমাদেরও আছে।'

আর আমার মস্তিষ্কে বজ্রপাত হলো। আমার মনে হলো, সর্বনাশ! এক্ষুনি তো বলবে—'কই, দেখি?' তখন?

আমি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে বাক্সপুঁটলি বন্ধ করে গুটিগুটি নীচের ঘরে নেমে

চললুম। ফরসা চাদর-ওয়াড়গুলো খুলে নিয়ে যেতে ভুললুম না, অবশ্যই, তোয়ালেও।

রঞ্জন বললে, 'কেন চলে যাচ্ছো? ওরাই নীচে থাকুক। বাজে লোক!'

আমি বললুম—'ভাই, ঝামেলা বাড়িও না। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ শোননি? সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়েছে, অর্ধেক ত্যাগ করাই মঙ্গল। যদি ধরে ফেলে?'

আমরা বিনা বাক্যে নীচে চলে যাবো, এটা বোধহয় মালীও ভাবেনি। ঝামেলা বাধলো না দেখে আমাদের প্রতি সে যারপরনাই প্রসন্ন হয়ে উঠলো। এবং ওপরের অগ্নিকুণ্ডটি নিবে এসেছিলো বলে, নিচে আবার একটি অগ্নিকুণ্ড জালিয়ে এসেছিল। কিন্তু বলে দিল, রাত্রে দেবে না। রাত্রে ঘরে আগুন জ্বালানো বারণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপরের ঘরে মদের গন্ধ বেরুতে লাগলো—কেননা একটু পরে আমরা দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম—আশ্চর্য এক চাঁদ উঠছিল তখন কেদারের মাথাতে। এত শীত করছে, উঠোনে যেতে পারছি না। ওপরে ঢাকা বারান্দা আছে।

ফিল্ম ইউনিটের লোকেরা কেন এসেছিল, তারা কারা, সরকারি ফিল্মস ডিভিশন, না কোনো ব্যক্তিগত প্রযোজক-পরিচালকের প্রয়াস কিছুই বোঝা গেল না। কিসের ছবি হবে, কেদার সম্পর্কিত ছবি, না কেদারটা একটা প্রাসঙ্গিক ঘটনা—কিছুই জানা হলো না।

৩৫

জয় বাবা কেদারনাথ!

বিকেল থেকেই বর্ষা শুরু হয়ে গেল। ২॥টে/৩টে থেকেই ভয়ানক বৃষ্টি পড়ে এদেশে। কেদার থেকে তাই বিকেলের দিকে কেউ নামতে চায় না, বা উঠতেও চায় না গৌরীকুণ্ড থেকে। পথ পিছল হয়ে যায়, ঝাপ্‌সা হয়ে যায় চোখ, এবং হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপুনি শুরু হয়।

এখানে ঘরের মধ্যেই কি শীত! কি শীত! আমরা নানারকমের খেলা শুরু করেছি। এই খেলাটায় গল্প বলো, কান ধরো, নাচ করো, গান করো, হামাগুড়ি দাও, যাকে যা করতে বলা হচ্ছে, সে তাই করছে—শুধু অলোক কিছু করছে না। প্রতিবার অলোকের দান এলে, সে চুপটি করে থাকছে। আমরা বলতে বলতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে শেষে রঞ্জনকে বললুম, 'ধর তো রঞ্জন পা দুটো! এ-ব্যাটা তো মরেই গেছে—এটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসি!' বলেই, যেমন কথা, তেমনি কাজ। আমি ধরলুম পা দুটো, রঞ্জন হাত দুটো—পিকো দরজা খুলে ধরলো, চ্যাং-

দোলা করে দুলিয়ে অলোককে নিয়ে উপস্থিত হলুম বাইরে লবিতে। অলোক বিন্দুমাত্রও আপত্তি করছে না, দিব্যি আত্মসমর্পণ করে শুয়েই আছে শূন্যে। আমরা ওকে উঠোনে হিহি শীতের মধ্যে সত্যি সত্যি ফেলে দেবো বলে দরজার কাছে গিয়ে দেখি একটি পাঞ্জাবি পরিবার লবিতেই আশ্রয় নিয়েছে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। এরা শোবে কোথায়? বাচ্চাকাচ্চাও রয়েছে সঙ্গে। কখন এলই বা?

অলোককে উঠোনে ফেলে না দিয়ে 'জয় বাবা কেদারনাথকি' বলে লবিতে সোফার ওপরেই বিসর্জন দিয়ে ফিরে এলুম। খানিক বাদে দেখি অলোক ফিরে এসেছে। দরজায় টোকা দিয়ে বলছে, 'এই মহিলা আর তাঁর বাচ্চারা বাথরুমে যেতে চান, আমরা কি যেতে দেবো?' সঙ্গে করেই মহিলা এবং শিশুদের নিয়ে এসেছে।

বাথরুমের পর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'শোবেন কোথায়?'

মহিলা বললেন, তাঁর স্বামী গেছেন ব্যবস্থা করতে।

—'বাচ্চারা এই বিছানায় শুতে পারে খানিকক্ষণ'—বলতে তাড়াতাড়ি মহিলা বললেন, না না, তার দরকার নেই। ওঁরা মন্দিরে আরতি পুজো দেখতে যাচ্ছেন। এনার্জি আছে বটে! তাঁদের আর দেখিনি, ব্যবস্থা হয়েছিল নিশ্চয়।

কেদারনাথের মন্দিরের ঠিক পাশেই আমাদের বিড়লা ধর্মশালা। ধর্মশালা তো নয়, দামি বিলিতি কায়দার হোটেলের মতই মূল ব্যবস্থা। কেদারনাথের আরতির ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে—কিন্তু একটু সর্দি হয়েছে—ভয়-ভয় করলো অতটা শীতে পথে বেরুতে। তবু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। বাইরে চন্দ্রালোকিত হিমালয়ের পট-ভূমিতে বিশাল পাথরের নিঃশব্দ ছায়াময় মন্দিরটি আশ্চর্য দেখাচ্ছে। সুন্দর শব্দটি যথেষ্ট নয়!

বদ্রীনাথের মন্দিরটি বিশাল। পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু বহুবর্ণ তোরণ, অনেকটা তিব্বতী ধাঁচের। ভিতরে তো শুনেছি ওটা স্বর্ণমন্দির। শুনেছি বটে, কিন্তু যখন পুজো দেওয়ার জন্য গেলুম, তখন সোনার কিনা, দেখে নিতে মনে ছিল না।

তিরুপতির রুপোর তোরণ সোনার তোরণ দেখে নিতে হয় না, তারাই চোখে আঙুল ফুটিয়ে নিজেদের প্রদর্শন করে। এত ঝকঝকে পরিষ্কার পালিশ-করা সোনা-রুপো ভালো লাগেনি। দেশের মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু সোনারুপো দিয়ে দেবতার চৌকাঠ মুড়ে রেখে দেয়। অবিশ্যি দেবতার আর তাতে কি? তার কাছে পেতল-সোনার কাঠ-পাথরে থোড়াই ফারাক্ পড়ে! যাই হোক কেদার-নাথের এই পাথুরে মন্দিরটির স্থাপত্যও আমার খুব ভালো লাগলো—এর মধ্যে কেমন একটা গুরুগম্ভীর, রাশভারি, austere শ্রদ্ধানম্র ব্যাপার আছে। এই শীত,

এই তুষার, এই দীর্ঘ পার্বত্য পথ হেঁটে পার হয়ে আসা কাতর যাত্রীদল, এসবের সঙ্গে এমন একটি মন্দিরই ঠিক মানায়। এখানে ঢাক বাজছে, বদ্রীনারায়ণের ভজন হচ্ছে না। মাইক নেই। কেদারনাথের মন্দির অঞ্চলটি ছোট্ট, বাজারও ছোট্ট, গঙ্গোত্রীর মতো অনেকটা। বদ্রীর মতো এলাহি কাণ্ড নয়। মন্দাকিনীও ঠিক পাশ দিয়ে ছোটে না। কেদারনাথের কাছে কোনো উষ্ণনির্ঝরও নেই, সেই পাহাড়ের নীচে গৌরীকুণ্ডে। এখানে পথশ্রান্তি দূর করতে আছেন হাজির হিমালয়, আর কেদারনাথ স্বয়ং।

৩৬

স্বপ্ন ? মায়া ? মতিভ্রম ?

বদ্রীনারায়ণে জানলা খুলে চন্দ্রমৌলী নীলকণ্ঠ পর্বতকে দেখেছিলুম। কেদারনাথে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে একবার ইচ্ছে করলো মন্দির, আর হিমালয়কে রাত্রের দেখা দেখে নিতে। কাল সকালেই তো নেমে যাবো। এই প্রথম রজনী, এই শেষ রাত্রি।

শোবার আগে আরেকবার কেদারনাথের দর্শন পেতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

—ওকি ?

—ওরা কারা ? কোথা থেকে এলো ? কখনই বা এলো ?

—কেমন করে এতো কাছে এগিয়ে এসেছে সুদূর হিমালয় ? হঠাৎ খুলে গিয়েছে কুয়াশার পর্দা, অনাবৃত হয়েছে জ্যোৎস্না-ধবধবে তুষারে-ঢাকা শৃঙ্গের পরে শৃঙ্গ—এক সারি দুধেল ঘোড়ার ঘোড়সওয়ার, ছুটে এসেছে অলক্ষ্য থেকে,—ঝক্‌ঝকে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের বর্শাফলক তাদের উদ্যত মুঠোয়। এই তরল চাঁদের আলো, এই অলৌকিক স্নেহপদার্থ পিছলে যাচ্ছে পেশীবহুল পর্বতের শক্ত শরীরে। সুন্দরী চাঁদ বুঝি এখান থেকে বেশি দূরে নয়, তাকে দেখেই এই প্রতিবেশী সৈন্যদের সর্বাঙ্গে হাসির আভা উথলে পড়ছে। এই চোখের কত কী পাওয়া বাকি ছিল সারাদিন। কোথায় লুকিয়ে ছিলে তোমরা, যৌবনদৃপ্ত ধবধবে শিখরশ্রেণী, কোথায় যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়িয়েছো ? চঞ্চল গতিময়তা এখনও সর্বাঙ্গে মাখানো। এমন অসামান্য চমক দেওয়া প্রকৃতির নিজস্ব নাটকেই সম্ভব। "স্বপ্নলোকের চাবি" কথাটা শোনাই ছিল, এখন মনে হলো কেউ যেন সেটা হাতে পেয়ে খুলে ফেলেছে গোপন দরোজা। হিমালয়ের এই প্রসন্ন হাসিটিই সেই স্বপ্নলোক।

সামনে যদি কেদারনাথের মন্দির স্থির হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকতো হয়তো ভাবতুম

আমি ভুল করে অন্য কোথাও চলে এসেছি। কোথাও চিহ্নমাত্র ছিল না এতগুলি ধবধবে শিখরের। দিনভর এবার দুষ্টুমি করে লুকিয়ে ছিল মেঘ কুয়াশার আড়ালে। এদের পিছনে দূরবর্তী পর্বতটিই দেখা যাচ্ছিল শুধু। এখন দেখি উত্তুঙ্গ রূপোর পাহাড় একেবারে ঘিরে ধরেছে। 'রজতগিরিনিভ' বলেছে কেন যে 'চারুচন্দ্রাবতংস'কে তা বোঝা গেল। স্তম্ভিত হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম জানি না। এত করুণা? এত করুণা তোমার? এ যেন আমারই জন্যে একটা স্পেশাল শো! হে ইংরেজ সাধু শিবখ্রীস্টস্বামী, তোমাকে শতকোটি ধন্যবাদ। তুমি অত জোর না করলে আমি তো আসতুমই না। আর কেদারে না এলে সত্যি সত্যি অপূরণীয় লোকসান থেকে যেতো। কোনোদিন জানতেও পারতুম না কী হারালুম। ছেলেবেলার সেই কাঁচি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মতো: "আপনি জানেন না আপনি কী হারাইতেছেন!"

লোভীর মতো, একান্ত লোভীর মতোই—মুগ্ধ অতৃপ্ত নয়নে চেয়েই রইলুম একটানা—যতক্ষণ না শীতের প্রকোপে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব হলো বারান্দায়। কাশি শুরু হয়ে গেল।

ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখি বারান্দায় অল্প একটু দূরেই অলোক আর রঞ্জন। নিস্তব্ধ। জানি না কখন এসেছে।

একবার এই বিপুল মহান্ বিস্ময়ের সামনে পড়ে গেলে—বাক্‌রহিত হয়ে যাওয়া ভিন্ন গতি নেই! এই রাতটি সারাজীবন ধরে আমার চেতনার স্রোতে স্বপ্ন-দেখার মতো ভেসে উঠবে। হয়তো রঞ্জন-অলোক ওখানে সাক্ষী না থাকলে আস্তে আস্তে একদিন ওটা সত্যিকারের স্বপ্নই হয়ে যেতো। স্বপ্নের কোনো সাক্ষী থাকে না। এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই সেই সাদা ধবধবে পর্বতের পায়ের কাছে কেদারনাথের নিস্তব্ধ কালো পাথরের মন্দিরের সিলুয়েৎ। মানুষের তৈরি হয়েও ভারি সুন্দর মানিয়ে গেছে, প্রকৃতিকে একটুও ডিস্টার্ব করে না। যেন এই প্রকৃতিরই অঙ্গ। সন্ধ্যারতি দেখতে নাই বা গেলুম, এই যে আরতি দেখা হয়ে গেল। এর আর তুলনা কোথায় পাবো? এই তো চন্দ্রতপনের আরতি।

ওখানে দাঁড়িয়ে আবার মনে হলো এবারের আসাটা ব্যর্থ। এ-আসা আসা নয়, আবার আসতে হবে। যেখানে খুশি যতদিন খুশি থামতে হবে। এই যে কেদারনাথে প্রথম এবং শেষ রজনী, এতে তো মন ভরে না। সন্ন্যাস নিয়ে আসতে হবে। সংসারী লোকটাকে আগে বিসর্জন দিয়ে, তারপর আসতে হবে। তবে হিমালয় আমাকে কন্‌ফিডেন্সের মধ্যে নেবেন। সন্ন্যাসী না হলে এই মহাসন্ন্যাসীর সঙ্গে ভাব জমাবো কেমন করে?

৩৭

ভি. আই. পির ছয়লাপ

আবার রাত্রে ছেলেরা মাটিতে, মেয়েরা খাটে—এই বন্দোবস্তেই ঘুমোনো গেল। বিশাল ঘর, খাট মাত্র দুটো। আরও দুটো খাটিয়া যদি ওরা দিতে পারতো, পাতবার যথেষ্ট জায়গা ছিল। কিন্তু রাত্রে একবার বারান্দায় যাবো ভেবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি লবিতে খাটিয়া পাতা হয়েছে। সব ঘরেই অনেক বেশি বেশি লোক। এঁরা সবাই জি. ডি. বিড়লার সই করা চিঠি নিয়ে এসেছেন বলে মনে হোলো না। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের সই করা চিঠির দৌলতেই নির্ঘাৎ ঢুকেছেন। তা ভালো, ধর্মশালা মানেই আতুর নিরাশ্রয় তীর্থযাত্রীকে আশ্রয় দেবার ঠাঁই। কে কার চিঠি আনলো সেটা জরুরি হওয়া উচিত নয়।

যা বুঝলুম একতলার ঘরগুলো মালী দু'চার টাকার বিনিময়ে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে খয়রাতি করে, দোতলারগুলো ভি. আই. পি-দের জন্য চাবি দেয়া থাকে, বিড়লার চিঠি দিলে সেগুলো মেলে। নীচের বাথরুম দিশি। উপরেরটা বিলিতি। অবিশ্যি নীচেরটাই বেশি পরিচ্ছন্ন। মস্ত স্নানঘর, গরম জল নিয়ে সকালবেলা ভালো করে স্নান করা গেল আরামে। গৌরীকুণ্ডে যা সম্ভব হয়নি। স্নান করে চা খেয়ে চললুম মন্দিরে। ভোরবেলা একজন পাণ্ডা এসে আমাদের কার্ড দিয়ে গেছেন যথানিয়মে। তিনিই আমাদের মন্দিরে নিয়ে যাবেন। অল্পবয়সী গাড়োয়ালী ছেলেটিকে বেশ ভালোই লাগলো। বললে—রঞ্জন-অলোকরা যেন এক্ষুনি গিয়ে কিউ-তে দাঁড়ায়, জায়গা রাখে একজন-একজন করে। বিশাল কিউ তো? সবাই মিলে স্নান সেরে একসঙ্গে যেতে যেতে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। ছেলেরা তো চায়ও না স্নান করতে। খুব আহ্লাদের সঙ্গেই ছুটলো তারা লাইনে দাঁড়াতে। জানে না তো মন্দির-চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ।

৩৮

ইয়ম্ গঙ্গিকা ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ

ঠাকুর কার পুজো কার হাত থেকে নেন! মেসোমশাইয়ের মানতের পুজোর দান-সামগ্রী বের করতে গিয়ে দেখি গাঁজা, ভাং, হস্তুকি, বেলপাতা, পৈতে, ধূপ, ধুনোর সঙ্গে দিব্যি মাটির কলকেও রয়েছে ৪টে। অবাক কাণ্ড! সবই দেখি গোনা গুনতি ৪টে করেই প্যাকেট আছে। যেন আমাদের ৪জনের হাত দিয়ে সাজিয়ে পৌঁছে দেবার জন্যেই! মন্দিরে গিয়ে ছেলেদের রিলিফ দিলুম। তারা গেল পুজোর

ডালা কিনতে। ৪টে ডালা নিয়ে এল বাজার থেকে। ডালায় কাপড়, সিঁদুর, অনেক কিছু রয়েছে। কার্ডে আমাদের পাণ্ডার নাম আছে শ্রীমহাদেবপ্রসাদ ও শ্রীগুরুপ্রসাদ শর্মা, চামোলির লোক। কেদারনাথের ঠিকানা—যোগমায়া আশ্রম।

যোগমায়া আশ্রম উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে তৈরি ধর্মশালা। বাঙালি যাত্রীদের নিশ্চিত আশ্রয়। আমাদের সেই খুদে পাণ্ডাটি বলেছিল এর কথা, দেখিয়েও দিয়েছিল দোতলা বাড়িটি, কিন্তু স্থানাভাব ছিল। অনেক বাঙালি যাত্রী আশেপাশে তখনও ছিলেন দাঁড়িয়ে।

এই পুজোর কিউ-তে আজ সকালে কিন্তু বাঙালির সংখ্যাই বেশি। প্রচুর এই অঞ্চলের গ্রামের মানুষ এসেছেন, তাঁদের হাতের সস্তা ডালায় আমাদের চেয়ে অনেক মূল্যবান ভক্তির রসদ আছে। পাণ্ডারা খবরদারি করে বেড়াচ্ছে যার যার যজমানের।

কিনে আনা ডালাতে আমাদের মেসোমশায়ের মানতের দ্রব্যগুলি সাজিয়ে দিতেই সত্যি বেশ স্পেশাল-ডালা, স্পেশাল-ডালা দেখাতে লাগলো। ভালো করে নজর করে চক্কর মেরে দেখে এলুম। মন্দির চত্বর জোড়া অত দীর্ঘ, ভক্তসারিতে আর কারুর ডালাতেই গাঁজার কলকে শোভা পাচ্ছে না। অর্থমূল্যে এমন ডালাটি কিনতে পারা যেত না এখানে!

এখানেও নানান দামের পুজোর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে টাকার অংকের সঙ্গে পুজোর সময়টা যুক্ত। যত বেশিক্ষণ ধরে কেদারনাথকে পুজো করা হবে তত বেশি খরচ। পাঁচ মিনিটের, পনেরো মিনিটের, আধ ঘণ্টার, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পুজো থেকে টানা চব্বিশ ঘণ্টার পুজো পর্যন্ত আছে। এমন কি এক বছরের প্রাত্যহিক পুজোর ব্যবস্থাও। এবং সত্যিই হাজার হাজার টাকার পুজো দেওয়া যায়।

বদ্রীনাথে ছিল নানা দামের আরতি দর্শনের ব্যবস্থা। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা সাধারণের দর্শন বন্ধ। তখন শুধু 'স্পেশাল আরতি'র সময়। 'ভিজিটরস ওনলি'। গোলডেন আরতি সিলভার আরতির (এটা মাত্র ১১৲) টিকিট কিনতে পাওয়া যায়। সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই ভক্তি!

জুতো খুলে জমা রাখতে হয় মন্দিরের বাইরে। সেখানে দেখা হলো সেই পথের বাঙালি দম্পতির সঙ্গে। তাঁরা দিব্যি তাজা হয়ে উঠেছেন, ফোটো তুলছেন। মিশুক মানুষ বিমলবাবু ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সে কাজ করেন, মিল্ক কলোনিতে বাস। ওঁকে বললুম আমার ক্যামেরায় দু একটি ফোটো নিতে, যাতে আমিও থাকতে পারি তাতে। উনি মহা উৎসাহে অনেকগুলি ফোটো তুলে দিলেন। নিজের দামি ক্যামেরাতেও তুললেন। (গোপনে জানাই, কলকাতায়

এসে কিন্তু দেখি বিমলবাবুর তোলা ছবিগুলি ওঠে নি! ভাগ্যিস একটা ছবি পিকোলো তুলেছিল, তাই তবু একখানা ছবি রয়েছে আমার কেদারে)।

যতই দীর্ঘ লাইন হোক, এক সময়ে টার্ন এলো, জুতোটুতো খুলে মন্দিরে ঢোকা হলো। প্রথমেই বৃষ, তারপরে সিদ্ধিদাতা গণেশ। এবম্বিধ অনেক অবান্তর ঠাকুর দেবতার মনোরঞ্জন করতে করতে অবশেষে স্বয়ং কেদারনাথের গর্ভগৃহে প্রবেশের সুযোগ মিলল। মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকার। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া বদ্রীনাথের মতো নয়, এখানে তো উঁচুনাক নারায়ণের মন্দির নয়। শিবঠাকুরের। শিবঠাকুরের স্বভাবটি আলাভোলা, তাঁর মন্দিরে অত কড়াকড়ি নেই, দিব্যি বিগ্রহের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর প্রসন্নতা আদায় করা যায়। স্পর্শপূজাই প্রচলিত।

কেদারনাথের বিগ্রহ বলতে আছে ষাঁড়ের পিঠের কুঁজের আকৃতির একটি কষ্টি পাথরের চাঁই। যেন কচিকাঁচা একটি পাহাড় সবে আকাশের দিকে মাটি ঠেলে উঠতে শুরু করেছিল, হঠাৎ তার মাথার ওপরে মন্দির চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অথবা, মাটির তলায় লুকিয়ে আছে এক বৃহৎ ঋষভতার কুঁজটুকুই ভেসে আছে উপরে, এক্ষুণি বুঝি তেড়েফুঁড়ে উঠে আসবে, লণ্ডভণ্ড করে দেবে সাজানো পুজো-পুজো খেলা।

আমার খুব ভালো লেগে গেল কেদারনাথ মন্দির। আর আমাদের নৈবেদ্যও খুবই মনে ধরে গেল কেদারনাথের। অন্তত তাঁর পূজারী ব্রাহ্মণদের তো বটেই। গাঁজার কল্কে দেখে তাঁদের চোখেমুখে কী বিমল দিব্য বিভাই যে ফুটে উঠলো! অতি যত্ন করে পুরিয়া খুলে গাঁজা নিয়ে কলকে সাজালেন, সুন্দর করে দাঁড় করিয়ে দিলেন পরপর চারটে কলকে। সিদ্ধি-টিদ্ধি দেখেও মহা পরিতৃপ্ত! সবচেয়ে ভালো লাগলো পুজোর সময়ে অন্যান্য নৈবেদ্যর সঙ্গে যখন আমায় দিয়ে বলালেন—'ইয়ম্ গঞ্জিকা ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ!' আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই হাজার টাকার পুজো দিলেও কি শিবঠাকুর কি পুরুতঠাকুর কেউ অত খুশি হতেন না, কালীঘাটের কলকেগুলি দেখে যত উল্লসিত হয়েছেন। মেসোমশায়ের প্রতি কেদারনাথের আর প্রসন্ন না হয়েই উপায় নেই। ফাঁকতালে আমরাও পেয়ে গেলুম দয়ার ভাগ।

৩৯

পুরি-হালুয়া পয়সা পুয়া

পুজো দিয়ে বেরিয়ে বিমলবাবুদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সন্ধানে গেলুম। শুনলাম কেদারনাথ মন্দির নাকি পাণ্ডবদের তৈরি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর স্বজন হত্যার

মহাপাপ থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা শিবের খোঁজে এখানে অবধি তেড়ে এসেছিলেন। শিব পাণ্ডবদের নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন কাশীবিশ্বনাথের মন্দির থেকে পালিয়ে এলেন গুপ্তকাশীতে, সেখান থেকে একেবারে দুর্গম কেদারে! সেখানে শিব ষাঁড় সেজে লুকিয়ে রইলেন পার্বত্য গরু ষাঁড়েদের দলে। ভীম তখন দুই পাহাড়ে দুই পা স্থাপন করে শিবের পথ আটকালেন, দেবতা তো মানুষের পায়ের ফাঁকে গলতে পারবেন না। ধরা পড়ে গিয়ে নিরুপায় হয়ে শিব তখন পাতাল প্রবেশ করলেন।—কিন্তু 'পালাবি কুথা' বলে ভীমসেন পালোয়ান তাঁকে জাপটে ধরলেন, চিনতে পেরেছি ঠাকুর! তখন পঞ্চকেদারে ফুটে উঠলো শিবঠাকুরের পঞ্চ অঙ্গ। সেই ষাঁড়ের পিঠই এই পুণ্য কেদারনাথের বিগ্রহ যাঁর পুজো করে স্বজন-হননের পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন পঞ্চপাণ্ডব।

হায় কেদারনাথ—কি আশীর্বাদ করেছিলে তুমি? সেই স্বজন-হননের কলঙ্কিত অভ্যাস আমাদের আজও তো ঘুচলো না! পাঞ্জাবে, আসামে, অন্ধ্রে, কাশ্মীরে, বাংলাদেশে, শ্রীলঙ্কায়। এই বিশাল ভূখণ্ডের যেদিকেই তাকাই, স্বজনের রক্তে মাটি রাঙা। হে কেদারনাথ, আমাদের পূর্বপুরুষকে তুমি কেমনতর আন্‌মনা মুক্তি দিয়েছিলে? আমি তো দেখছি সেই স্বজন-হননের মহাপাপেই অক্ষয় ফলভোগ করছে এই মহান ভারতীয় উপমহাদেশ। অদ্যাবধি!

ছবি যেমনই তুলুন, বিমলবাবু কিন্তু লোক চমৎকার। লাইনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বলছিলেন, 'ব্রেকফাস্ট কী খাবেন অরডার দিয়ে দিন বরং। আমরা কাল দারুণ খিচুড়ি খেয়েছি এই ধারায় অর্ডার দিয়ে। যদি পুরি-হালুয়া খান, তাহলে ৬ জনেরটা অর্ডার দিলে সুবিধা, ওরা ওজনের মাপমতন অর্ডার নেয়। কত কিলো সুজি, কত কিলো আটা, এই রকম হিসেবে দাম ধরে, ক'গণ্ডা লুচি ক'হাতা হালুয়া এভাবে নয়।' বেশ তো, দিয়ে দিয়ে আন্দাজ মতো অর্ডার, আমরা ভাগ করে নেবো। সত্যি খুব ভালো পুরি-হালুয়া খাইয়েছিলেন। পুজোর পরে, মন্দিরে পাথুরে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে, গরম গরম পুরি, হালুয়ায় আবার গাওয়া ঘি-য়ের সুবাস, চমৎকার দুধের চা। পিকোলোর তো আছে নানান বায়না, সে হালুয়া খাবে না, নোন্‌তা খাবে। নো প্রবলেম, তাঁর জন্যে এনে ফেললেন ফার্স্ট কেলাস আলুর তরকারি। তখন প্রত্যেকেরই অবশ্য পিকোর আলুর তরকারিটার দিকেই নজর পড়ল। মা হিসেবে আমি চেষ্টা করলুম নজর না দিতে (একেবারে বিমাতৃসুলভ কর্ম)! কিন্তু একটু একটু নজর কি আর দিই নি? কেদার থেকে নামবার সময়ে বিমলবাবুর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় নামলেন, কিন্তু কর্তা এবার অশ্বারোহণে রাজি নন। তিনি রঞ্জন, অলোকের সঙ্গে পদব্রজে নামবেন ঠিক

করেছেন। তাঁরা হেঁটেই যাবেন ত্রিযুগীনারায়ণ। পরে তুঙ্গনাথ। রুদ্রনাথেও যাবার ইচ্ছে আছে।—গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে কিন্তু অলোক বলেছিলো—'বিমলবাবুরা আর ত্রিযুগীনারায়ণে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না, বিমলবাবুর হাঁটা সহ্য হয়নি, পা দারুণ ফুলে গেছে। ঘোড়া নেওয়া উচিত ছিল।'

শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। প্রবল উৎসাহ ছিল, জানি না ওঁদের হর-গৌরীর বিয়ের যজ্ঞে আহুতি দেবার সুযোগ শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কিনা।

৪০

নাম, শুধু নাম

সমস্যা হলো ঘর ছাড়তে গিয়ে। মালী খাতা হাতে এসে দাঁড়ালো, নাম ঠিকানা লিখে যেতে হবে রেজিস্টারে, কখন এলুম, কখন গেলুম, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি—এই সব, খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর। সে প্রশ্নের উত্তর জানতে জানতে একটার পর একটা জাম পার হয়ে যায়।

আমি বললুম—'ওরে বাবা রে আমি তো কবিতা সিংহ সই করতে পারবো না। অ পিকো, কোন্ ঠিকানা লিখবো? আমার হিন্দুস্থান পার্ক, না কবিতাদির গোবিন্দ ঘোষাল লেন?' পিকো তো হেসেই আকুল। আমার সমস্যাটা তাকে স্পর্শই করছে না! আমি সই করলাম বাংলায়, নবনীতা দেবসেন। তারপর ইংরেজিতে, কেয়ার অব শ্রীমতী কবিতা সিংহ, আকাশবাণী, কলকাতা। তারপর বলছি—'ভাই মালী, কবিতা সিন্‌হা আমারা দিদি হ্যায়, হাম্‌কো লিয়ে ঘর বুক কিয়া থা, হাম উন্‌কা ছোটী বহেন হ্যায়—।' মালী কিছুই বলছে না, শুধু তাকাচ্ছে। পিকোর দিকে একবার, আমার দিকে একবার।

আর রঞ্জন রানিং কমেণ্টারি দিয়ে যাচ্ছে—'ওরে বাব্বা! তাকাচ্ছে কী! অ পিকো, খবদ্দার ওর চোখে চোখ রাখিসনি, ভস্ম হয়ে যাবি! অ দিদি, পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো, আর দেরি করলে ঘটি বাটি কেড়ে নেবে'—কিন্তু মালী কিছুই বললে না। বকশিশ নিয়ে দিব্যি হেসে নমস্কার করে চলে গেল। তবে কি বৃথাই আমার এত ভয়, এত উদ্বেগ, এত দ্রুত নাড়ীর স্পন্দন? মালীর কিছুই এসে যায়নি? যাঃ—

আমি আরেকবার কেদারনাথকে—আরেকবার শাদা ধবধবে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের সেই শিখরশ্রেণীকে খুঁজে দেখলুম। নেই। কাল রাত্তিরের সেই যুবক হিমালয় আজকে সকালে আর নেই। এখন শাদামাটা, শাদা-কালো, বৃদ্ধ এক পাহাড়। কুয়াশার চাদরে পা ঢেকে, অন্যমনস্ক, স্থির বসে আছে। কালরাত্রের দুর্দান্ত সহাস্য

অশ্বারোহীর দল কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত ভিন্ন বোধহয় তারা দেখা দেয় না।

শংকরাচার্যের সমাধি ঠিক মন্দিরের পিছনেই। অলোক আর রঞ্জন গেল। আমি আর পিকো ততক্ষণে থলি গুছিয়ে নিতে লেগে যাই। মন খারাপ! এই তো চারধাম শেষ। এবার কেবলই ফেরার পথ।

মন্দাকিনীর সেতুর ধারে গিয়ে দেখি ঠিক ঘোড়া নিয়ে লছমন সিং, সুরয সিং রেডি। তারা পৌঁছে গেছে এত সকাল সকাল! যাত্রী না থাকলে ঘোড়া দৌড়ে উঠে আসে। তার চালকও। ঘোড়ায় চেপে আসে না, পাছে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে!

ফেরার সময়ে তাড়াতাড়ির চেষ্টা না করলেও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বারে বারে যদিও ঘোড়া থামিয়ে ফিরে ফিরে চাইছি। 'দেওদেখানি'তে এসে শেষ বারের মতো দেখে নিলুম কেদারনাথের মন্দির। এমন অসামান্য স্নো-রেনঞ্জ আগে দেখি নি। পৃথিবীর তো অনেক পর্বতমালাই দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন দয়াময় ভগবান। তবু কতো বিস্ময় যে বাকি থাকে জীবনে! কতো রহস্য!

৪১

পুনরপি শ্বেত-সন্ত-কথা

আরো বিস্ময় বাকি ছিলো। গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে, বাক্সপ্যাটরা নিতে 'সুনীল লজ'-এর আপিসে গেলুম। এখানেই ঘোড়ার ভাড়া, ঘরের ভাড়া, খানার দাম, বিছানার ভাড়া, লেফট লাগেজের চার্জ—সব কিছু মেটাতে হবে। কোনোটাই বেশি দামি নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ কয়েকশো দাঁড়ালো। গভীরভাবে ব্যাগে হাত পুরে টাকা পয়সা বের করে, মেটাতে গিয়ে দেখি—কী কাণ্ড? কখন ফুরিয়ে গেছে চপলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। টাকা তো নেই? কোথায় টাকা? কী করবো এবারে? কী সর্বনাশ!

রঞ্জনের সঙ্গে কিছুই টাকা ছিল না। ড্রাইভার সুরয সিংয়ের কাছে কত আছে একবার জিজ্ঞেস করব নাকি? পেট্রল কেনার টাকা আছে ওঁর কাছে, তা জানি। এই সব ভাবছি আর পাগলের মতন হিসেব করছি। এখানেই থাকতে হবে, এবং T M O করে টাকা আনাতে হবে? দেখি যদি দিল্লিতে টেলিফোন করা যায়। বুকের মধ্যে ভয়ের ধস নেমেছে। আর ব্যাগটা হাতড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে আমার ব্যাগে আমারই ভুলে যাওয়া পুরনো টাকাকড়ি বেরিয়ে পড়ে—যদি বেরোয়? নাঃ বেরোচ্ছে না। ফোন? এখানে কোথাও থেকে ফোন করতে পারা যাবে?

হঠাৎ হাতে ঠেকলো একটা পুরুমতন খাম। বের করে দেখি, শিবশ্রীস্টস্বামীর জমা দেওয়া পঁচিশশো টাকা। আঃ! যেন তাঁর ফোকলা মুখের হাসিটা চোখে দেখতে পেলুম। গঙ্গোত্রীর সেই সাহেব সাধু জোর করেই পিকোকে এই টাকাটা তখন গছিয়ে দিয়েছিলেন। আমি প্রবল আপত্তি করেছিলুম। নিতে চাইনি পরের টাকার দায়িত্ব। যদি মরে-টরে যাই, ঋণী মরব? নাছোড় সাধু বললেন, 'তাহলে ধরে নাও এই টাকাটা তোমার মেয়েকে আমার 'দানম্'। আবার আমার যখন এই টাকাটা দরকার হবে, আমি তোমাদের কাছে চাইবো। তখন তোমরাও ওটা আমাকে 'দান' করবে? ধার শোধ-বোধের ব্যাপারই রইলো না তাহলে!' শিবশ্রীস্টস্বামীজী একটি অনাথ-আশ্রম গড়তে চান। জমি কিনবেন। তাই টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে বাড়াতে চান, ঘুচাই আর পিকোর কাছে জানিয়েছেন। কিন্তু উনি তো সন্ন্যাসী, উনি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে চান না। তাই লোকেদের দিয়ে দেন, পরে আবার চেয়ে নেবার ভরসায়।

—'এই তো হৃষিকেশের এক চায়ের দোকানে তিনশো ডলার জমা রেখেছি। ফেরার পথে চেয়ে নেব।'

—'সর্বনাশ করেছেন। ও টাকা আপনি আর পাবেন না।' আমি বলে ফেলি।

—'কেন পাবো না?'

—'এরা বড় গরিব। টাকা খরচ হয়ে যাবে। ফেরৎ দিতে পারবে না। ওভাবে টাকা ছড়াবেন না আপনি।' তারপরেই ওই টাকাটা রাখতে আমি রাজি হয়ে যাই। কি জানি কাকে কোথায় দেবেন, কার কীভাবে ক্ষতি হয়ে যাবে। ওঁর নিজেরও টাকাটা যাবে, তাদেরও চোর বদনাম হবে। শিবশ্রীস্টস্বামী বলেছেন, কলকাতায় এসে টাকাটা নিয়ে যাবেন। খামের ওপরে দিল্লির একটা ঠিকানা, আর নিজের ব্রিটিশ পাসপোর্টের নম্বরটা লিখে দিলেন। 'আমি টাকা তো রাখবো, কিন্তু তার জন্যে নিশ্চিত একটা ঠিকানা চাই, আইডেন্টিফাইং একটা কিছু চাই—' বলে চেঁচামেচি করাতে উনি লিখলেন। উনি বললেন, পঁচিশশো টাকা আছে। আমরা কিন্তু গুনে নিইনি। শ্বশুরমশাই বলতেন, সর্বদা টাকা গুনে দেবে, গুনে নেবে। আমার মনে থাকে না।

এই সেই টাকা। কেদারনাথে আমাকে আসতে রাজি করিয়েছিলেন সেই খ্রীস্টান সাধুই। ভ্রমণের খরচও যুগিয়ে দিলেন তিনিই। শিবশ্রীস্টস্বামীর খাম থেকেই দরকার মত টাকা নিলুম। ধার নিচ্ছি। পথে আবার ধার নিতে হবে। ফেরার পথ-খরচ পুরোই বাকি। টাকাটা এখনই গুনে রাখা দরকার। গুনতে

বসে দেখি পঁচিশ নয়, সাধু দিয়েছেন মোট ছাব্বিশশো টাকা। ছাব্বিশটি করকরে একশো টাকার নোট।

পথের মধ্যে হঠাৎ এভাবে টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য এই ছাব্বিশশো টাকা আবিষ্কার। শিবশ্রীস্টস্বামীর খামটি দেউলিয়া অবস্থায় হাসতে হাসতে তোমার হাতে যিনি এগিয়ে দিলেন তিনি কে?

এই যে বেইমান নবনীতা, সকলের ভার বইতে বইতে তোমার নাকি পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে? তোমার ভার নাকি কেউ নেয় না? তুমি নাকি নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব, জগৎপারাবারের তীরে একলা?

খুব শক্ত একটা মুঠোর মধ্যে ধরা রয়েছে তোমার হাত, নবনীতা। সেই হাত কখনো ছেড়ো না। কখনো ভুলো না।

৪২

দেখা হবে

শোনপ্রয়াগে অলোককে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলেছে গুপ্তকাশী। পিকো চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা—ঐ যে, সেই সাধু।' আশ্চর্য—এঁকে আমরা সেই যমুনোত্রীতে দেখেছিলাম—যাত্রার শুরুতে। একটি মাত্র পা, পরনে কৌপিন, মাথায় জটা, হাতে দণ্ড। যমুনোত্রী হয়ে, হয়তো গঙ্গাদশেরায় গঙ্গোত্রী ঘুরে, কেদারনাথে আসছেন। পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন যিনি করান, আমাকেও তিনিই হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন? এই সন্ন্যাসীর যে একটি পা নেই সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছি। আর আমিও যে হস্তপদহীন বিকলাঙ্গ, সে খবর শুধু তিনিই জানেন।

যাত্রারম্ভে যাঁকে দেখেছিলাম, যাত্রা শেষেও তাঁর দেখা পেয়ে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। শোনগঙ্গার সঙ্গে মন্দাকিনীর সঙ্গমের প্রবল গর্জনের শব্দের মধ্যে যেন আমারই বুকের উদ্যত উত্তাল কৃতার্থতা প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

আবার আসবো, হিমালয়, আবার দেখা হবে। নিজের নামে একটা পোস্টকার্ড ছেড়েছি গৌরীকুণ্ড থেকে। যেন ভুলে না যাই—প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি, এবারে একা আসবো, তখন আরেকটু ঘনিষ্ঠ হতে দিও, হিমালয়।

—

For More Books >
CLICK HERE